স্বাধীনতার
৪৪
বছর

নীলুফার হুদা

কর্নেল হুদা ও আমার যুদ্ধ

উত্থান-পতনে ঠাসা মুক্তিযোদ্ধা
কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদার
সংগ্রামী জীবন। আগরতলা মামলার
আসামি ছিলেন। জেল থেকে বেরোনোর
কিছুদিন পর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ঝাঁপিয়ে
পড়লেন সেই যুদ্ধে। স্বাধীনতার পর
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে
নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো
সপরিবারে। বিপর্যস্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক
টালমাটাল সেই সময়ে নিহত হলেন তিনিও।
কর্নেল হুদার স্ত্রী নীলুফার হুদা কাছ থেকে
দেখেছেন কর্নেল হুদার এই জীবনসংগ্রাম।
সেই জীবনসংগ্রামের একান্ত শরিক ছিলেন
তিনিও। নিজের কলমে সত্যনিষ্ঠ বয়ানে
সেই সব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি।
সংগ্রহে রাখার মতো বই।

নীলুফার হুদা

জন্ম ১৯৪১, কলকাতায়
পৈত্রিক নিবাস পশ্চিমবঙ্গের
মুর্শিদাবাদ জেলার সালার গ্রামে।

১৯৬৫ সালে বাংলাদেশে বেড়াতে
এসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের
কারণে এখানে আটকে পড়েন।
পরে (১৯৬৬) পাকিস্তান
সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা
খন্দকার নাজমুল হুদার সঙ্গে
তাঁর বিয়ে হয়।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

প্রথমা
প্রকাশন

কর্নেল হুদা ও আমার যুদ্ধ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২২, জুলাই ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Col. Huda O Aamar Juddha
by Nilufar Huda
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180078-81
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 350 only

ISBN 978 984 8765 71 5

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য
১৯৭১ সালে যাঁরা জীবনবাজি রেখে
যুদ্ধ করেছেন

আমার কথা

এটা কোনো ইতিহাসের বই নয়, রাজনীতির বইও নয়। এ আমার একান্ত স্মৃতিচারণা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে উনিশ শ পঁচাত্তরের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ—এই দীর্ঘ কালপর্বে সংঘটিত ঐতিহাসিক কিছু ঘটনার সঙ্গে আমার স্বামী কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদার সূত্রে আমার জীবনও জড়িয়ে পড়েছিল। নানা সংঘাতে, টানাপোড়েনে যখন সবকিছু প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, কিংবা মাঝেমধ্যেই স্মৃতির জাবর কাটছিলাম, তখনই *প্রথম আলো*-র সম্পাদক মতিউর রহমানের কাছ থেকে অনুরোধ এল, 'লিখে ফেলুন খন্দকার নাজমুল হুদা ও আপনার জীবনযুদ্ধের কথা। বই আকারে আমরাই ছাপব।'

শিল্প ও সাহিত্যের রসগ্রাহী হলেও আমি লেখক নই। লেখক হওয়ার চেষ্টা ও কল্পনাও করিনি কোনো দিন। ফলে আমার কথা আমি বলে গেছি আর অনুলেখক তারা রহমান সেটা লিখে গিয়েছেন। এই সূত্রে অনুজপ্রতিম তারাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সম্পাদনা করার পর শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত আকারে এ বই বের হওয়ায় আমি যারপরনাই খুশি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথা একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। আমার এই আত্মজৈবনিক রচনা সেই ভূমিকা পালন করবে কি না, জানি না। তবে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আমার সেই সময়কার ঘটনার বিবরণ তুলে ধরতে।

আর একটি কথা, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রকৃত নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু পাকিস্তানিরা এই নাম

বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে প্রচার করে। এখনো এ মামলার প্রসঙ্গ এলে অনেকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে থাকেন। যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ষড়যন্ত্র শব্দটি খুবই পীড়াদায়ক। কারণ, যাঁরা ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা কেউ ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা কাজটি করেছিলেন।

প্রথমা প্রকাশনের কর্মীদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রম ব্যতিরেকে এ বই বেরোনো সম্ভব ছিল না। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাই।

নীলুফার হুদা
ফেব্রুয়ারি ২০১১

সূচিপত্র

ভূমিকা

কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম একজন অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা। বর্ণাঢ্য তাঁর জীবনালেখ্য। উত্থান-পতনে ঠাসা তাঁর সংগ্রামী জীবন। প্রতিনিয়ত তাঁকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। বিএ পাস করে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির গ্র্যাজুয়েট কোর্সে যোগ দিয়ে কমিশন অফিসার হতে গিয়েছিলেন। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত ২৫তম পিএমএ ব্যাচের সঙ্গে কমিশন পেলেন আর্মি সার্ভিসেস কোরে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত ছিলেন কর্নেল হুদা। নিজের দেশকে ভালোবেসে তাকে উদ্ধারকল্পে চাকরিরত অবস্থায় এগিয়ে গিয়েছিলেন নির্ভয়ে সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। অন্য সাধারণ বাঙালির সঙ্গে কর্নেল হুদার তফাত এখানেই। মানবতার মুক্তিতে স্বেচ্ছায় জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার মতো হিম্মত রাখতেন কর্নেল হুদা। নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি আত্মসম্মানে বলীয়ান কর্নেল হুদাকে। নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে এসবির অফিসার তদন্তের নামে, জিজ্ঞাসাবাদের নামে যদি কোনো বেয়াদবি করে, তাহলে চপ্পল খুলে গালে জুতাপেটা করার জন্য। সে সময় কর্নেল হুদা জানতেন যে ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে তাঁর ফাঁসিও হতে পারে এবং তাঁর চিঠি তদন্তকারী অফিসারদের ছাড়পত্রের পরই তাঁর স্ত্রী পাবেন, তবু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিলেন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির ২৫তম ব্যাচের ক্যাডেট হিসেবে আর্মি সার্ভিসেস কোরে ১৯৬২ সালে কর্নেল হুদা কমিশন পেয়ে বিভিন্ন সেনানিবাসে

চাকরি করে ঢাকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় '৬৬ সালে তাঁর সঙ্গে কলকাতাবাসী ও কলকাতা থেকে আসা নীলুফার দিল আফরোজ বানুর সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯৬৮ সালে কর্নেল হুদা আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আসামি হন। বিয়ের দুই বছরের মাথায় নীলু ভাবি স্বজনবিহীন শিয়ালকোট সেনানিবাসে অবস্থানকালে সম্মুখীন হলেন কঠিন এক জীবনসংগ্রামের। আগরতলা মামলার আসামি স্বামী বন্দিদশা থেকে তাঁকে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখে মন চাঙা করতে যারপরনাই চেষ্টা করলেও কঠিন বাস্তবতা সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেলেন নীলু ভাবি; তবু হাল ছাড়েননি। রিকশা বা বেবিট্যাক্সি করে হলেও ঢাকা সেনানিবাসে সিগন্যাল মেসে স্থাপিত মিলিটারি কোর্টে উপস্থিত থাকতেন। উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ আশীর্বাদে সিক্ত হয়ে নিজেকে, নিজের দেশকে তথা দেশপ্রেমিক স্বামীকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে থাকেন। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত অসীম সাহসী বঙ্গবন্ধুর উচ্চ স্বরে বলে ওঠা, 'মা, আমাদের কিছু হবে না—আমরা সহসাই ছাড়া পেয়ে যাব। চিন্তা করিস না—সাহস হারাবি না।' নীলু ভাবি সাহস হারাননি। তারপর সত্যি সত্যি কর্নেল হুদারা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে বেকসুর খালাস পান। অবশ্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

সেই থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বাঁচার তাগিদে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কেউ তাঁদের চাকরি দিতে সাহসী হয়নি। এমনকি বাসা ভাড়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছিল। এত অসহায়ত্বের মধ্যেও তিনি এবং তাঁর প্রাণচঞ্চল স্ত্রী—কেউই মনোবল হারাননি। বরং কর্নেল হুদা তাঁর বড় ভাই নুরুল হুদার সহযোগিতায় অতি সামান্য পুঁজি সম্বল নিয়ে বালুর ঠিকাদারি থেকে শুরু করে নদীর পাড় থেকে কাঁচা পাট কিনে ট্রাকের সামনে বসে পাটকলে পৌঁছে দিয়ে যৎসামান্য রোজগার করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে ব্রতী হন। বাচ্চার জন্য নিয়মিত দুধ কিনতে সমর্থ হতে পারছেন দেখে নিজেই নিজেকে শাবাশ দিতে থাকেন। নীলু ভাবি ইতিমধ্যে গয়না বিক্রি করে হাতে কিছু টাকার পুঁজি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও শান্তির প্রলেপ বইতে শুরু করল তাঁদের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত সাংসারিক জীবন। প্রাচুর্যের স্বাদ পাননি কোনো দিনই, কিন্তু জীবনসংগ্রামে হাল ধরে গুটি গুটি পায়ে এগোনোর প্রচেষ্টায় সফল হতে যাচ্ছেন, তাতেই তাঁদের শান্তি। ঠিকাদারি ব্যবসায় মনোনিবেশ করে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করতে প্রয়াসী হওয়ার কালে এল স্বাধীনতার ডাক। কোনো ধরনের পিছুটানের প্রতি বিন্দুমাত্র মোহগ্রস্ত না হয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফেলে রেখেই কর্নেল হুদা ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাধীনতাসংগ্রামে। অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর সব কাহিনি। রাজবাড়ীর পাংশার ওপারে কসবা মাজাইল

গ্রামে পৌঁছে ২৯ মার্চ নীলু ভাবিকে দুটি ১০০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে কর্নেল হুদা আমজাদ খালুকে বললেন, 'এদের দুমুঠো খাবার দেবেন এবং সুযোগ পেলে কলকাতায় ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।' অথচ দিন কয়েক পর আমজাদ সাহেব কুষ্টিয়ার ডিসির টেলিগ্রাম পেলেন, 'নুরুল হুদার (ছদ্মনাম) স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।' নীলু ভাবি কিন্তু সব বাধানিষেধ বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে শিশুপুত্র ও দুধের কন্যাকে বুকে চেপে নির্ভরশীল সঙ্গী ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বদলে রওনা দিলেন কুষ্টিয়া শহরের উদ্দেশে, যাতে করে যুদ্ধরত স্বামীকে তালাশ করে বের করতে পারেন। সম্পূর্ণ অজানা এক প্রতিকূল পরিবেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র ভয় পাননি নীলু ভাবি। রেলস্টেশনে বসে ইউসুফকে ১০ টাকা দিয়ে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও শ্রান্ত নীলু ভাবি বললেন, 'যা পাও খাবার নিয়ে আসো।' সেই থেকে মুক্তিযোদ্ধা রফিককে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নীলু ভাবির মুক্তিযুদ্ধ অভিযানের যাত্রা শুরু। কুষ্টিয়ায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত দেখা পেলেন স্বামী কর্নেল হুদার।

বয়রা সাবসেক্টরের অকুতোভয় কমান্ডার কর্নেল হুদার অধীনে যুদ্ধরত শহীদ সৈনিক নূর মোহাম্মদ বীরত্বের জন্য পেলেন 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব। সুবেদার মনিরুজ্জামান নীলু ভাবির সঙ্গে দেখা করে যুদ্ধের ময়দানে আবার যাওয়ার পর ২৭ জুন সম্মুখসমরে শহীদ হন। তাঁদের এবং অন্য আরও তিনজন অদম্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয় কাশীপুরে। ৮ নম্বর সেক্টরে এমনি অসংখ্য যুদ্ধের সমরনায়ক ছিলেন কর্নেল হুদা।

কর্নেল হুদা ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে দিন-রাত যুদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে। নভেম্বরের শেষের দিকে তাঁরা বাংলার মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেন। ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যশোর মুক্ত হলো। মুক্ত দেশের নির্মল বাতাস গ্রহণ করে ধন্য হলেন কর্নেল হুদা। যশোর শহরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হলো।

স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীতে কর্নেল হুদা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। সৈনিক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মাপের। বঙ্গবন্ধু তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তা সত্ত্বেও চাকরিরত অবস্থায় তিনি সেনাপ্রধানকে ডিঙিয়ে কখনোই নিজের জন্য কোনো বাড়তি ফায়দা নিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। প্রচণ্ড দুর্দিনেও তিনি যেমন নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি, তেমনি চাকরিরত অবস্থায় কখনো কারও অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করেননি। বরং আগ বাড়িয়ে ঝুঁকি নিয়ে ভালো কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছেন। নিজে যা আয় করতে সমর্থ হতেন, তা দিয়ে অত্যন্ত

সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ঠিক তেমনি তাঁর অধীন সবার কল্যাণ করতেও তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁকে চাকরি হারিয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হয়েছিল বলে মেজর ডালিম যখন ১৯৭৪ সালে চাকরি হারান, তখন তিনি তাঁর চাকরি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অত্যন্ত সংবেদনশীল মন ছিল তাঁর। তাই মেজর ডালিমকে তিনি সামলানোর জন্য তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত অনুরোধ করেন। আর বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার সংবাদে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। পাগলের মতো রংপুর-ঢাকা যাতায়াত করে এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞের যথাযথ বিচার হওয়ার জন্য শয়নে-শিবিরে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কোনো রকম ভণিতা না করেই তিনি খুনিদের একচোট নিলেন। তারপর অবশ্য নীরবে প্রতিকার করার কাজ শুরু করেন। তাঁর এ নীতিবোধ ও আনুগত্য তাঁকে চিরদিন স্মরণীয় করে রাখবে। অসুন্দরের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। জীবন দিয়ে তিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধকে কলুষমুক্ত রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর চাকরিজীবনে তিনি সেনা সদরে এজি ব্রাঞ্চ পুনর্গঠনে রাত-দিন পরিশ্রম করেন। তারপর তিনি বদলি হয়ে গেলেন কুমিল্লায়। বলতে গেলে তিনিই বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম কমান্ড্যান্ট। একেবারে শূন্য থেকে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। এরপর গেলেন রংপুরে ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব নিয়ে। এই সময় দেশে দ্রুত পটপরিবর্তনের ঘটনা ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক ডামাডোলের ঘোলা জলে হাবুডুবু খেয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল হুদা শেষ পর্যন্ত নিজের মানুষের কাছে কিন্তু হেরে গেলেন—চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন নিকটজন থেকে। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে ঘোড়া থেকে পড়ে চোয়াল ভেঙে গেল। পরবর্তী সময়ে চোয়ালে ২২টি সেলাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৫তম পিএমএ কোর্সের সঙ্গে অফিসার হিসেবে কমিশন পেলেন, অথচ শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে নিজের দেশে খড়ের মধ্যে পড়ে তাঁকে মরতে হলো। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! সেই সব সাংঘাতিক ঘটনাগুলো নীলু ভাবি চোখের পানির কালি দিয়ে লিখলেন গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো সুন্দরতম জীবনকাহিনি। প্রেম, ভালোবাসা, বীরত্ব, ষড়যন্ত্র, যন্ত্রণা, কুটিলতা—সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে তাঁর এই জীবনযুদ্ধের কাহিনিতে।

নীলু ভাবি কী অপূর্ব ভঙ্গিমায় তাঁদের বৈবাহিক, পারিবারিক, সামরিক ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের ঘটনার বর্ণনা করেছেন। সহজ-সরল ভাষায় অতি সাধারণ ঘটনাকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে যেভাবে বর্ণনা করে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব। প্রতি ছত্রে তিনি তাঁর প্রাণের ছোঁয়ায় প্রতিটি বর্ণনাকে করেছেন মহিমান্বিত। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া কলজে থেকে চুইয়ে চুইয়ে

পড়া রক্ত দিয়ে লিখলেন তাঁর জীবনালেখ্যের কাহিনি। তাঁর জীবনালেখ্যের উপাখ্যান প্রতিটি পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। সামান্য কয়েক বছরের বিবাহিত জীবন, অথচ একজন অপরজনকে কত গভীরভাবে ভালোবেসে সব ঝড়ঝঞ্ঝা রীতিমতো হাসিমুখে মোকাবিলা করেছেন নির্ভীক সৈনিকের মতো। কোনো ক্ষোভ নেই। আছে শুধু সজল চাহনির শুভ্র, স্নিগ্ধ ও মায়াবি এক মুখচ্ছবি।

কেন কর্নেল হুদাকে হত্যা করা হলো—এ প্রশ্ন করে নীলু ভাবি জেনারেল জিয়াকে পর্যুদস্ত করেছিলেন বারবার, তবু কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পাননি। কেমন করে তিনি তাঁর নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবেন! দেশপ্রেমিক, সাহসী এক মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার নাজমুল হুদার বীরত্বের কাহিনি, তাঁর দেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্য কি শেরেবাংলা নগরের খড়ের মধ্যেই অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে? সাহসী যোদ্ধা নীলু ভাবি তা কোনোক্রমেই হতে দেবেন না, তাই বুঝি এই লেখনী। ক্ষুরধার লেখনী স্বর্গীয় সুষমায় ভরপুর। কোথাও কোনো বাড়াবাড়ি নেই। অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। অনাহূত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্নেল হুদা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তারও বর্ণনা করেছেন তিনি সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে। নির্ভীক খালেদ মোশাররফকে যোগ্য সম্মান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকেই জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল সাফায়েত জামিল ও কর্নেল হুদা সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অথচ শেষরক্ষা তাঁরা করতে পারেননি। কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সশস্ত্রবাহিনীর চেইন অব কমান্ড আরও বেশি করে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। সেই ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির নির্মম শিকার হলেন জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা, লে. কর্নেল হায়দারসহ আরও অনেক অফিসার। তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে নীলু ভাবির অনুসন্ধিৎসু মন থেমে নেই। অবিরত তিনি সেই সময়কার ঘটনাবলিকে পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো মহামানবকে পরিজনসহ হত্যা করা হলো। কর্নেল হুদারা তার প্রতিকারকল্পে ব্রতী হলেন এবং সফলও হলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কাছে তাঁদেরকে জীবন দিতে হলো। এই অবিস্মরণীয় জীবন বিসর্জনের সঠিকভাবে মূল্যায়ন যাতে হয়, সে জন্যই নীলু ভাবির এই অনবদ্য লেখনী। যাতে করে ভবিষ্যৎ গবেষকরা সঠিক তথ্যাবলির ওপর ভর করে এসব ঘটনাবলি কষ্টিপাথরে যাচাই করতে সমর্থ হন। সম্ভবত সে জন্যই নীলু ভাবির সৃজনশীল লেখনীতে তাঁর দুর্দিনের সঙ্গী সাধারণ সৈনিক ইউসুফ, মুখলেস থেকে শুরু করে সিভিল সার্ভেন্ট তৌফিক ইলাহী, মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কমল সিদ্দিকী, পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুবউদ্দিন আহমেদ, জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান, মেজর জেনারেল

নূরুল ইসলাম শিশু—সবাই ঠাঁই পেয়েছেন তাঁর মনের মণিকোঠায়। জেনারেল জিয়া নীলু ভাবির বাগানের প্রশংসা করেছিলেন বেশ কয়েকবার। সেই প্রশংসার কথা উল্লেখ করতে তিনি কার্পণ্য করেননি। মেজর জেনারেল শিশুর মমতাভরা সাহায্য-সহযোগিতার কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। লেখিকা হিসেবে এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামীর সব বিজয়গাথা ধারণ করে অন্য সবার তির্যক দৃষ্টি, গঞ্জনা, তিরস্কার আর অবহেলাকে নীলকণ্ঠের মতো পান করে নীলাভ শাড়ি পরে গর্বিত স্বামীর অপরূপ স্ত্রীর রূপ ধারণ করে স্বামীর জন্য চিংড়ি মাছের ঝোল বানিয়ে আজও চোখের পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখেন প্রতিদিন। কী জানি, ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়া রাজবাড়ী শহরে যুদ্ধ চলাকালে যেমন দুয়ারে দাঁড়িয়ে নক করে সহাস্যে আলুথালু বেশে গৃহে প্রবেশ করে উচ্চ স্বরে 'নীলু আমার' বলে আবার যদি সবার অলক্ষে বলে ওঠে তাঁর প্রিয় গুডু।

'আকাশ', ফ্ল্যাট ৩এ, প্লট ২৪
বীর বিক্রম আমীন আহম্মেদ চৌধুরী সড়ক
(সড়ক পুরাতন ৭১), গুলশান ২, ঢাকা।

মেজর জেনারেল (অব.)
আমীন আহম্মেদ চৌধুরী *বীর বিক্রম*
ফেব্রুয়ারি ২০১১

উগোকি থেকে হুদাকে গ্রেপ্তার

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারির কথা। সেদিন ছিল ঈদ। সে সময় আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পাকিস্তানের শিয়ালকোটের পার্শ্ববর্তী উগোকি নামের একটি এলাকায় ছিলাম। আমার স্বামী খন্দকার নাজমুল হুদা একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে কর্মরত ছিলেন। ওখানে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি সেনা-ব্যারাক ছিল। চার মাস আগে তিনি সেখানে ঢাকা থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

ঈদের দিন আমরা শিয়ালকোট শহরে হুদার পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ঈদের দিন, খুশি ও আনন্দের দিন। কিন্তু সেদিন ওখানে গিয়ে দেখি, বাঙালি কারও মধ্যে সেই খুশি বা আনন্দ নেই। ওখানে যার সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়, দেখি, তারা বেশির ভাগই কিছুটা উদ্বিগ্ন। অনেকে বেশ আগ্রহসহকারে খবরের কাগজ পড়ছে। আমি মনে করলাম কোনো রাজনৈতিক খবর। রাজনীতিতে কিছু হয়তো ঘটেছে। যে কারণে তারা উদ্বিগ্ন।

রাজনীতি নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তাই খবরের কাগজে তারা কী পড়ছে, সেটা আমি জানার চেষ্টা করলাম না। এ ব্যাপারে হুদাকেও আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। শেষে আমরা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মালেক সাহেবের বাসায় গেলাম। মালেক সাহেব—মানে কর্নেল এম এ মালেক। তখন তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে মন্ত্রী ও ঢাকার মেয়র। মালেক সাহেবের ওখানে যাওয়ার পর হুদাকে তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখলাম। তাঁরা দুজন কী নিয়ে আলাপ করছেন, তা

আর আমি শুনলাম না। মালেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে হুদাকে আমার একটু চিন্তিতই মনে হতে লাগল। এতে আমি কিছুটা অবাক হলাম। কারণ এর আগে তাঁকে কখনো এ রকম চিন্তিত হতে দেখিনি। আমি হুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, তেমন কিছু না। এর বেশি কিছু আমাকে বললেন না। এরপর আমরা রাতের বেলা শহর থেকে উগোকিতে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে কাপড়চোপড় পরিবর্তন করে শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ হুদা আমাকে বললেন, 'আমাকে যদি হঠাৎ করে কোথাও চলে যেতে হয় বা আমাকে হয়তো কোনো সামরিক অনুশীলনে যেতে হবে, তাহলে তুমি ভয় পেয়ো না। আমার নিজের হাতে লেখা কিছু কাগজপত্র ঘরে আছে, তাতে সরকারবিরোধী কিছু কথাবার্তা হয়তো লেখা আছে। সেগুলো তো বটেই, আমার অন্য আর যত কাগজপত্র আছে, তার সবই তুমি পুড়িয়ে ফেলবে।' তাঁর এই কথার আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি তখন।

পরদিন আমি হুদার আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। সকাল সাতটার দিকে উঠে আমি যখন আমার বাচ্চার কাপড়চোপড় বদলাতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই বশির নামের আমাদের যে কাশ্মীরি ব্যাটমান ছিল, সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। সে এসে খবর দিল, হুদাকে এখনই ব্যারাকে সেনা-পোশাক পরে যেতে হবে। তাঁকে নেওয়ার জন্য জিপ এসেছে। ছেলেটির কথা শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। কারণ সেদিনও ওঁর ঈদের ছুটি ছিল। আমি হুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছুটির দিনে কেন তোমাকে তলব করেছে?

আমার এই কথায় তিনি কিছুটা হকচকিতই হলেন। দেখলাম, তিনি নিজেও একটু বিপর্যস্ত হয়ে গেছেন। আমার প্রশ্নের জবাবে একটু পর আত্মগতভাবে বললেন, 'ডেকেছে যখন, তখন তো যেতেই হবে!'

এরপর হুদা সেনা-পোশাক পরলেন। আরও কয়েক মিনিট আমার সঙ্গে খুঁটিনাটি কথা বললেন তিনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। চলে যাওয়ার সময় তাঁর হাতের ওমেগা ঘড়িটা খুলে আমাকে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার কাছে রাখো।' তারপর আবার বললেন, 'যদি আমাকে কোথাও যেতে হয়, ফিরতে দু-তিন দিন হয়তো দেরি হতে পারে। তুমি একদম চিন্তা করবে না।'

এই কথা বলে তিনি গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমি বাসায় থাকলাম। মনে করলাম, জরুরি কোনো কাজে হয়তো তিনি যাচ্ছেন। দুপুরে না এলেও সন্ধ্যায় বা রাতে অবশ্যই ফিরে আসবেন। সকাল-দুপুর এ নিয়ে তেমন আর

কিছু ভাবিনি। আমি আমার নিজের সাংসারিক কাজ আর ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম।

বিকেলের দিকে হঠাৎ দেখি, হুদার ব্যাটালিয়নের বাঙালি লেফটেন্যান্ট কাজী আমার কাছে এসেছে। ওর পুরো নাম এখন আমার মনে নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে পাকিস্তানেই থেকে যায়। ওকে দেখে আমি একটু অবাক হলাম। কাজী আমাকে বলল, স্যার জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে। এই সময় আমি যেন কোথাও কারও সঙ্গে কথা না বলি। ঘর থেকে যেন বেরও না হই। তারপর কাজী হুদার লেখা একটি চিঠিও আমার হাতে দিল। সেই চিঠিটা ছিল ইংরেজিতে লেখা। সেটা আজও আমার কাছে আছে। তাতে হুদা লিখেছিলেন...

> প্রিয় নীলু,
>
> মন খারাপ করে আমাকে লিখো না। আমি খুব ব্যস্ত, তাই তোমাকে দেখতে আসতে পারছি না। সবকিছু বোঝার চেষ্টা করো এবং ধৈর্য ধরো। মহান আল্লাহর কৃপায় শিগগিরই আমাদের একে অপরের সঙ্গে দেখা হবে এবং আমরা সুখী হব। আমি কাজীকে বলেছি তোমার খোঁজখবর রাখার জন্য। সে যা বলে, তুমি শুনো। অবাধ্য ও জেদি মেয়ের মতো আচরণ কোরো না। এটা বলা অপ্রয়োজন যে আমি তোমাকে কতটা অনুভব করি। মিষ্টি ছেলেকে আমার সহস্র চুমু।
>
> ১. নিজের এবং বাচ্চার যত্ন নিয়ো। কেমন আছে সে?
> ২. আমি তোমার সম্পর্কে তাঁর (কাজী) কাছ থেকে জানব। আমি যথেষ্ট সুস্থ, সবল ও উদ্যমী আছি।
>
> তোমাকে ও এতুকে[1] অনেক অনেক ভালোবাসা। আমাদের শিগগিরই দেখা হবে।
>
> তোমার প্রাণপ্রিয়
> গুডু[2]

চিঠিটা পেয়ে আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার মনে যে ভয় ছিল তা কেটে গেল। পরদিনও আমি আমার কাজ আর বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল। সন্ধ্যার পর থেকে কেন জানি বারবার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে

১. আমাদের প্রথম সন্তান, খন্দকার এহতেশামুল হুদা।
২. হুদার ডাকনাম।

মনে মনে ভেবেছি, এই বুঝি তিনি এলেন! এভাবে রাত বাড়তে থাকল। অনেক রাত পর্যন্ত আমি তাঁর অপেক্ষায় থাকলাম, কিন্তু তিনি এলেন না। তার পরদিনও এভাবেই কাটল। সেদিনও তিনি এলেন না। এভাবে তিন দিন পেরিয়ে গেল। তখন আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। উগোকিতে বাঙালি যারা ছিল, তাদের দু-তিনজন যাদের চিনি, তারা কে কোথায় থাকে, আমি জানতাম না। তা ছাড়া লেফটেন্যান্ট কাজী আমাকে বলেছিল, হুদা বলেছেন, আমি যেন কারও সঙ্গে এ নিয়ে কথা না বলি। এই অবস্থায় কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কলকাতা থেকে ঢাকায় এবং বিয়ে

সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আমার পরিচিতজন বলতে আমার মেজো ভাশুর ছিলেন। তিনি চাকরিসূত্রে সেখানে ছিলেন। হুদার আত্মীয়স্বজন আরও কয়েকজন অবশ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে আমি তখন চিনতাম না। আমার বাবার বাড়ি ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর মা-বাবাসহ আমাদের বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে আসেননি। তাঁরা থেকে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গেই। এখনো আমার বাবা-মায়ের দিককার অনেক স্বজন সেখানেই বসবাস করছেন।

আমার বাবার পৈতৃক বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের সালার গ্রামে। সালার ছিল একসময় সমৃদ্ধ একটি গ্রাম। সেখানকার অনেকে আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। আমার জন্ম অবশ্য কলকাতায়, ১৯৪১ সালের ৮ জুন। সেই সময় আমার বাবা কলকাতায় থাকতেন। আমার বাবার নাম আবদুল্লাহ মুসা কাজেম। মায়ের নাম মালেকা খাতুন।

আমার শৈশব আর কৈশোরকাল কেটেছে কলকাতাতেই। আমার পড়াশোনার শুরু কলকাতাতে, শেষও হয় সেখানেই। তবে আমি খুব বেশি একটা লেখাপড়া করতে পারিনি। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করার পর আমার পক্ষে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য আমি কলকাতার একটা আর্ট স্কুলে চিত্রকলার ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

১৯৬৫ সালে আমি আমার খালাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলাম। সেই সময় আমি মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি বা বুঝিনি যে এরপর আমাকে চিরদিনের জন্য পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশে থেকে যেতে হবে।

কলকাতা থেকে যেদিন আমি ঢাকায় আসি, সেই তারিখটা এখনো আমার মনে আছে। সেদিন ছিল ৩০ জানুয়ারি। সন্ধ্যা ছয়টায় আমার বাবা আমাকে দমদম বিমানবন্দর থেকে পিআইএর একটি ফ্লাইটে উঠিয়ে দেন। ঢাকার তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে পৌঁছার পর আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহ আমাকে খালার বাড়িতে নিয়ে যান।

বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহ ১৯৫৫ সাল থেকেই ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় চলে এসেছিলেন। ভারত ভাগের আগে তিনি দেরাদুনের রয়েল ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজের জুনিয়র সেকশনের শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ হয়, তখন তিনি আমাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বলা যায়, নিখোঁজই ছিলেন। আমার বাবা তাঁর কোনো খোঁজই পাচ্ছিলেন না। প্রায় তিন মাস পর বাবা জানতে পারেন, ওই কলেজের সব মুসলমান শিক্ষার্থীকে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা সেখান থেকে তাঁকে ফেরত আনিয়ে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করিয়ে দেন। ওখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ঢাকাতেই থেকে যান। পরে তিনি বিদেশি তেল কোম্পানি এসওতে চাকরি নেন। ঢাকায় তিনি থাকতেন ওয়ারীর ১৬ নম্বর লারমিনি স্ট্রিটে।

আর আমার খালার বাড়ি ছিল ২৪ টিপু সুলতান রোডে। তাঁর স্বামীর নাম মোকাররম হোসেন। দেশভাগের আগে তিনি কলকাতাতেই সরকারি চাকরি করতেন। পূর্ব বাংলারই মানুষ ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় তিনি খালা, ছেলেমেয়েসহ ঢাকায় চলে আসেন। খালুর পৈতৃক বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। ১৯৪৮ সালে খালু হঠাৎ মারা যান। এরপর আমার খালা মোমেনা খাতুন তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আবার কলকাতায় আমার নানার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নানার বাড়িতে ছিলেন। তারপর আবার তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

খালা ঢাকায় আসার কিছুদিন পর আমার ওই খালাতো বোনের বিয়ে ঠিক হয়। আমার খালাতো বোনের নাম ছিল ফরিদা। ফরিদার সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতাতেই। সেই থেকে আমরা দুজন আজ ৬০/৬১ বছর ধরে সুখে-দুঃখে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। ও আমার

অনেক ভালোবাসার বোন। ওর বিয়ে হয় আমি ঢাকায় আসার কিছুদিন পর। সেই সময় আমার মাও ঢাকায় এসেছিলেন।

আমি ঢাকায় আসার পর একদিন ফরিদার এক চাচাতো ভাই ফরিদাদের বাসায় বেড়াতে আসেন। ফরিদা তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেও আমি তখন তাঁর সামনে যেতে কেন জানি লজ্জা পেয়েছিলাম। সেদিন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেবল মুহূর্তের জন্য তাঁকে আমি দেখেছিলাম। সেই দেখাতেই মনে হয়েছিল, দেখতে তিনি বেশ সুদর্শন ও স্মার্ট। পরে আমি ফরিদাকে সে কথা বলেওছিলাম। এ কথা শুনে ফরিদা আমাকে বলেছিল, 'তুমি তো কলকাতায় মানুষ হয়েছ! তাই এ রকম বলছ।'

সেদিন আমি হাসতে হাসতে ফরিদাকে বলেছিলাম, 'তুমি তো তোমার চাচাতো ভাইকেই বিয়ে করতে পারতে। মুসলমানদের মধ্যে তো চাচাতো-খালাতো ভাইবোনের সঙ্গেও বিয়ে হতে পারে। তুমি কেন ওকে বিয়ে করলে না?'

ফরিদা আমাকে বলেছিল, 'না, আমার ও রকম কোনো ইচ্ছে নেই। আর ওভাবে আমি কখনো ভাবিওনি।'

সেদিন এ কথা বলার সময় এবং তার পরেও আমি কখনোই ভাবিনি যে ফরিদার সেই চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হবে। তবে এটা সত্যি যে, প্রথম দেখার সময়ই ফরিদার চাচাতো ভাইকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। তাঁর নাম ছিল খন্দকার নাজমুল হুদা। ডাকনাম গুডু। তখন তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা, লেফটেন্যান্ট। ফরিদার বাবা এবং হুদার বাবা আপন ভাই ছিলেন। তখন হুদার কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রামে। মাঝেমধ্যেই তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসতেন। ঢাকায় এলে তিনি ফরিদাদের বাসায়ও বেড়াতে আসতেন। কয়েক দিন পর হুদা আবার ফরিদাদের বাসায় আসেন। তখন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

এদিকে ফরিদার বিয়ের পর আমি কয়েক মাসের জন্য ঢাকায় থেকে যাই। তারপর আর কলকাতায় ফিরতে পারলাম না। কারণ ৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত যুদ্ধ। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিমান ও রেলসহ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের কারণে আমি আটকা পড়ে যাই ঢাকায়। এর পর থেকে হুদার সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হতে থাকে। এই দেখা-সাক্ষাতের একপর্যায়ে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি এবং আমরা একে অপরকে চিঠিও লিখতে থাকি। তারপর হুদা আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং আমিও তাঁর

প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হই। সত্যি বলতে কি, আমিও তাঁকে মনে মনে তখন ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমি রাজি হওয়ার পর তিনি আমাকে বিয়ে করার জন্য আমার পরিবারের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন।

সেই সময় আমি, আমার মা আর বড় ভাই শুধু ঢাকায়। বাবা ও আমার অন্য ভাইয়েরা কলকাতায়। এই অবস্থায় হুদা খালার কাছে আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। তাঁর মাধ্যমেই আমার বাবার কাছে বিয়ের এই প্রস্তাবের কথা যায়। বাবা এমনকি মাও এতে প্রথমে রাজি হননি। তাঁদের ভয় ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমি হয়তো আর কোনো দিন ভারতে যেতে পারব না। তাঁদের এই আশঙ্কা তখন অমূলকও ছিল না। পরে তো ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিয়ের পর ছয় বছরের মধ্যে আমি আর ভারতে যেতে পারিনি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, সেই আমি, ১৯৭১ সালে অগুনতি বাঙালির সঙ্গে ভারতে যাওয়ার পর সাদর অভ্যর্থনা ও আশ্রয় পেয়েছিলাম।

যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত মা-বাবার আপত্তি সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যেই হুদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের বিয়ে হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৬৬ সালে। বিয়ের পর দিন কয়েক আমরা আমার বড় ভাইয়ের বাড়িতে থাকলাম। এই সময় হুদা ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলি হন। ঢাকায় এসে তিনি গ্রিন রোডে একটা বাড়ি ভাড়া নেন। তখন আমি সেই বাড়িতে গিয়ে উঠি। ওই বাড়িটা ছিল তিনতলা। নিচতলায় থাকতেন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান (পরে মেজর জেনারেল, ঢাকার মেয়র ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী)। তিনতলায় বাড়ির মালিক নিজে থাকতেন। দোতলা হুদা ভাড়া নিয়েছিলেন। গ্রিন রোডে আসার পর হুদা আমার শাশুড়িকেও আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য নিয়ে আসেন।

এখানে ভালোই কাটছিল আমাদের দিন। হুদা অফিসে চলে গেলে আমি ছবি আঁকতাম। যখন ছবি আঁকতাম না, তখন আমি ও আমার শাশুড়ি দুজনে টুকটাক রান্নাবান্না ও গল্পসল্প করে সময় পার করতাম। কিছুদিন পর আমি লক্ষ করলাম, হুদা যখন বাসায় থাকেন তখন বেশির ভাগ সময়ই অন্যমনস্ক থাকেন। ব্যাপারটা লক্ষ করে কিছুটা অবাক হলেও আমি চিন্তিত হইনি। কয়েক দিন পর আমাদের বাসায় মাঝেমধ্যে দু-চারজন অচেনা লোকের আনাগোনা লক্ষ করতে থাকি। রাতের দিকেই তাঁরা বেশি আসতেন। তাঁরা এলে হুদা ঘরের আলো নিভিয়ে প্রায় অনুচ্চ স্বরে তাঁদের সঙ্গে কী যে সব কথাবার্তা বলতেন, বুঝতে পারতাম না। যাঁরা আসতেন তাঁদের তখন আমি

চিনতামও না। এর পর থেকে হুদা মাঝেমধ্যে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে যেতেন। কেন যেতেন—সে ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছুই বলতেন না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, সেনাবাহিনীর কোনো কাজেই হয়তো যান। যদিও তিনি কোথায় যান, কারা তাঁর কাছে আসেন—এসব ভেবে আমার খুব খটকা লাগত। পরে আস্তে আস্তে টের পেলাম, তাঁর কাছে কারা আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা এম রমিজ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। মীর্জা রমিজ তখন পিআইএতে কর্মরত ছিলেন। নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (তিনি তখন প্রেষণে পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থায় কর্মরত ছিলেন), ক্যাপ্টেন আলিম। ক্যাপ্টেন আলিমের পুরো নাম এম আবদুল আলিম ভূঁইয়া। পরে হুদাদের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়, সেই মামলায় তাঁকে সাক্ষী করা হয়। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানেই থেকে যান। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানও আসতেন (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। এরপর রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন)। নুরুজ্জামান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই গঠন করা হয়েছিল এই বাহিনী। ১৯৭৫ সালে সরকারের পরিবর্তন হলে এই বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। যাঁদের নাম বললাম তাঁদের সবার নাম আমি তখন জানতাম না, পরে জেনেছি। আরও অনেকেই সে সময় তাঁর কাছে আসতেন। সবার নাম এখন আমি আর মনে করতে পারছি না। তাঁদের এই দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা থেকে আমি কিছুটা চিন্তিত হতাম ঠিকই, কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দিতাম না।

তাঁদের এই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা চলল ১৯৬৭ সালের মে মাস থেকে শুরু করে যত দিন হুদা ঢাকায় ছিলেন, তত দিন অর্থাৎ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এই সময় হুদাকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। আমি তখন সন্তানসম্ভবা। ওই মাসেই আমার সন্তান হওয়ার কথা। এই অবস্থায় তিনি পাকিস্তানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলেও যাওয়ার দিন পিছিয়ে দেন। ১৮ আগস্ট আমাদের প্রথম সন্তান এহতেশামের জন্ম হয়। এরপর তিনি একা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। আমি পরে বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে যাই। ১২ অক্টোবর প্রথমে যাই লাহোরে। সেখানে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা কর্মকর্তা সফি ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠি। সফি ভাই—মানে কে এম সফিউল্লাহ। তাঁর বাড়িতে আমি দিন কয়েক থাকি। তিনি তখন মেজর ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সফি ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। ওখান থেকে দিন কয়েক পর শিয়ালকোটে যাই।

সেখানে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মালেক সাহেবের বাড়িতে কয়েক দিন থাকি। হুদাকে বদলি করা হয়েছিল শিয়ালকোটে। সেখানে শহর থেকে মাইল দশেক দূরের একটা গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা ছোট সেনাশিবির বা ঘাঁটি ছিল। গ্রামটির নাম ছিল উগোকি। সেটা এখন আছে কি না জানি না। হুদা ওই সেনাশিবিরে কর্মরত ছিলেন। সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হওয়ার কয়েক দিন পর হুদা আমাকে মালেক সাহেবের বাড়ি থেকে নিয়ে যান। সেনা-ব্যারাকের কাছাকাছি স্কুলবাড়ির মতো দেখতে একটা বাড়ির অর্ধেকটায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। সেখানেই আমরা থাকতে শুরু করলাম।

উগোকির ওই সেনাশিবিরে বাঙালি বোধ হয় মাত্র কয়েকজন ছিলেন। তাঁদের এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি, বালুচ, পাঠান সেনাকর্মকর্তা যারা ছিলেন তাঁদের তিন/চারজন ছাড়া আর কাউকে আমি চিনতাম না। শিয়ালকোট শহরে অবশ্য বেশ কিছু বাঙালি ছিলেন। সেখান থেকে কোনো বাঙালি তো দূরের কথা, স্থানীয়রাও কাজ ছাড়া ওদিকে বড্ড একটা আসত না। কাছাকাছি কোনো বসতি না থাকায় ওখানে সাধারণ মানুষের আনাগোনাও তেমন ছিল না। তাই জায়গাটা ছিল খুবই নিরিবিলি। তার পরও ওখানে আমাদের দিন ভালোই কাটছিল। হুদা সকালে নাশতা খেয়ে ব্যারাকের অফিসে চলে যেতেন এবং দুপুরে বাসায় এসে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার সেখানে চলে যেতেন। ছুটির পর সরাসরি বাসায় চলে আসতেন। আমাদের বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন কাশ্মীরি মহিলা ছিলেন। রান্নাবান্না তেমন কিছু আমাকে করতে হতো না। কখনো বাচ্চাকে নিয়ে আমি সময় কাটাতাম। বাইরেও কোথাও যেতাম না। ঘরেই থাকতাম। ওখানেও আমি ছবি আঁকতাম। উগোকিতেও আমি অনেক ছবি এঁকেছি। আমার ইচ্ছা ছিল ছবির একটা প্রদর্শনী করার। ছবি আঁকার জন্য হুদাও আমাকে উৎসাহ দিতেন। যখন ঢাকায় ছিলাম তখন একবার তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কাছেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পরামর্শের জন্য। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমার আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা সম্ভব হয়নি। '৬৮ সাল থেকে আমার জীবনে একের পর এক এসেছে নানা অভিঘাত। তারপর আমি আর তেমন ছবি আঁকতে পারিনি। আমার আঁকা সেই ছবিগুলোর বেশির ভাগ ১৯৭১ সালে লুট হয়ে যায়।

উগোকিতে হঠাৎ আমার মেজো ভাশুর এলেন

উগোকিতে হুদার কাছে তেমন কেউ আসত না। লে. কাজী কয়েকবার এসেছে। সে বাঙালি ছিল। ওকে আমি চিনতাম। আরেকজনকে আমি চিনতাম। তার নাম মজির। সে হুদার ব্যাটালিয়নেই ছিল। মজির মাঝেমধ্যে আমাদের বাসায় আসত। ওর বাড়ি ছিল গোপালগঞ্জের কুশলা গ্রামে।

১৯৬৮ সালের ৪ জানুয়ারির ওই ঘটনার পর সেই মজির হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় আসে। সেদিন সম্ভবত ৭ জানুয়ারি ছিল। দেখি, তাঁর হাতে একটা বড় বাটি। মজির সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার জন্য মাছ রান্না করে নিয়ে এসেছি।' তারপর সে বলল, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি তো এখানে আছি। যদি ভয় পান, তাহলে আমি আপনার এখানে এসে থাকব।'

মজিরের এ কথায় একটু অবাকই হলাম। আমি ওকে বললাম, এখানে তো কোনো ভয় নেই। ভয় পাব কেন? আমি এ কথা বলার পর মজির আমাকে আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর সে চলে গেল। তারপর আরও দুই দিন কেটে গেল। দেখি, হুদার কোনো খোঁজখবরই নেই। তখন আমি বেশ চিন্তাতেই পড়ে গেলাম।

ওই দিনই (৭ জানুয়ারি) দৈনিক পত্রিকায় আবার সরকারি একটি প্রেসনোট ছাপা হয়। সেই প্রেসনোটে জানানো হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারত-সমর্থিত একটি ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাঁদের গ্রেপ্তার

করা হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও সেদিন পত্রিকায় ছাপা হয়। এই খবর আমি তখন পড়িনি। জানতেও পারিনি। ওই তালিকার মধ্যে অবশ্য হুদার নাম ছিল না। তার পরও আমি ছাড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওখানকার বাঙালি সবাই ততক্ষণে জেনে গেছে, হুদাকেও ওই কারণে আটক করা হয়েছে। শুধু আমিই কোনো খবর পাইনি। তাই সারা দিন নানা চিন্তা করছি। ভাবছি, উনি সত্যি হয়তো জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন! তাঁকে আটক করা হবে বা হতে পারে—এ রকম কিছু ভুলেও কোনো সময় ভাবিনি। যখন বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকত বা আমার কোনো কিছু করার থাকত না, তখন আমি জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। দিনের বেলায় একটু পর পর জানলার পাশে দাঁড়িয়ে যত দূর চোখ যায়, তাকিয়ে থাকতাম। হুদার গাড়ি আসে কি না, সেটা দেখার জন্যই ওখানে গিয়ে দাঁড়াতাম। ৫ তারিখের পর থেকে রাতে বেশির ভাগ সময় জেগেই থাকতাম। ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আমি খুব একটা ঘুমাইনি। শেষ দুই দিন প্রায়ই জানলা ধরে লুকিয়ে শুধু কাঁদতাম।

৯ জানুয়ারি রাত সাতটা-আটটার দিকে একটা গাড়ি এসে আমাদের বাসার সামনে থামে। তার শব্দে আমি দৌড়ে জানলার কাছে গেলাম। ভাবলাম, হুদা এসেছে। কিন্তু গিয়ে দেখি, আমার মেজো ভাশুর আর তাঁর সঙ্গে আরেকজন, তাঁরা গাড়ি থেকে নামছেন। তাঁদের দেখে আমি খুব অবাক যেমন হলাম, তেমনই খুব ভয়ও পেলাম। কেন জানি আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম।

মেজো ভাশুরের সঙ্গে সেই ভদ্রলোক যিনি ছিলেন, তাঁর নাম এখন আমার মনে নেই। আমার মেজো ভাশুরের নাম ছিল খন্দকার কামরুল হুদা। তিনি তখন করাচিতে হাবিব ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। পরে হাবিব ব্যাংকের চিফ কন্ট্রোলার হন। ১৯৭৫ সালে হুদা মারা যাওয়ার দেড় বছর পর তিনি কক্সবাজারে ফ্লাইং ক্লাবের এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। যা-ই হোক, দরজা খুলে আমি মেজো ভাশুরকে সালাম দিলাম। তাঁরা দুজন ঘরে এসে চুপচাপ বসলেন। বসার পর আমার ভাশুর, আমি কেমন আছি, বাচ্চা কেমন আছে ইত্যাদি টুকটাক কিছু কথা বললেন। আমি তাঁদের খাবারের আয়োজন করার জন্য ভেতরে যাচ্ছি, এমন সময় আমার ভাশুর আমাকে ডেকে বললেন, 'বসো।'

আমি বসার পর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কাল করাচি যাবে। আমরা সকালেই লাহোর যাব। তারপর ওখান থেকে যাব করাচি। তুমি তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করে ফেলো।'

আমি বললাম, 'কেন?'

তিনি বললেন, 'আরও অনেক কথা আছে। পরে বলব।' তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে করাচির প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে লাহোরেই থাকব। সেনা কর্তৃপক্ষ গুডুকে ইসলামাবাদ নিয়ে গেছে একটা জরুরি কাজে। সে আর এখানে ফিরে আসবে না।'

মেজো ভাশুরের শেষ কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা একটা অজানা আশঙ্কায় ধক করে উঠল। তাঁর কাছে আমি জানতে চাইলাম কী হয়েছে। কিন্তু তিনি আমাকে আর কিছুই বললেন না। আমি তাদের জন্য খাবারের আয়োজন করতে গেলাম। তাঁরা খাওয়াদাওয়া করার পর আমি আমাদের বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাশ্মীরি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে বেঁধেছেঁদে ফেললাম। তাঁরাও আমাকে এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করলেন। দুটো সুটকেসে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ভরে রাখলাম, যার বেশির ভাগই ছিল আমার বাচ্চার কাপড়চোপড়। বাসার আসবাব আমাদের ছিল না। ওগুলো ছিল ভাড়া করা। সকালে রওনা হওয়ার আগে মনে পড়ল আমার সোনার গয়নাপত্রের কথা। সেগুলো শিয়ালকোট শহরে একটা ব্যাংকের লকারে রাখা ছিল। সে কথা আমি আমার মেজো ভাশুরকে বললে তিনি আমাকে সেগুলো ওখান থেকে নিয়ে নিতে বললেন। তাই রওনা হয়ে প্রথমে আমরা শিয়ালকোট শহরে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি ব্যাংকের লকার থেকে সেগুলো নিয়ে তারপর লাহোরে গেলাম।

গিয়ে আমার ভাশুর উঠলেন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা শামসুজ্জামান সাহেবের বাসায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

লাহোরে গিয়ে আমি নানা রকম কথা শুনতে লাগলাম। ওখানে আরও কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা হলো। দেখি, তাঁরাও একই রকম কথাবার্তা বলছেন। বাঙালি হয়েও তাঁরা হুদাদের প্রসঙ্গ তুলে বলছিলেন, 'তাঁরা বেইমান, তাঁরা বিশ্বাসঘাতক। তাঁদের গুলি করে মারা উচিত, না-হয় ফাঁসি দেওয়া উচিত।' আমার সামনেই তাঁরা এমন সব মন্তব্য করছিলেন।

এজাতীয় কথা শুনে আমি রীতিমতো চমকে গেলাম। ভাবলাম, এ আমি কাদের বাড়ি এলাম! বাঙালি হয়ে অন্য বাঙালি সম্পর্কে, তাও আবার আমার সামনে, কীভাবে তাঁরা এসব কথা বলছেন! তাঁদের

কথাবার্তা শুনে আমি খুব ভয়ও পেলাম। আর আমি বুঝেও গেলাম, যেকোনো একটা ঘটনায় হুদাদের বন্দী করা হয়েছে।

সত্যি বলতে কি, ওখানকার ওই পরিবেশে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এ কথা আমি আমার মেজো ভাশুরকে জানালে তিনি প্লেনের টিকিটের জন্য অপেক্ষা না করে সেদিনই আমাকে করাচিগামী ট্রেনে তুলে দিলেন। তিনি লাহোরেই থেকে গেলেন। আমাকে বললেন, ওখান থেকে তিনি রাওয়ালপিন্ডি যাবেন।

ওই ট্রেনে উঠে আমার খুব কান্না পেল। আমার কান্না দেখে সহযাত্রী একজন আমার বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমার কেউ কি মারা গেছে?' কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না। রাতে করাচিতে পৌঁছে আমি আমার মেজো ভাশুরের বাড়িতে গেলাম।

আমি তখনো সবকিছু বিশদভাবে জানতে পারিনি। দু-তিন দিন পর আমার মেজো ভাশুরও পিন্ডি থেকে এলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে আসলে কী ঘটেছে জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে খোলাখুলি কিছু বললেন না। কেবল এটুকুই বললেন যে, 'ও (হুদা) সরকারি কাজে ইসলামাবাদে আছে।'

করাচিতে আমার পরিচিত বা জানা দু-একজন যাঁরা ওখানে থাকতেন, তাঁরা কে কোথায় থাকেন, জানা ছিল না। কারও সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করতে পারলাম না। এই বাসায় পরিচিত যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরাও কেউ কিছু আমাকে বলেন না। মেজো ভাশুর যা বলেন, সেটুকু শুনেই আমাকে চুপচাপ থাকতে হয়। আমার মনের অবস্থা তখন যে কী, সেটা এখন আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

করাচিতে কয়েক দিন পর একটা ঘটনা ঘটল।

হুদার এক ফুফাতো বোনের স্বামী, তাঁর নাম আকবর কবীর (খ্যাতনামা লেখক ও রাজনীতিক হুমায়ুন কবীরের ভাই। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে উপদেষ্টা ছিলেন)। তাঁদের পৈতৃক বাড়ি ফরিদপুরে। তিনি তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। ইসলামাবাদে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমার ভাশুর যোগাযোগ রেখেছিলেন। আকবর কবীরের ঠিকানায় হুদা দুটি চিঠি পাঠান। ইংরেজিতে লেখা। তার একটি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। তাতে হুদা লিখেছেন, মেজো ভাশুরের ওখানে আমার থাকতে ভালো না লাগলে আমি যেন ঢাকায় আমার বড় ভাইয়ের ওখানে চলে যাই। হুদা তখন জানতে

পেরেছিলেন যে তাঁকেসহ আটক অন্যদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হবে। সে কারণেই তিনি আমাকে করাচিতে না থেকে ঢাকায় চলে যেতে বললেন।

আরেকটি চিঠি ছিল মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদাকে লেখা। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু। এ ছাড়া ১৯ জানুয়ারিতে হুদা ওঁর বড় ভাই অর্থাৎ আমার বড় ভাশুরকেও একটি চিঠি লেখেন। হুদা আমার বড় ভাশুরকে দাদা বলে সম্বোধন করতেন। সেই চিঠিটি তিনি কবে পান, সেটা আমি জানি না। আমি ঢাকায় আসার পর তিনি আমাকে ওই চিঠিটি দেন। এই চিঠিও ইংরেজিতে লেখা ছিল। এই চিঠি তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে লিখেছিলেন, না গোপনে পাঠিয়েছিলেন, তা আমি জানি না। সেই চিঠি তিনটির বাংলা অনুবাদ এ রকম :

> নীলু,
>
> মনি[১] সব সময় 'মহালয়া' অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করত। একদিন সকালে আমরা এটা শুনেছিলাম। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান। এটা তোমার কখনোই মিস করা ঠিক হবে না। আমার দিনগুলো খুব একঘেয়েমিতে কেটে যাচ্ছে। যদি রেকর্ড প্লেয়ার নিয়ে থাকতে পারতাম! সোমবার তোমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি, সেটা পেয়েছ। এতু কী করছে? তাকে আমার ভালোবাসা।
>
> আমি প্রায়ই ভাবি, যদি সময়গুলো নষ্ট না করে গভীরভাবে পড়াশোনা ও লিখতে পারতাম। তবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, কী লিখব। তুমি কি আমাকে কোনো ধারণা দিতে পারো? আশা করি, ওই সব ঘুমের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছ। আমার অনুরোধ, পরে আর কখনো ঘুমের ওষুধ খেয়ো না। খোকন কি শিগগিরই আসছে?
>
> *রোমান সাম্রাজ্যের পতন* (ফল অব রোমান এম্পায়ার) ছবিটি কি তুমি দেখেছিলে? দেখে থাকলে নিশ্চয় উপভোগ করেছ। চেকটি পেয়েছিলে কি না জানিয়ো। আশা করি, আমাদের জীবন বিমা আবার চালু হবে। পরবর্তী প্রাইজবন্ডের ড্রয়ের আগে সব টাকা দিয়ে বন্ড কিনে ফেলো। যদি ভাগ্য সহায় না হয়, তাহলে সেটা আবার ক্যাশে পরিণত করতে পারবে। নিয়মিত ভাগ্য যাচাই করা ভালো। তুমি গত সপ্তাহে ময়না খালার ওখানে গিয়েছিলে কি?
>
> আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে ৪ অক্টোবরের জন্য অপেক্ষায় আছি।

১. মোজাম্মেল হোসেন। আমার খালাতো ও হুদার চাচাতো ভাই।

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন।' এটা আমাকে একঘেয়েমি ও বিষণ্নতা থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

তোমরা নিশ্চয় সবাই ভালো আছ। তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ো।

ভালোবাসাসহ
গুডু

আমাকে ১৫ রুপি পাঠিয়ো

আমার মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদাকে লেখা চিঠি :

প্রযত্নে : স্টেশন হেডকোয়ার্টার্স
রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাস
১৬ জানুয়ারি '৬৮
রাত সাড়ে আটটা

প্রিয় আবু,

আজ বিকেলে আমি জানলাম, তুমি এসে নীলুকে তোমার সঙ্গে করাচি নিয়ে এসেছ। এই খবর আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে। আশা করি, তোমরা নিরাপদে পৌঁছেছ এবং ওরা সবাই ভালো আছে। আজ তোমার ঠিকানায় নীলুকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। আশা করি, সেটাও তুমি পেয়েছ। ওই চিঠিতে আমি তাকে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আমি মনে করি, তার ঢাকায় ফিরে যাওয়া দরকার এবং আমি মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই তার থাকা উচিত। কিছুদিনের মধ্যেই আমি চেক বই পাব। তখন আমি তাকে চেক পাঠাব। বাবু এখন কেমন আছে? তাকে চুমু।

স্বাভাবিকভাবেই তোমরা সবাই আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তা কোরো না; আমার বিশ্বাস, খুব দ্রুতই আমি মুক্ত হব। তবে সেটা ঠিক কখন, সে সম্পর্কে তোমাকে এখনই কোনো ধারণা দিতে পারছি না। এখন তোমরা সবাই যা করতে পারো, তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা, যাতে তিনি আমার ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ এবং দয়া প্রদর্শন করেন। আমি খুব ভালোভাবেই নীলুর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তাকে যতটা সম্ভব হাসিখুশি রাখার চেষ্টা কোরো। আমি নিজেকে খুব হতভাগা ও অপরাধী অনুভব করি। তবে আমি কিছুটা দুশ্চিন্তামুক্ত এই কারণে যে, সে তোমার সঙ্গে আছে। আমাকে

তাড়াতাড়ি জানাও, কখন এবং কীভাবে তোমরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানে যাচ্ছ? আমাকে এ ব্যাপারে এবং কখন ঢাকায় পৌঁছাবে, সে কথা জানাও। আমার ধারণা, মা ও দাদা আমার ব্যাপারে কিছু জানেন না। তোমার কাছে অনুরোধ, এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু জানিয়ো না। তাঁদের শুধু জানাও, আমি রাওয়ালপিন্ডিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছি; সে কারণে আমি তাঁদের লিখতে পারছি না। সবকিছু আপাতত গোপন রেখো।

আমি শারীরিকভাবে ভালো আছি এবং কর্তৃপক্ষ আমার দেখাশোনা করছে। কিন্তু মানসিকভাবে আমি কেমন থাকতে পারি, সেটা তুমি খুব ভালোভাবেই অনুমান করতে পারো। আমার বিশ্বাস, আল্লাহর রহমতে সবকিছু খুব তাড়াতাড়িই ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে বিস্তারিত লিখো এবং নীলুকে বলো আমাকে ইংরেজিতে লিখতে। পপি[১] ভাবি, টুকু[২], লোপামণি[৩] কেমন আছে? তাদের আমার ভালোবাসা দিয়ো এবং পপি ভাবিকে আমার জন্য দোয়া করতে বোলো। আশা করি, খুব দ্রুত তোমার ও নীলুর কাছ থেকে চিঠি পাব। অনেক ভালোবাসা এবং শুভ কামনাসহ

গুডু

আমার বড় ভাশুর খন্দকার নুরুল হুদাকে লেখা চিঠি :

প্রযত্নে : স্টেশন হেডকোয়ার্টার্স
রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাস
১৯ জানুয়ারি '৬৮
রাত আটটা

প্রিয় দাদা,

আমার বহুদিনের নীরবতায় তোমরা সবাই চিন্তিত থাকতে পারো। আমি দুঃখিত, তোমাদের জানাতে পারিনি যে আমি কিছু সমস্যায় ও বিপদে আছি এবং বর্তমানে পিন্ডিতে অবস্থান করছি। আমার বিপদ সম্পর্কে

১. খন্দকার কামরুল হুদার (আবু ভাই) স্ত্রী।
২. নাইমুল হুদা। খন্দকার কামরুল হুদার ছেলে।
৩. লোপা হুদা। খন্দকার কামরুল হুদার মেয়ে।

তোমাকে লিখতে পারছি না, কিন্তু এটা গুরুতর। আবু শিয়ালকোটে এসেছিল। ও নীলুকে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। মনে হয়, সে তাঁর সঙ্গে ঢাকায় ফিরে যাবে অথবা ইতিমধ্যে সেখানে গিয়েছে। আবুর কাছ থেকে তুমি সব জানতে পারবে। কিন্তু এ সবকিছুই শুধু তোমার মধ্যে রেখো, কোনো অবস্থাতেই মাকে জানতে দিয়ো না। হাজার হোক, আমি একটা দায়িত্বে আছি। তুমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা কোরো, যাতে তিনি আমার ওপর দয়া দেখান এবং আমি এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি। যতটুকু সম্ভব দোয়া কোরো।

তুমি খুব ভালোভাবেই আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছ, বিশেষ করে, নীলু, বাচ্চা ও ওদের পুরো ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমি জানি না, আমার কত দিন এখানে থাকতে হবে। মাঝেমধ্যে নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। নিজের জন্য নিজেই প্রার্থনা করছি। শুধু তাঁর দয়া আমাকে এ সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। এ মাসের* ৫ তারিখে শিয়ালকোট ছাড়ার পর থেকে তোমাদের ও নীলুর কোনো খবর জানি না।

আমার জন্য দোয়া কোরো। ওপরের ঠিকানায় তোমাদের সবার সম্পর্কে আমাকে একটি ছোট চিঠি লিখো।

আশা করি ভালো আছ। দয়া করে এ বিষয়টা সবার কাছে গোপন রেখো।

শ্রদ্ধাসহ
গুডু

* জানুয়ারি ১৯৬৮।

পাকিস্তান থেকে ঢাকায়

হুদার চিঠি পাওয়ার পর আমি ঢাকায় চলে এলাম। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে আমি আমার মেজো ভাশুরের সঙ্গে লাহোরে যাই। করাচিতে পৌঁছাই ১১ তারিখে। এর দিন দশেক পর অর্থাৎ ২১-২২ তারিখের দিকে আমি ঢাকায় আসি। আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহ সেই সময় মগবাজারে ইস্পাহানি কলোনিতে থাকতেন। ঢাকায় এসে তাঁর ওখানেই আমি উঠলাম। কিছুকাল আগে আমার এই ভাই মারা গিয়েছেন। ঢাকাতেও আমার বড় ভাইসহ অন্যরা তত দিনে জেনে গেছেন, আমার স্বামীসহ আরও কিছু লোক রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আমি হুদার গ্রেপ্তারের ঘটনা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। ঢাকায় এসে সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকলাম। মা-বাবা ঢাকায় থাকলে হয়তো মনে বল পেতাম, কিন্তু তাঁরা কেউ এখানে থাকেন না। অন্যদিকে হুদাদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে কি না, সে খবরও পাচ্ছিলাম না। আমার খুব ভয় লাগছিল।

ঢাকায় আসার পর আবার একটা ঘটনা ঘটল। বিয়ের পর আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন আমাদের বাসায় মুখলেস নামের এক আরদালি ছিল। আমি ঢাকায় আসার দিন কয়েক পর সে একদিন আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মুখলেস জানত না যে আমি ঢাকায় এসেছি। মুরাদ ভাইয়ের বাসায় মুখলেস আমাকে দেখে চমকে উঠল। বলল, 'আপনি ঢাকায়! স্যারও তো ঢাকায়।'

আমি ওকে বললাম, না, উনি তো পাকিস্তানে, ইসলামাবাদে।

মুখলেস বলল, 'না, স্যারকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনীর ঢাকার সদর দপ্তরে রাখা হয়েছে।'

আমি বললাম, তুমি কীভাবে এ খবর জানো?

সে বলল, 'এক শ ভাগ জানি। কারণ, স্যারের সেনা-পোশাকে ধোপার যে চিহ্ন থাকত, সেই চিহ্ন দেখে জেনেছি যে তিনি এখন ঢাকায়।' তত দিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঢাকার সব বাঙালি সেপাই, সেনা কর্মকর্তাসহ সবার মধ্যেই প্রচার হয়ে গেছে যে, কিছু বাঙালি সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমানের বাবা আর আমার নানা ছিলেন সমসাময়িক। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে মন্ত্রী হন। তিনি সেই সময় ঢাকায় ছিলেন। আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহ সম্ভবত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারপর মোস্তাফিজুর রহমান একদিন মুরাদ ভাইয়ের বাড়িতে হঠাৎ বেড়াতে আসেন। এসে আমাকে জানালেন, হুদারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকার সেনা সদরে আছেন। তিনি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। সাদেকুর রহমান চৌধুরী নামের আরেক বাঙালি সেনা কর্মকর্তাও গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হন। মোস্তাফিজুর রহমান আমাকে আরও বললেন, 'তুমি লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবে না। সাবধানে কথা বলবে।' আমার ভাইকেও বলে গেলেন, আমি যেন সাবধানে থাকি এবং কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সিভিল সার্ভিসের বাঙালি কর্মকর্তাদের কথিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর থেকে বেশির ভাগ বাঙালি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। যদিও তারা মনে করত, এটা পাকিস্তানিদের একধরনের চক্রান্ত। তার পরও তারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল না। কারণ গ্রেপ্তারকৃতদের পরিবারের সদস্যদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং নতুন করে আরও বাঙালিদের গ্রেপ্তারের আশঙ্কা আটককৃতদের আত্মীয়স্বজনকে তো বটেই, বেশির ভাগ মানুষকে কিছুটা ভীতসন্ত্রস্তও করে তোলে। কারও সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা, যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে হুদারা কোথায়, কী অবস্থায় আছেন, কোনো খবরই পাচ্ছিলাম না। চারদিকে শুধু গুজব। শুনতে পেলাম, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পশ্চিম

পাকিস্তানেও তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শারীরিক নির্যাতনও করা হচ্ছে। এসব শুনে আমি বেশ ভয় পেলাম।

এর মধ্যে আবার একদিন আমি হুদার চিরকুট পেলাম। সে চিরকুট ছিল সাংকেতিক ভাষায় লেখা; এক পাঠান সেপাই নিয়ে এসেছে। আমি এতেই বুঝে গেলাম, হুদারা ঢাকার সেনা সদরে আছেন; মুখলেস ঠিকই বলেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঠান ও বালুচ কর্মকর্তা-সেপাইরা কিছুটা ভালো ছিল। পাঞ্জাবিরা মোটেই ভালো ছিল না। এরপর থেকে মাঝেমধ্যেই পাঠান-বালুচদের মাধ্যমে আমি হুদার গোপনে পাঠানো সাংকেতিক চিরকুট পেতে থাকলাম। হুদার চিঠি নিয়ে তারা হয়তো নিজেদের কোনো কাজের অজুহাতে মোটরসাইকেলে করে প্রথমে নিউমার্কেটে গিয়েছে। সেখান থেকে রিকশায় চেপে ইস্পাহানি কলোনিতে এসে আমার কাছে চিরকুট দিয়ে যেত।

প্রথমে আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারতাম না। হুদা লিখে দিলেন, 'তুমি এদের বিশ্বাস করতে পারো।' প্রথমে আমি উত্তর দিতাম না। পরে আবার হুদা যখন একই কথা অর্থাৎ 'তুমি এদের বিশ্বাস করতে পারো' লিখে পাঠালেন, তখন ওদের মাধ্যমে হুদাকে আমিও সাংকেতিক ভাষায় লিখতে শুরু করলাম। আমার চিঠিও তারা তাঁর কাছে নিয়ে যেত। হুদা সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো দিকে চিঠি লিখত। সব সময় কলম পেত না। মাথার ওপর রাত-দিন ৫০০ না কত পাওয়ারের যেন বাতি জ্বালানো থাকত! ক্যাপ্টেন খুরশিদ, এম শওকত আলী (পরে কর্নেল), মেজর শামসুল আলমরাও ছিলেন ওখানে। কর্নেল শওকত আলী বর্তমানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার। কোয়েটায় স্টাফ কলেজে কোর্স করছিলেন ক্যাপ্টেন এম নুরুজ্জামান। কোয়েটা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা সেনানিবাসে হুদাদের আটক করে রাখা হয় তৎকালীন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসে (এর কিছু অংশ এখন বঙ্গবন্ধু জাদুঘর)। এটা তখন আমি জানতাম না, পরে শুনেছি। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবসহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমদ ফজলুর রহমান, রুহুল কদ্দুস, শামসুর রহমান, খুরশিদ উদ্দীন আহমদ, মতিউর রহমান, এম শওকত আলী, খন্দকার নাজমুল হুদা, এম নূরুজ্জামান, আবদুর রউফসহ মোট ১৩ জনকে বিভিন্ন কক্ষে রাখা হয়। অন্য ২২ জনকে আটক রাখা হয় তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ইউনিট লাইনসে।

কয়েক দিন পর থেকে আটক সেনা কর্মকর্তারা ইংরেজিতে চিঠি লেখার অনুমতি পেলেন। তারপর থেকে হুদার নিয়মিত চিঠি আসতে লাগল। এসব

চিঠি পড়ে বোঝা যেত না, তাঁরা কী অবস্থায় আছেন। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। একটা চিঠিতে তিনি আমাকে লিখলেন, গত বছর আমরা যেখানে বিবাহবার্ষিকী পালন করেছিলাম, তার কথা। যেখানে বসে আমরা আনন্দ করেছিলাম, খাওয়াদাওয়া করেছিলাম, তার কথা। সেখানে বসে গত রাতের চিন্তা করার কথা ইত্যাদি। চিঠি লেখার অনুমতি পাওয়ার পরে প্রথম চিঠি পেলাম ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখের দিকে। সেই চিঠি উনি লিখেছিলেন ৫ ফেব্রুয়ারিতে। চিঠিটার বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম।

৫ ফেব্রুয়ারি '৬৮
সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট
ক্যাপ্টেন কে এন হুদা
প্রযত্নে : হেডকোয়ার্টার্স, ১৪ ডিভিশন
ঢাকা সেনানিবাস

প্রিয়তমা নীলু,

অনেক দিন আমার কাছ থেকে কোনো চিঠি না পেয়ে তুমি কেমন উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত আছ, তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। এত দিন এটা সম্ভব ছিল না। সামনের দিনগুলোতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি পাবে। আমার ধারণা, একাধিক চিঠি আসার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে আমি শুধু একটা চিঠি তোমাকে লিখতে পারব। তোমার কাজ হবে তা সবাইকে জানানো। কয়েক দিন আগে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, তুমি এখন এখানে। এটা আমার জন্য একটা বড় স্বস্তি এবং একধরনের মানসিক প্রশান্তি যে তুমি আমার কাছেই। কিন্তু আমার অবস্থাটা কী নিষ্ঠুর, কাছে থেকেও আবার খুব দূরে। আমি এই যে এখন তোমাকে লিখছি, আমার বর্তমান অনুভূতি অচিন্তনীয়; তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় হৃদয় মর্মভেদী, অনুতাপ এবং মনের যন্ত্রণা এমন যে নিজেকে খুব দ্বিধান্বিত, নিঃসহায়, হতভাগ্য ও অসুখী মনে হচ্ছে। এত কিছু পাওয়ার পর, বিশেষ করে, তোমার সঙ্গে জীবনটাকে ভাগ করে নেওয়ার আনন্দের পর এমন বিচ্ছেদ সহ্য করার জন্য পৃথিবীতে আমি না থাকলেই ভালো হতো। প্রতিমুহূর্তে আমি তোমাকে নিয়ে ভাবি। কারণ, তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা, সবচেয়ে বড় আনন্দ। এই ভয়াবহ একাকিত্বে আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে তুমি আমার কাছে কী ছিলে এবং তোমাকে ছাড়া আমার জীবন কী রকম বৃথা ও শূন্য। আমাদের সুখী জীবনটাকে এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলার জন্য আমি প্রতিনিয়ত বিবেকের দংশনে ও অনুশোচনায় কষ্ট পাচ্ছি। এই

অপরাধের অনুভূতি থেকে যে কষ্টটা আমি তোমার জীবনে এনেছি, তা আমাকে মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিচ্ছে না। এই অপরাধের জন্য আমি কি কখনো তোমার ক্ষমা পাব? এটা জিজ্ঞেস করতেও আমি লজ্জা বোধ করি। তুমি কি কখনো আমাকে ক্ষমা করবে, প্রিয়তমা?

আবু[১] ও তোমার দুটো চিঠি আমাকে এতটাই আনন্দিত করেছে যে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী, আমি নিঃসন্দেহে ওই তিনটে চিঠি এবং আমাদের প্রিয়তম ছেলের তিন কপি ছবির কথা বলব। আমি এখন সত্যিই এগুলো নিয়ে থাকি এবং এগুলো দেখা ও পড়ার জন্য সব সময় আমার হাতের কাছেই থাকে। 'দরুদ শরিফ' পাঠানোর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা আমি সব সময় তেলাওয়াত করি, বিশেষ করে, নামাজের পর। আমার মুক্তি ও আমাদের তাড়াতাড়ি মিলনের জন্য সব সময় আল্লাহ ও গাউসপাকের কাছে প্রার্থনা করি। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আমাদের আবার সুখী ও ভাবনাহীন জীবনে ফিরিয়ে নেবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার মহৎ ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রার্থনা শুনবেন। সুতরাং, তুমি এখন যা করতে পারো, তা হচ্ছে আমার দ্রুত মুক্তি ও তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। আমি খুব খুশি হয়েছি এটা জেনে যে হুজুরপাক আমার জন্য দোয়া করেছেন। দয়া করে তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ো এবং আমাকে জানাবে তিনি কী বলেছেন। তাঁকে বোলো, আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। তুমিও নূর আহমেদ[২] ভাইকে নিচের ঠিকানায় একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ো, আমি কিছু সমস্যায় আছি এবং সে যাতে বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার শরিফে যায় এবং আমার জন্য দোয়া করে। তাঁর ঠিকানা : নূর আহমেদ, কেয়ার অব ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সমবায় সমিতি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। দাদাকেও বোলো, সিলেটে হজরত শাহজালালের মাজারে আমার জন্য একই দোয়া করতে।

আমি প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। তা আমার নিজের জন্য নয়, বরং তোমার ও এহতেশামের জন্য, যাতে তিনি আমাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে আনেন। মা কি তাঁর ছেলের সত্যিকার অবস্থাটা জানেন? যতটুকু সম্ভব তাঁর কাছে আমার বিষয় গোপন রেখো এবং আমার জন্য দোয়া করতে বলো। তুমি জেনে খুশি হবে, আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি এবং ইনশা আল্লাহ যত দিন বেঁচে থাকব, এটা

১. খন্দকার কামরুল হুদা।
২. নূর আহমদ একসময় হুদার বাবার আরদালি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হুদার যোগাযোগ ছিল।

চালিয়ে যাব। যা হোক, প্রিয়তমা, এখন তোমার কথা জানতে চাই। তুমি কবে এখানে এসেছ? আবু কবে পৌঁছাচ্ছে? এহতেশাম কেমন আছে? বিনা নোটিশে তোমার এখানে আসা নিয়ে লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী? তুমি কীভাবে সময় কাটাও? ছোট্ট সোনামণি কেমন আছে? সে কী কী করে? হতভাগ্য ও যন্ত্রণাকাতর বাবার পক্ষ থেকে তাকে চুমু দিয়ো।

পপির সাথে বিরোধ মিটিয়ে তাঁর সাথে বন্ধুত্বপরায়ণ হয়েছ জেনে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি, এটা শেষ পর্যন্ত থাকবে। আবু আমাকে লিখেছিল, তুমি ঢাকায় আসার পর এক সপ্তাহের জন্য বরিশালে যাবে। তুমি কি গিয়েছিলে? তুমি এখন কোথায় থাকবে? আবুকে বোলো, আমি তাকে লিখতে পারছি না। করাচি তোমার কেমন লেগেছিল এবং কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? আবু তাঁর চিঠিতে প্রস্তাব দিয়েছে, আমার অবর্তমানে তুমি তাদের সাথে যেন থাকো। এ ব্যাপারে তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও। কী সিদ্ধান্ত নিলে তা আমাকে বিস্তারিত জানিয়ো। শিয়ালকোটে কাজী[১] তোমার খোঁজখবর ও দেখাশোনা করেছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। তাঁকে চিঠি লিখলে তাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো।

তোমার খরচের জন্য ৩০০ রুপির একটি চেক পাঠাচ্ছি। মনির ব্যাংক থেকে চেকটি ক্যাশে রূপান্তর করতে পারো। চিঠির অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা জিনিসগুলো মমতাজ[২] বা অন্য কারও মাধ্যমে ডিএএজি অথবা হেডকোয়ার্টার্সের ১৪ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন সাত্তারের[৩] ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো। আমার এগুলোর খুব প্রয়োজন। আমাদের শিয়ালকোটের আসবাবগুলো দোকানে পৌঁছে দিতে লেফটেন্যান্ট মুঘল[৪] বা মেজর রশিদকে[৫] একটি চিঠি লিখো। সে অবশ্যই তোমাকে বিল পাঠাবে। এসবের খরচ বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমাদের অন্য জিনিসপত্রের কী অবস্থা? তুমি কি তাদের সেসব দেখে রাখতে বলেছিলে? আমার গান লাইসেন্সটি নবায়ন করার জন্যও তাঁকে বোলো। এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। শুনলাম, আবু আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যৌথ নামে খুলেছে। যখন তোমার টাকার দরকার, তখন তুমি এখান থেকে টাকা তুলতে

১. লেফটেন্যান্ট কাজী।
২. হুদার কোর্সমেট। বাঙালি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লায়।
৩. পাকিস্তানি।
৪. পাকিস্তানি।
৫. পাকিস্তানি।

পারো। এ জন্য দ্বিধা বোধ কোরো না। তুমি কি চেক বই এনেছ? প্রতি মাসের ১ তারিখে আমার মাসিক ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামের ৪৯ রুপি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ কোরো। চেকটা পাঠাতে হবে প্রুডেনশিয়াল ইনস্যুরেন্স কোং লি., অলটার সিং বিল্ডিং, মল, লাহোর—এই ঠিকানায়। আমার পলিসি নম্বর ৬৫৫৭৬৫৭। আমার ধারণা, তুমি তোমার অলংকার ফেরত নিয়ে এসেছ, রেডিওগ্রামটি চালু কোরো এবং গগু[১] ভাইকে এটা ব্যবহার করতে বোলো, নতুবা অনেক দিন ব্যবহার না করার ফলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জেঙ্গি[২]-রুনির[৩] সম্পর্ক কেমন চলছে। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা। তুমি যদি বরিশালে যাও, ক্যাপ্টেন মনোয়ারকে[৪] ফোন করে কনসেশন ভাউচারটি সংগ্রহ করো। এখন হয়তো তার ফোন নম্বর বদল হয়ে গেছে।

আবু সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানাও। আব্বা-আম্মা ও আপাকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো এবং তাঁদের দোয়া করতে বোলো। গগু ভাই, ভাবি ও জেঙ্গি কেমন আছে। তাদের এবং শাদান[৫], ভোম্বলকে[৬] আমার ভালোবাসা। তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব, নিয়মিত লিখো। তোমাকে ও বাবুকে অনেক ভালোবাসা।

তোমারই
গুডু

পুনশ্চ

আমি সব সময় মনে করি, অবসর সময়ে তোমার কিছু আঁকাআঁকি করা উচিত। এটা তোমাকে নিমগ্ন রাখবে। অনেকে বলে, একজন শিল্পীর সেরাটা প্রতিফলিত হয় তাঁর ক্যানভাসে যখন তাঁর মন যন্ত্রণা ও বেদনায় পূর্ণ থাকে। সুতরাং, ভালো কিছু করার জন্য সুযোগটা লুফে নাও। এতে হয়তো তোমার আগের আঁকা ছবিগুলোর থেকেও তা ভালো হবে। যখন আমি মুক্ত হব, তুমি একক প্রদর্শনী করতে পারবে, যেটা তুমি এবং

১. আমার ভাই মুরাদ আবদুল্লাহ।
২. আমার ছোট ভাই এম এ এ জাকারিয়া।
৩. এম এ এ জাকারিয়ার স্ত্রী।
৪. হুদা যখন পাকিস্তানের উগোকিতে ছিলেন তখন তিনি সেখানে ছিলেন।
৫. আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহর মেয়ে।
৬. মুরাদ আবদুল্লাহর ছেলে। প্রকৃত নাম ফুয়াদ। তাঁকে আদর করে অনেকে ভোম্বল ডাকত।

জয়নুল আবেদিন[৭] চাইতে। শান্ত কেমন আছে? আমাকে শিগগিরই বিস্তারিত লিখো। পরবর্তী চিঠিতে তোমার একটি ছবি পাঠিয়ো।

তোমারই গুডু

১০-১১ দিন পর আমি একসঙ্গে আরও দুটি চিঠি পেলাম। একটি চিঠিতে কোনো তারিখ ছিল না। এই চিঠি দুটিও ইংরেজিতে লেখা। চিঠি দুটির বাংলা অনুবাদ :

ফেব্রুয়ারি ৬৮
সকাল ৯টা

প্রিয় নীলু,

অনেক দিন আমার কোনো চিঠি না পেয়ে তুমি কেমন উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত আছো, তা খুব ভালোভাবেই অনুমান করতে পারছি। এখন থেকে আমি শুধু তোমার সাথেই যোগাযোগ করব। তুমি সবাইকে জানাবে। শুনলাম, তুমি ঢাকায় এসেছ। এটা আমাকে আশ্বস্ত করেছে। আমি তোমার ও আবুর চিঠি পেয়েছি, সাথে আমাদের প্রিয়তম ছেলের তিন কপি ছবি। এটা আমাকে যে কী আনন্দ ও সান্ত্বনা দিয়েছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। এগুলো আমার জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। এই চিঠি লেখার সময় আমার অনুভূতি ও আবেগ বলে বোঝানো যাবে না।

আবু তাঁর চিঠিতে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমার অবর্তমানে তুমি তাঁদের সাথে থাকো। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা তোমার হাতে। তোমরা সবাই একসঙ্গে বসো এবং যা ভালো তা-ই করো। আবু এর মধ্যে ফিরে এসেছে কি না, আমি জানি না। তাঁদের আমার ভালোবাসা দিয়ো। পপি ভাবির সাথে তোমার মিল এবং পুনরায় তোমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। এটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে। আবু আমাকে আরও লিখেছিল, তোমাকে এক সপ্তাহের জন্য বরিশালে যেতে হবে। তুমি কি যাচ্ছ? যদি যাও, তাহলে ক্যাপ্টেন মনোয়ারকে ফোন করে কনসেশন ভাউচারটি সংগ্রহ করো।

তোমার খরচের জন্য ৩০০ রুপির চেক পাঠাচ্ছি। যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। সুতরাং, যখন তোমার দরকার হবে, ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার স্বাধীনতা তোমার থাকল। আমার চেকটি মনির ব্যাংকে দিয়ে ক্যাশে পরিণত করতে পারো। প্রতি মাসের

৭. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

১ তারিখে আমার ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম ৪৯ রুপি ক্রস চেকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়ো, মেসার্স প্রুডেনশিয়াল কো., মল, লাহোর—এই ঠিকানায়। পলিসি নম্বর ৬৫৫৭৬৫৭। মুঘলকে[১] একটি চিঠি লিখো সব আসবাব দোকানে পৌঁছে দিতে এবং তোমাকে বিল দিয়ে যেতে। রেডিওগ্রামটি চালু করো এবং গগু ভাইকে ব্যবহার করতে বলো। অনেক দিন ব্যবহার না করলে এটার ক্ষতি হতে পারে। মুঘলকে অন্য জিনিসপত্র দেখে রাখতে বোলো।

সব সময় আমার জন্য চিন্তা কোরো না, কিন্তু প্রার্থনা করো। হুজুরপাকের কথা মনে রেখো। আব্বা-আম্মা, আপাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো এবং তাঁদের দোয়া করতে বোলো। ছোট্ট সোনামণি কী করে? তাকে যদি কোলে নিয়ে আদর করতে পারতাম! তাকে আমার সমস্ত ভালোবাসা ও চুমু দিয়ো। আমি সব সময় প্রার্থনা করি, আল্লাহ যাতে তোমাকে ও মাকে ভালো রাখেন। আমাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী নিকটেই। আমার একমাত্র প্রার্থনা, তার আগেই যাতে আমি মুক্ত হই। প্রথম বিবাহবার্ষিকীটা কী মজা করে আমরা উদ্‌যাপন করেছিলাম! তোমার মনে আছে? ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

গগু ভাই, ভাবি, জেঙ্গি ও ভোম্বল-শাদানকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। আবুর ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত। তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখো।

আশা করি, এটা তোমাকে ও বাবুকে সুস্থ-সবল রাখবে। অনেক ভালোবাসা রইল। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব এবং তোমার সাথে দেখা হবে।

তোমারই
গুডু

অপর চিঠিতে তারিখ ছিল। সেটা ১৩ ফেব্রুয়ারিতে লেখা।

১৩ ফেব্রুয়ারি '৬৮
ঢাকা সেনানিবাস

প্রিয় নীলু,

গত সপ্তাহে গগু ভাইয়ের ঠিকানায় তোমাকে চিঠি ও ৩০০ রুপির একটি চেক পাঠিয়েছিলাম, তা পাওনি জেনে দুঃখ পেয়েছি। তবে আমি

১. লেফটেন্যান্ট মুঘল।

খুশি এবং স্বস্তিতে আছি এটা জেনে যে তুমি ঢাকায় ভালোভাবেই আছো। আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছ। আল্লাহর কৃপায় আমি ভালো এবং আরামেই আছি। তার পরও তুমি ভালোভাবেই অনুমান করতে পারো, আমি কী যন্ত্রণা ও কষ্টে আছি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাগ্যের ফেরে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা আমার মনকে প্রতিনিয়ত দংশন করছে। আমি সম্ভবত খোদার দুনিয়ার সবচেয়ে অসুখী মানুষ।

মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে ও বাবুকে ভুলতে পারি না এবং আমাদের এত দিনকার সুখী, প্রেমময় ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনের স্মৃতি যখন আমার মনের মুকুরে ঝাপটা দেয়; তখন আমি ভীষণ অনুতপ্ত হই আমার কৃতকর্মের জন্য।

দরুদ শরিফ পাঠানোর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, যা আমি সব সময় তেলাওয়াত করি। এটা আমাকে শান্তি ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস জোগায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দয়ার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে এবং তোমার কাছে শিগগির আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। গাউসপাকের দোয়ায়, তিনি অবশ্যই আমার প্রার্থনা কবুল করবেন। হুজুরপাক আমার জন্য দোয়া করেছেন জেনে খুশি হয়েছি। এ জন্য তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ো।

চট্টগ্রামে ফোন করে নূর আহমেদ ভাইকে বোলো, হজরত বায়েজিদ বোস্তামির মাজারে যেতে এবং আমার জন্য দোয়া করতে। তার ফোন নম্বর ৬৫১৭ বা ৬৫১৯। ঠিকানা : রেজিস্ট্রার, সমবায় সমিতি অফিস, আন্দরকিল্লা। দাদাকেও হজরত শাহজালালের মাজারে গিয়ে একই দোয়া করতে বোলো।

প্রিয়তমা আমার, তুমি শুধু আমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। তুমি জেনে খুশি হবে যে আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি। আমি খুব ভালোভাবেই অনুমান করতে পারি, আমার হতভাগা প্রেমিকা কী রকম মানসিক দুঃখ-বেদনায় আছে এবং যার জন্য আমিই দায়ী। যদি পারো আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।

পিন্ডির ঠিকানায় লেখা তোমার ও আবুর চিঠি পেয়েছিলাম। তুমি ও পপি ভাবি বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছ এবং তোমরা পুনরায় বন্ধু হয়েছ জেনে খুশি হয়েছি। তোমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক।

আবু প্রস্তাব করেছিল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাদের সঙ্গে থাকো। যে বাসা তোমার নিজের বাসার মতো মনে হবে, সেখানেই সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো। আবু আমাকে আরও লিখেছিল যে, সে আমাদের নামে যৌথ হিসাব খুলেছে। যখনই তোমার টাকার প্রয়োজন

হবে, তখন এখান থেকে টাকা তুলতে পারো। এখন তোমাকে আরেকটি ৪০০ রুপির চেক পাঠাচ্ছি। মুঘল ভাইকে বোলো আমাদের আসবাব ফেরত দিতে এবং বিল পাঠাতে।

...আমি এখন যে চেক পাঠাচ্ছি, তা মনির ব্যাংকে বিক্রি করতে পারো।

মনে হয়, আবু এর মধ্যে ফিরে এসেছে। তাকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। জমি কেনার টাকার জন্য ঋণের ব্যাপারে সে কি দীপু ও আকবর[১] মামার সঙ্গে দেখা করেছিল? তাকে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে বলো। এটা ভালো হতে পারে। যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয়, তবে মমতাজ ভাইয়ের শ্যালকের দ্বারস্থ হতে পারো।

তাহেরা[২] মামি কেমন আছেন? ছোট্ট সোনামণি কী করে? আমি সব সময় ওর ছবি আমার বিছানায় রাখি এবং ছবিকেই সব সময় আদর করি। আমার সমস্ত ভালোবাসা ও চুমু তাকে দিয়ো। সম্ভবত সে এখন বসতে পারে। পাঁচ দিন পর তো ওর বয়স ছয় মাস হবে!

আশা করি, তুমি তোমার নিজের যত্ন নিচ্ছ। আমার জন্য দুশ্চিন্তা করে তোমার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা কোরো না বরং তোমার নিজের যত্ন নিয়ো। আমাদের মামলা কখন শুরু হবে, এটা এখনো অনিশ্চিত।

আব্বা, আম্মা ও আপাকে আমার সালাম দিয়ো। গুগু ভাই কেমন আছেন? তাঁদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা। জেঙ্গি, শাদান ও ভোম্বলকে ভালোবাসা। আশা করি, শান্ত ঠিক আছে। তুমি কি তাকে দেখেছিলে? আম্মার ব্যাপারে আমি কিছুটা চিন্তিত। আজ তাকে একটি ছোট চিরকুট পাঠিয়েছি।

আমি সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে তিনি তোমাদের সবাইকে ভালো রাখে এবং আমার স্বাধীনতা আমাকে ফিরিয়ে দেয়। আমিন! আমার সব ভালোবাসা।

তোমারই
গুডু

৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকে হুদার চিঠি আসতে লাগল নিয়মিত। সে লেখে আর আমি উত্তর দিই। এই করতে করতে পার হয়ে গেল মে মাস। এর মধ্যে অনেকগুলো চিঠি পেলাম। আমিও হুদাকে অনেক চিঠি লিখলাম।

১. আকবর কবীর। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনীতিক ও লেখক হুমায়ুন কবীর তাঁর ভাই।
২. আলমগীর কবীরের স্ত্রী।

আগরতলা মামলা শুরু হলো

এর মধ্যে শুনলাম, শেখ মুজিবসহ বাঙালি কিছু সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বেসামরিক কর্মকর্তাকে ধরে একটা মামলা দাঁড় করা হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা নাকি দেশকে বিভক্ত অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এবং আগরতলায় গিয়ে বৈঠক করেছেন। তারপর ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন সেই কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় উঠল।

কথিত সেই আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে অনেককেই আটক করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে মোট ৩৫ জনকে এই মামলায় আসামি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১ নম্বর আসামি। অন্যরা হলেন : ২. নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত), ৩. নৌবাহিনীর স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান (দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই খুলনা থেকে নিখোঁজ। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি), ৪. প্রাক্তন লিডিং সি-ম্যান (নৌবাহিনী) সুলতানউদ্দীন আহমদ (১৯৯৩ সালে মারা গেছেন), ৫. লিডিং সি-ম্যান সিআইডি (নৌবাহিনী) নূর মোহাম্মদ, ৬. সিএসপি আহমদ ফজলুর রহমান (১৯৯১ সালে মারা গেছেন), ৭. ফ্লাইট সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী) মফিজউল্লাহ, ৮. প্রাক্তন করপোরাল (বিমানবাহিনী) এ বি এম আবদুস সামাদ, ৯. প্রাক্তন হাবিলদার (সেনাবাহিনী) দলিল উদ্দীন (২০০৬ সালে মারা গেছেন), ১০. সিএসপি রুহুল কুদ্দুস (স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ১৯৯১ সালে মারা গেছেন), ১১. ফ্লাইট সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী)

মো. ফজলুল হক (পরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য (১৯৭৩), ১৯৯৪ সালে মারা গেছেন), ১২. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা, ১৯৮০ সালে মারা গেছেন), ১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন (রাজনৈতিক নেতা, ২০০৮ সালে মারা গেছেন), ১৪. সুবেদার (সেনাবাহিনী) আবদুর রাজ্জাক (২০০৪ সালে মারা গেছেন), ১৫. প্রাক্তন হাবিলদার ক্লার্ক (সেনাবাহিনী) মুজিবুর রহমান (১৯৭২ সালে মারা গেছেন), ১৬. প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী) মো. আবদুর রাজ্জাক (১৯৯১ সালে মারা গেছেন), ১৭. সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী) জহরুল হক (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলাবস্থায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে নিহত), ১৮. প্রাক্তন এবি নৌবাহিনী মোহাম্মদ খুরশিদ, ১৯. সিএসপি শামসুর রহমান খান (স্বাধীনতার পর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, ২০১০ সালে মারা গেছেন), ২০. রিসালদার (সেনাবাহিনী) এ কে এম শামসুল হক (১৯৯৮ সালে মারা গেছেন), ২১. হাবিলদার (সেনাবাহিনী) আজিজুল হক (২০০৭ সালে মারা গেছেন), ২২. মাহফুজুল বারী (এসএসসি, বিমানবাহিনী), ২৩. সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী) শামসুল হক (১৯৯৫ সালে মারা গেছেন), ২৪. মেজর (সেনাবাহিনী) ডা. শামসুল আলম, ২৫. ক্যাপ্টেন (সেনাবাহিনী) মো. আবদুল মুত্তালিব (পরে মেজর, ১৯৯১ সালে মারা গেছেন), ২৬. ক্যাপ্টেন (সেনাবাহিনী) এম শওকত আলী মিঞা (পরে কর্নেল, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার), ২৭. ক্যাপ্টেন (সেনাবাহিনী) খন্দকার নাজমুল হুদা (পরে কর্নেল, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত), ২৮. ক্যাপ্টেন (সেনাবাহিনী) এ এন এস নূরুজ্জামান (পরে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত। ১৯৯৩ সালে মারা গেছেন), ২৯. সার্জেন্ট (বিমানবাহিনী) আবদুল জসিম (স্বাধীনতার পরে তিনি কিছুদিন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন), ৩০. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, ৩১. লে. (নৌবাহিনী) এস এম এস রহমান (১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের এমপি, পরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, ১৯৮০ সালে মারা গেছেন), ৩২. প্রাক্তন সুবেদার (সেনাবাহিনী) এ কে এম তাজুল ইসলাম (১৯৭৬ সালে মারা গেছেন), ৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা (পরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইনস্ট্রাকটর, ১৯৮৮ সালে মারা গেছেন), ৩৪. ক্যাপ্টেন

(সেনাবাহিনী) ডা. খুরশিদ উদ্দীন আহমদ (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার জেনারেল), ৩৫. লে. (নৌবাহিনী) আবদুর রউফ (পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ডার ও গণফোরাম নেতা)।

আটক ১১ জন ক্ষমা চাওয়ায় তাঁদের রাজসাক্ষী করা হয়। তাঁরা হলেন : ১. লে. মোজাম্মেল হোসেন, ২. প্রাক্তন করপোরাল মো. আমির হোসেন মিয়া, ৩. সার্জেন্ট শামসুদ্দীন মিয়া, ৪. ডা. সাইদুর রহমান, ৫. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা এম রমিজ, ৬. ক্যাপ্টেন আবদুল আলিম ভূঁইয়া, ৭. করপোরাল জামালউদ্দীন আহমদ, ৮. করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, ৯. মো. গোলাম আহমদ, ১০. এ বি এম ইউসুফ, ১১. সার্জেন্ট আবদুল হালিম। এদের মধ্যে এ বি এম (আবুল বাশার মোহাম্মদ) ইউসুফকে পরে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করা হয়।

এ ছাড়া সরকারপক্ষে আরও সাক্ষী ছিলেন ২৪০ জন। এদের মধ্যে কয়েকজনকে পরে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন কামালউদ্দীন আহমদ, আবুল হোসেন, বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারক ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান (শেখ আবদুর রহমান) সাহেব। এ ছাড়া বাঙালি মাকসুমুল হাকিম এবং আরও একজন বিচারক ছিলেন। তাঁর নাম বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান। মোট তিনজন বিচারক ছিলেন। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আবদুস সালাম খান, জুলমত আলী খান, আতাউর রহমান খান, মির্জা গোলাম হাফিজ, ড. কামাল হোসেন, আমীর-উল ইসলাম, মওদুদ আহমদসহ আরও অনেক বড় বড় আইনজীবী, সবার নাম এখন আর আমার মনে পড়ছে না। তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন কথিত ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের পক্ষে লড়ার জন্য।

ঢাকা সেনানিবাসের তখনকার সিগন্যালস অফিসার্স মেসে (এখন তা বিজয়কেতনের অংশ) আদালত স্থাপন করা হয়। সেটা ছিল মেসটির ডাইনিং হল। তার উত্তর দিকে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে বিচারকেরা বসতেন। পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে অভিযুক্তদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক সারিতে তিনজন করে। লম্বালম্বি ১২টি সারি। সেখানে ৩৫ জন অভিযুক্ত চেয়ারে গাদাগাদি করে বসতেন। সরকারপক্ষের আইনজীবীরা বসতেন হলের পূর্ব দিকে। অভিযুক্তদের আইনজীবীরা বসতেন মাঝখানে। তাঁদের পেছনে দক্ষিণ দিকে দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেখানেই বসতাম গাদাগাদি করে। বিচারকদের ডান দিকে বসতেন সাংবাদিকেরা।

শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আমি এই মামলার সময়ই প্রথম দেখলাম। যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনই তাঁকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেই সময়কার ভারতের রাজনীতিকদের অনেকের নাম আমি জানতাম। কিন্তু পাকিস্তানের কারোরই নাম আমি তেমন জানতাম না। পাকিস্তানের বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনীতিকদের ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহও ছিল না। যেদিন আদালতে মামলা প্রথম উঠল, আমার বাচ্চার বয়স তখন এক বছরও হয়নি, ওকে বাসায় রেখে আমি আদালতে গিয়েছি। ওখানে গিয়ে দেখি অনেকে এসেছেন। তাঁরা বেশির ভাগ অভিযুক্তদের আত্মীয়স্বজন। প্রথম দিন্ আমার যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অভিযুক্তরা তখন কাঠগড়ায়। সেদিন আমার বড় ভাশুর আর শাশুড়ি আমার আগেই সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন হুদার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। হুদাকে আটক করার পর সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। অনেক দিন পর তাঁকে দেখলাম। সে সময় আমি ভাবাবেগে কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমে অনেক কিছুই আমি খেয়াল করিনি। একটু পর দেখলাম, কাঠগড়ায় একদম সামনে দাঁড়ানো ৪৪-৪৫ বছর বয়সের একজন অসম্ভব সুদর্শন ব্যক্তি, এখন যেমন বারাক ওবামাকে দেখলে ব্যবহার করব 'অসম্ভব সুন্দর', 'স্মরণীয়'জাতীয় কিছু শব্দ, শেখ মুজিবকেও আমার তেমনটাই মনে হয়েছিল। তাঁকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো ভয় নাই, ডর নাই, নির্বিঘ্ন চিত্ত। তাঁর হাতে একটা পাইপ ধরা, যেন কিছুই হয়নি, এ রকমভাবে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ আমার শাশুড়ির দিকে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, 'আরে বুয়া, আপনি?'

হিন্দিতে 'বুয়া' মানে বোন। কিন্তু পূর্ব বাংলায় 'বুয়া' বোন অর্থে বলা হয় কি না, তা তো আর আমি বুঝিনি। তাঁকে আমার শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে দেখলাম। সালাম করেই বললেন, 'আপনি এখানে কেন?'

আমার শাশুড়ি বললেন, 'আমার ছোট ছেলেও তো...।' তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই শেখ মুজিব বললেন, 'আপনার ছোট ছেলে মানে? আমি তো আবু-নূরুকে চিনি। ছোট ছেলে কোনটা?'

এরপর যখন আমার শাশুড়ি হুদাকে শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'ওর বউ কোনটা?'

আমার শাশুড়ি আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই তো।' এরপর শেখ মুজিব আমাকে ডাকলেন। তখন আমি তাঁর সামনে গেলাম। যেতেই তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বউ, তোকে আমি বলি, তুই একটুও

ভয় পাবি না, আমাদের কিচ্ছু হবে না। আমরা সবাই নির্দোষ। দেখিস, আমরা সবাই সসম্মানে ছাড়া পাব। একটুও ভয় পাবি না।'

শেখ মুজিবুর রহমানকে তখন আমার একজন মহাশক্তিধর, একজন প্রবল পরাক্রান্ত মানুষ বলে মনে হলো। একটা মানুষের এত সাহস হতে পারে! আদালতের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা-সৈনিক। অন্যদিকে একটা প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশ। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না, সবাই ভয় পায়, আর তিনি কিনা সেই পরিবেশে আমাকে এত অভয় দিলেন, এত সান্ত্বনা দিলেন!

আর ওখানে হুদার সঙ্গে তো আমার ছয় মাস পর দেখা। এত লোকের মধ্যে তাঁকে আমি কী বলব? বলার তো সে রকম কিছুই ছিল না সেখানে। শুধু 'কেমন আছ', 'কোথায় আছ' ইত্যাদি। যা বলার আইনজীবীই বললেন।

প্রখ্যাত বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ ছিলেন আমার আত্মীয়। তিনি সম্পর্কে আমার দুলাভাই হতেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের সবাই মামলার ব্যাপারে অনেক উপদেশ নিলেন।

এ ছাড়া ইংল্যান্ডে বসবাসরত বাঙালিরা উদ্যোগ নিয়ে তখন সে দেশের একজন প্রখ্যাত আইনজীবীকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের পক্ষে আইনি লড়াই করার জন্য বাংলাদেশে পাঠান। তাঁর নাম স্যার থমাস উইলিয়ামস, বার-অ্যাট-ল, কিউসি। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির এমপি ছিলেন।

প্রথম দিন বিচারকেরা আদালতকক্ষে আসন গ্রহণ করার পর সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মনজুর কাদের বিচারকার্য সূচনা করেন। তিনি একসময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মনজুর কাদের ৪২ পৃষ্ঠার মোট ১০০ অনুচ্ছেদের একটি অভিযোগনামা পাঠ করেন। এরপর অভিযুক্তদের বক্তব্য প্রস্তুত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ২৯ জুলাই পর্যন্ত বিচারকার্য মুলতবি করা হয়।

২৯ জুলাই আবার মামলার শুনানি শুরু হলো। সেদিন শুরুতেই স্যার থমাস উইলিয়ামস মামলাটির শুনানির ক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে যুক্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু বিচারকেরা তাঁর এই দাবি অগ্রাহ্য করে বিচারিক কাজ শুরু করে দেন।

এদিন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক মাহমুদ আলী কাসুরী ও পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো (পরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী) অভিযুক্তদের পক্ষে প্রতীকী অংশগ্রহণ

করেন। তাঁরা কেন এই মামলায় অংশ নিলেন, আমি সেটা তখন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সরকারপক্ষ তাদের প্রথম সাক্ষী পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনকে উত্থাপন করে। তিনিও হুদাদের মতো একই কাজে জড়িত ছিলেন। মোজাম্মেল হোসেন ক্ষমা চাওয়ায় পাকিস্তান সরকার তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে রাজসাক্ষী করে। তিনি রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্যও দেন। দ্বিতীয় সাক্ষী ছিলেন কামালউদ্দীন আহমদ। তাঁকে নিরপেক্ষ সাক্ষী করা হয়। তাঁকে বলা হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমসহ অন্যদের শনাক্ত করতে। কিন্তু কামালউদ্দীন সাহেব নাটকীয়ভাবে সেদিন এমন ভাব করেন যে তিনি তাঁদের কাউকে চেনেন না। এরপর সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি তাঁকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করে জেরা করে। এই সময় কামালউদ্দীন আহমদ সব ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যে সেদিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরদিনের পত্রিকায় এই খবর বেশ গুরুত্বসহকারে ছাপা হলে এই মামলার খবর জানার জন্য তখন থেকে বাঙালিদের মনে বেশ উৎসুক সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের ভীতি এরপর থেকে আস্তে আস্তে কাটতে থাকে।

তারপর মামলা চলতে লাগল। শুনানির যেদিন তারিখ থাকে, সেদিন আমি বাচ্চাকে বাসায় কারও জিম্মায় রেখে সকাল সকাল সেনানিবাসের বিশেষ আদালতে গিয়ে হাজির হই। প্রথম দিকে আমি সেখানে যেতাম বেবিট্যাক্সিতে করে। বেবিট্যাক্সিকে কেউ কেউ স্কুটার বলত। ওটাতে তিন-চারবার যাওয়ার পর সবাই তাতে যেতে মানা করল। তারপর থেকে আমি যেতাম ব্যারিস্টার কে জেড আলমের সঙ্গে। অল্প কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। আর শামসুর রহমান খান, রাজনীতিক আতাউর রহমান খানের ভাই, তিনিও তখন আটক ছিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা তিনি। ইন্দোনেশিয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে দেশে তলব করে এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর স্ত্রী আফসারী খানমকে আমি 'আপা' বলে ডাকতাম। আমরা দুজন মিলে বেবিট্যাক্সিতে কে জেড আলমের বাসায় গিয়ে ওখান থেকে তাঁর গাড়িতে যেতাম। কিন্তু ফেরার সময় আমরা দুজন কখনো একসঙ্গে কখনো আলাদাভাবে বেবিট্যাক্সিতে আসতাম। এভাবে যাওয়া-আসা করছি, একদিন

আবদুস সালাম খান এবং অন্য জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা বললেন, 'একা যাবেন না মা, আপনাকে কামাল নামিয়ে দেবে।'

কামাল—মানে শেখ সাহেবের ছেলে শেখ কামাল। তারপর থেকে ও নিজে গাড়ি চালিয়ে মামলার শুনানির দিন আমাকে আর আফসারী আপাকে বাসায় নামিয়ে দিত। প্রথমে আফসারী আপাকে নামিয়ে পরে আমাকে নামাত ইস্পাহানি কলোনিতে। কামালের স্মৃতি আমি আমৃত্যু ভুলব না। তখন বোধ হয় সে কলেজে পড়ে। ওইটুকুন ছেলে রোজ আদালতে যেত, বসে থাকত। ঢাকা সেনানিবাসের ওই আদালতকক্ষেই শেখ কামালকেও আমি প্রথম দেখি। দেখি শেখ হাসিনাকেও। হাসিনার বিয়ের পর সে প্রথম যেদিন কোর্টে এসেছিল, বড্ড সুন্দর লেগেছিল তাকে দেখতে। পুরো বাঙালি ঘরের বউ। লম্বা চুল। পরনে একটা চাঁপা রঙের জরিপাড় শাড়ি। আরেকটা বড় টিফিন-ক্যারিয়ারে করে বেগম মুজিব নিয়ে এসেছিলেন রসগোল্লা। শেখ সাহেব নিজের হাতে সবাইকে সেই রসগোল্লা খাইয়েছিলেন। এই একটা স্মৃতি আমার এখনো বেশ মনে আছে।

শেখ সাহেব সম্পর্কে এখানে আর একটি কথা না বললেই নয়। আদালতে সকল অভিযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিবৃতি দিয়েছিলেন। যে দিন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান তাঁর বিবৃতি দিচ্ছিলেন তখন এই ঘটনাটা ঘটে। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান বিবৃতি প্রদানের একপর্যায়ে বলেন, আটকের পর তাঁকে কীভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের সেই বর্ণনা শুনে অভিযুক্ত পক্ষের সবাই অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। এই সময় হঠাৎ শেখ সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মনজুর কাদেরের দিকে আঙুল তুলে উচ্চ স্বরে বলেন, মি. মনজুর কাদের, আপনি কী শুনতে পাচ্ছেন? এরপর রাগান্বিতভাবে তিনি আরও কী যেন বলেছিলেন। সেটা আমি আর শুনতে পাইনি। এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আদালতকক্ষে একটা নীরবতা নেমে আসে। সেদিন শেখ সাহেবের সাহস দেখে আমি সত্যি বিস্মিত হলাম। যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চলছে, সেই তিনি কিনা উদ্ধত ও ক্রোধান্বিতভাবে কথা বলছেন!

মামলা চলার একপর্যায়ে ১৫ দিন অন্তর ঢাকা সেনানিবাসে গিয়ে হুদার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। শান্তিনগর মোড় থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে যাওয়ার পথে আর হোয়াইট হাউস বলে একটা বাড়ি ছিল, সেখানে পুলিশ বিভাগের একটা দপ্তর ছিল, ওখান থেকে অনুমতি নিতে

হতো। ১৫ মিনিটের জন্য দেখা করতে দিত। ওখানে অবশ্য সবই পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত। হঠাৎ করেই তারা বলে বসত, 'আব টাইম হো গিয়া, আব চালে যাও।' ১৫ মিনিট সময়, কখনো সাত মিনিটের মাথাতেই তারা বলে উঠত, 'উঠ যাও।'

তখন আমরা চলে আসতাম।

হুদার সঙ্গে দেখা করতে আমি আর আমার মেজো ভাশুর যেতাম। মাঝেমধ্যে যেতেন আমার শাশুড়িও। ওখানে আমি শাশুড়ি বা ভাশুরের সামনে ওঁর সঙ্গে কী কথা বলব? আমার শুধুই কান্না পেত, খুবই কষ্ট হতো। সে কবে ছাড়া পাবে, কী হবে না হবে—এই সব ভাবতাম! এভাবেই চলতে লাগল। এর মধ্যে অভিযুক্তদের জন্য খাবার নিয়ে যাবার অনুমতিও দেওয়া হলো। তখন থেকে খাবার নিয়ে যেতাম। আর যেদিন মামলার শুনানি হতো সেদিন অবশ্যই যেতাম। আদালতকক্ষে আমাকে ঢুকতে দেখলেই শেখ সাহেব সব সময় জিজ্ঞেস করতেন ভালো আছি কি না। আর প্রতিবারই দূর থেকে বলতেন, 'একটুও ভয় পাবি না, কোনো ভয় নাই। ভয় পাবি না। আমরা সবাই ছাড়া পাব।'

মামলা চলছে, আদালত বা সেনানিবাসে তাঁর সাথে আমার নিয়মিত দেখা হচ্ছে। এর পরও হুদা আমাকে চিঠি লিখেছেন। এ সময় অনেক চিঠি তিনি লেখেন। আমিও হুদাকে চিঠি লিখি। এখানে ওই সময়ের বাংলায় লেখা হুদার দুটি চিঠি দিলাম। এই চিঠি হুদা লিখেছেন ৯ আগস্ট ও ২১ সেপ্টেম্বর। চিঠি দুটি অনেক দীর্ঘ। তার অংশবিশেষ এখানে দিলাম।

৯ আগস্ট
রাত আটটা

নীলু,

আজ এখন আমার মনের ভাব যে কী অশান্ত, তোকে বোঝাতে পারব না। শুয়োরের বাচ্চা, জারজ একটু আগে এসেছিল। প্রচণ্ড তর্ক করলাম সেই শয়তানটার সাথে Visit-এর সময় ও আলাদা করার ব্যাপারে। আমরা তিনজন যেসব অকাট্য যুক্তিতর্ক দিলাম, ওর মধ্যে মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র ভাব থাকলেও তা মানতে বাধ্য হতো। আর তার বদলে শুয়োরটা যেসব যুক্তি বলল, তা শুনে আমার পায়ের তলা পর্যন্ত জ্বলে গেছে। সব থেকে অসহ্য লাগে ওর Hypocrisy. শুয়োর যুক্তি দিয়ে আমাদের বোঝাতে চায় আর সেগুলো এত হাস্যকর, পথের কুকুরও

মানুষের ভাষা বুঝলে তা সহ্য করতে পারে না। শেষে রেগে বলেছি, ভোগলামি ও ভালোমানুষি দেখিয়ো না নির্লজ্জের মতো, বলো, এ সুবিধা আমাদের দিলে তোমার দুঃখে বুক ফেটে যাবে।

আজ দুপুরেও এখানকার এক মেজরের সেই জারজ সন্তান লেংটা এসেছিল বলতে আগামী মাস থেকে Mess Subscription মে মাসের ২৩ তারিখ থেকে চার্জ করবে। ওদের কথা শুনেও পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। অপমান করে অনেক কথা শোনালাম এবং স্পষ্ট বলে বলে দিয়েছি, ওদের যা ইচ্ছা করতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের...লেখার অধিকার দেবে ততক্ষণ কিছুই দেব না। আর মেসিং ব্যাপারে যেসব অনাচার করে, তার কথাও খুব করে বললাম। সেই লেংটা ডাঁট মেরে দু-চারটা কথা বলতে চেয়েছিল। তার ওপর এমন অপমান করেছি যে জারজটার লজ্জা থাকলে মরে যেত; কিন্তু এই জারজ জাতের আর যে গুণই থাক না, কোনো শত্রুই বলতে পারবে না, শুয়োরদের জাতীয় চরিত্রে লজ্জা, বিবেক ও মনুষ্যত্ব বলে কোনো পদার্থ আছে?

সেই শেখ সাহেবের অভিযোগের পর শুয়োরগুলো এখন পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে, আমাদের অসুবিধা ও বিরক্তি সৃষ্টি করার জন্য। ভিজিটের টাইম ২০ মিনিট করল, দরজা আবার বন্ধ। আর সব থেকে ফানি ব্যাপার শুয়োরগুলো করে, যাতে হাসিও পায়, রাগও লাগে। সেটা হলো রাত ১২টার পর থেকে ১৫-২০টা সেপাইকে বুট পরিয়ে Alert Practice-এর নামে বারান্দার ওপর ধপধপ করে দৌড়, দাঁড়িয়ে মার্চ টাইম করা ও সাথে সাথে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করায়, যাতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। প্রতি রাতে দু-তিনবার এ রকম করা শুরু করেছে। আমরা অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো কিছু ওদের বলিনি। তবে জারজগুলো আরও আনন্দ পাবে। আমাদের আর এক সান্ত্বনা, ওদেরই দুই জারজ এই মেসেই থাকে। ওদেরও তো Disturb হয়। কয়েক দিন পর Disappointed হয়ে নিজে থেকেই বন্ধ করে দেবে।

মাথাছেলা আবার একবার খুব গর্ব করে বলল কী একটা বিষয় যে, জানো মঞ্জুর কাদেরের[১] মতো World Famous Lawyer আছে সে এমন একটা Point বার করবে, যাতে সমস্ত Defence Lawyerকে চক্করে ফেলে দেবে। আমার মুখে প্রায় চলে এসেছিল। আর তুমি জানো না যে, তার চৌদ্দপুরুষের বাপ Defence-এর পরামর্শদাতা। কী মনে করে আর নামটা করলাম না, বললাম, আমাদের সালাম খাঁ[২]-ই যথেষ্ট

১. আগরতলা মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি।
২. অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান।

World Famous-এর জন্য। শওকত[১] আবার চট করে বলল, কই সে যে World Famous তা তো জানতাম না, Foreign Minister হওয়ার আগে তার নামই তো কেউ শোনেনি। ওর মেড়ো মার্কা শুয়োরের মুখটা দেখার মতো ছিল।

ডাক-হরকরা নাটকটা হচ্ছে। আমার কাছে অপূর্ব লাগে এই নাটকটা সব সময়। আজ বিকেলে মিসেস সা. রহমান[২] এসেছিলেন। এখন খাওয়ার সময় চিংড়ি ভর্তা ও ইলিশের তরকারি পাঠালেন এইমাত্র রহমান ভাই। জিভে পানি আসছে। আগে খেয়ে নিই। নয়তো দাঁতালটা সব ঝেড়ে দেবে।

২১ সেপ্টেম্বর
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা

সোনামণি,

গতকাল তোর চিঠির প্রচণ্ড বকুনি খাওয়ার পর একদম ভীত হয়ে পড়েছি। কাল তোর আদেশমতো Smartly কোর্টে যাওয়ার জন্য আজ সব কাপড়চোপড় ঠিক করলাম ও ইস্তিরি করলাম। ডাঁটের সঙ্গে পাইপ টানব আর তোদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব না (অবশ্য এটা করতে প্রাণ বের হয়ে যাবে।) তুই সোনা আমার পেছনে বসা থাকবি, আর আমি তোর দিকে ইচ্ছামতো তাকাব না, এটা যে আমার সংযমের কত বড় পরীক্ষা হবে, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। তবু দেখবি, তোর কথামতো কাজ করব।

তুই ঠিকই ধরেছিস, গত দু-তিন সপ্তাহ থেকে আমার স্বাস্থ্য বেশ খারাপ হয়ে গেছে এবং দুঃখ ও অসহায়তা বোধের ছাপটা মুখে খুব বেশি ফুটে উঠত, আমি চেষ্টা করেও সে ভাবটা মন থেকে দূর করতে পারতাম না। বিশেষ করে গত এক সপ্তাহ আমার মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বইছিল। এত প্রচণ্ড Nervous Tension ছিল যে এক মুহূর্ত শান্তি পেতাম না এবং রাতেও ঘুমাতে পারতাম না। এসবের বেশ কয়েকটা কারণ ছিল আর সেগুলো তুই জানিস, সেই মেড়ো থেকে শুরু করে আবুকে লেখা পর্যন্ত যে নিদারুণ Mental Torture গেছে যে শুধু আমি জানি।

৩. ক্যাপ্টেন (পরে কর্নেল) এম শওকত আলী।
৪. মিসেস শামসুর রহমান (আফসারী খানম)।

তার ওপর যেটা তুই জানিস না এবং যেটা মনে ভীষণভাবে Influence করে, সেটা হলো দুই রুমমেট। সব সময় তাদের হতাশ ভাব, হাহাকার, জীবনের ওপর ধিক্কার, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকার ছবি ইত্যাদি আমার মনের ওপর যে distress ও depression আনে তা কল্পনা করতে পারবি না। জামান[১] অবশ্য Logical। ও মাঝে মাঝে ওর মন খারাপ করে কিন্তু ওর মনের শক্তি আছে, সাহস আছে। বেশির ভাগ সময় আমার মতো Optimist, কিন্তু মুশকিল আমাদের দুজনেরই শওকত ভাইকে নিয়ে। এত দুর্বল চরিত্রের মানুষ আমি আর আগে দেখিনি। জীবন বের হয়ে যায় তার হাবভাব ও কথাবার্তা ইত্যাদিতে, বিশেষ করে গত এক সপ্তাহ থেকে Climax-এ আছে। আমি আর জামান মাঝে মাঝে রাগ করে ঝগড়াও করি। ওরাও স্বীকার করে, আমি যদি ওদের সঙ্গে না থাকতাম, তবে এত দিনে বোধহয় কিছু একটা করে ফেলত। তবুও বল, কতই পারা যায় দুজনের সঙ্গে। অবশ্য আমি আগেই বলেছি, জামান মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যায়। তবু শওকতের আছর তার ওপর হয়, আর আমি একা ওদের সঙ্গে লড়ে চলি কিন্তু এটা বেশিক্ষণ পারা যায় না। তখন আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।

আশ্চর্য লাগে যখন চার মাস Terrible Condition-এ একা ছিলাম তখন খুব গম্ভীর থাকতাম। তবে এত হতাশ ইত্যাদি হতাশ না। আর মোতাল্লেবের সঙ্গে মেলার পর সবাই অবাক হয়ে যেত আমাদের হাসি হইচই দেখে। বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য গলা ফাটিয়ে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় গালি দিতাম শুয়োরের জাতদের। তখন এই বেটা ডা. সাইদুর রহমান[২] আমাদের পাশের রুমে থাকত। ও বেটা অবাক হয়ে গার্ডদের জিজ্ঞাসা করত, আমরা মানুষ নাকি? ওই অবস্থায় কেউ হাসতে আর হইচই করতে পারে, তা ওর ধারণার বাইরে ছিল। হ্যাঁ, তখন আবার দুজনে কোরাস করে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' খুব জোরে গাইতাম। মাঝে মাঝে ও শালাকে ডাকতাম কিন্তু ভয়ে কোনো দিন জবাব দিত না। যদিও বুঝতাম, জানালার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ও চাটিগাঁইয়া পোয়া, কথা কও না কেন্? অসুরটা তাতেও সাড়া দিত না। আচ্ছা, ওটাকে দেখতে একটা ভয়াবহ অসুর লাগে না? আমার তো মনে হয়, দুর্গাপ্রতিমাতে ওর গায়ে একটু কালি মেখে বসে দিলে অপূর্ব অসুর হবে। এখন আশা করি, ইনশাআল্লাহ ওর পতন হবে ও কলাপস করবে।

১. ক্যাপ্টেন (পরে ব্রিগেডিয়ার) এম নূরুজ্জামান।
২. চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা, তখন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। আগরতলা মামলায় রাজসাক্ষী।

সত্যি বলছি, আমি যদি Lawyer হতাম, তবে Challenge করে ওকে Break করতে পারতাম Psychological Approach দিয়ে। গত দুই দিন থেকে কল্পনা করছি, কীভাবে Hypocratic look দিয়ে Dramatic dialogue-এর মাধ্যমে ওর Conscience-এর ওপর Appeal দিয়ে ওর নিজের মুখ দিয়ে স্বীকার করাতাম যে অত্যাচার ও ভয় দেখানোর দাপটে এবং এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমাকে যদি chance দিত আমি ১০০% Confident ওকে Break করতে পারতাম। কারণ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ওর Psychology ও Inner conflict লক্ষ করেছিলাম। একজন ভালো lawyer এই Psychological Approach দিয়ে ওকে easily break করতে পারে। কিন্তু defence lawyerদের মধ্যে একজনও তেমন নেই। defence lawyerদের মধ্যে একমাত্র সালাম খান Impress করতে পেরেছে আমাকে ও আতাউর রহমানকে কিছুটা, বাকি সবাই terribly disapointing। Lawyerদের এই standared দেখে আমি ও জামান মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করি, এরপর Law পড়ে Practise করতে এবং আমরা Confident এদের থেকে হাজার গুণে ভালো করব। বেশির ভাগ তো কথাই বলতে পারে না। Expression এত poor কল্পনাই করা যায় না। তোরাও হয়তো বুঝতে পারিস। তোর কি মনে হয়, এসব দেখে আমি আর জামান দুর্দান্ত lawyer হতে পারব না? কিন্তু আমাদের শুরু করার জন্য বয়সটা বেশি হয়ে গেছে।

যাক, কী বলতে কিসে সব এসে গেল, তবে শওকত ও জামানের কথা ওদের বউদের বোলো না, কিন্তু তবে ওরা দুঃখ পাবে এবং আমার ওপর রাগ করবে। এটা শুধু তোমাকে জানানোর জন্য। valiumটাতে আমার খুব উপকার হয়েছে। এখন মনে হয়, এত দিন ঘুম না হওয়ায় ও tension এত বেশি থাকাতেই ওই অবস্থা হয়েছিল। আজ খুব normal লাগছে। দিনেও আজ খুব ঘুমালাম। ঘুমই আমাদের এখন একমাত্র ওষুধ।

এবার একটা খুব কাজের কথা লিখে নিই। খতমে তাহলিল আমি আস্তে আস্তে পড়ছিলাম, জামান ও শওকতও পড়ে, তবে ওরা count রাখেনি। আমি এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ হাজার ৭০০ বার পড়েছি। সুতরাং দিনরাত পড়লেও ওটা রমিজ[১] আসার আগে শেষ হবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে সারা-খালুকে immediately contact করো। ওনাকে বলে ২৫ বা ৫০ আলেম টাইপের লোক দিয়ে দুই দিনে বা চার দিনে এক

১. ফ্লাইট লে. মীর্জা এম রমিজ, মামলায় রাজসাক্ষী।

লাখ বার পড়িয়ে নাও এবং বাকি ২৫ হাজার আমরা তিনজনে রমিজ আসার আগেই শেষ করতে পারব ইনশা আল্লাহ। Baitul Mokarram-এর মসজিদে উনি easily লোক জোগাড় করে এটা করিয়ে ফেলতে পারবেন। তবে naturally কিছু টাকা খরচ করতে হবে তোমাকে ওনাদের জন্য। <u>এটা আজই ওনার কাছে গিয়ে ঠিক করিয়ে আসিস, যাতে আগামীকাল থেকেই শুরু হয়।</u> Saidur Rahman-এর minimum এক সপ্তাহ লাগবে। ২৫ জনে daily এক হাজার বার করে পড়লেও আট দিনে এক লাখ বার হবে বাকি ২০ হাজার বার (পাঁচ হাজার কাল হয়ে যাবে আমার) আমরা দু-তিন দিনে শেষ করে ফেলব।

কী ঠিক করলে, আগামীকাল অবশ্য অবশ্য জানাবে। বাকি নামাজ, নফল নামাজ, আয়াতুল কুরসি (তিনবার করে প্রতিটি ফরজ নামাজের পর ও শোবার আগে পড়ি), দরুদ শরিফ নাম-পাক, মাগরিবের ওয়াজিফা সব ঠিকমতো পড়ে যাচ্ছি। দোয়ায় ইউনুস পড়ি সব সময় ও কোর্টেও। প্রতিদিন এক ছিপাড়া করে কোরআন শরিফও পড়ি। ফজর ও মাগরিবের পর। এদিক থেকে কোনো চিন্তা কোরো না। গতকাল থেকে প্রতি নামাজের পর মনের শক্তি ও সাহস ফিরে পাওয়ার জন্যও দোয়া চাই। আজ খুব ভালোভাবে কাটল তাঁর ইচ্ছায়।

সত্যি, মানুষ অল্পতে সুখী হয় না। আগে তোমার চিঠি পড়েই মনে হতো জীবনের সব অশান্তি দূর হয়ে গেল। আর তোমাকে কেউ দেখলে বা তোমার সঙ্গে কথা ফোনে হলে তাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতাম এবং তার মধ্যে বিরাট পরিতৃপ্তি পেতাম আর এখন তোমার আসল চিঠি পাচ্ছি প্রতিদিনই একসঙ্গে চার ঘণ্টা থাকছি, ২০ মিনিট কথা বলছি এর পরও সুখী হই না। সত্যি, মানুষ আল্লাহর কাছে অকৃতজ্ঞ। অন্ততপক্ষে আমি, আর তোমার তুলনায় আমি কত বেশি, তুমি কেমন সুন্দর সব মেনে নিয়েছ। আল্লাহর কাছে শোকর করো, অথচ আমি আরও চাই। তোমার কাছে স্বপ্নের কথা জানতে চেয়েছিলাম রসুলপাক ও গাউসপাককে নিয়ে যা দেখেছ জানিয়ো, শুনে মনে বল পাব।

জেঙ্গির হুজুরপাক যা বলেছেন indetail তা জানিয়ো। নতুন কী দোয়া দিলেন, তা জানিয়ো।

তোমার মাড়ির ulcer-এর কথা শুনে খুব চিন্তা লাগছে। কী ওষুধ খাচ্ছ এবং উপকার হলো কি না কাল জানিয়ো। প্রতিদিন তবে অবশ্যই খাস, যত দিন না ঠিক হয়। আমি খুব চিন্তায় থাকব, please কাল জানাস, কোনো improvement হলো কি না? মাড়িতে হওয়াটা কি খুব dangerous ব্যাপার? আল্লাহ জলদি এটা ভালো করে দেন দোয়া করি।

আর তুই ওষুধ দুধ-হরলিকস ঠিকমতো খাচ্ছিস শুনে সুখী হলাম। আমিও হরলিকস ঠিকমতো খাই।

আচ্ছা, গত কয়েক দিন থেকে রাতে ও সন্ধ্যায় গত বছরের মতো সেই অম্বল ভাবটা হচ্ছে। কোনো ট্যাবলেট পাঠাস। সঙ্গে কিছু disprin ও codo দিস। আমি তো প্রতিদিনই শেভ করে কোর্টে যাই। তোর কেন মনে হয় শেভ করি না? Lutful Hudaর[১] দিন চশমা পরতেই হবে। কারণ শালারা ওকে আমার যে ছবি দেখাবে সেটা চশমা ছাড়া চেহারা শুধু সেদিন রোল্ড গোল্ডের গোল মার্কা কোনো চশমা পরব এবং পাঞ্জাবি-পাজামা ইস্তিরি ছাড়া পরে যাব চুল back brush করে। আশা করি, মিথ্যুকটা চিনতে পারবে না।

গতকাল জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম; শুক্রবারে একটা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তোকে বলা হয়নি। পেয়েছিলি ওটা?

Visiting hours-এর ব্যাপারে আমিও তোর সঙ্গে একমত। ওটা ওদের নিজেদেরই বোঝা উচিত ছিল এতটুকু consideration ওদের নিজের থেকেই করা উচিত। ধরলাম, তোর জন্য না করল কিন্তু অন্ততপক্ষে আমার কথা ভেবেও তো করা উচিত। যাক, জগতে অনেক উচিতই হয় না, তখনই সব গন্ডগোল। আশা করি, তুইও এটা বুঝবি ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার বলা বা লেখা কতখানি delicate তবু আমি ও জামান[২] পরামর্শ করছি। কাল বা পরশু জামান আবুকে লিখে জানাবে। তুই এ নিয়ে চিন্তা করিস না। শুধু এইটুকু জানিস, এর জন্য তোর থেকেও আমি বেশি অসুখী। MC-এর সঙ্গে তুই বলার আগেই দু-তিন দিন খুব ঝগড়া করেছি এ নিয়ে। কিন্তু শুয়োরের জাত এটা করে একটা বিরাট sadistic pleasure পায়। হ্যাঁ, সেদিন শালাকে ধরেছিলাম সেই মিথ্যা বলার জন্য। ও খুব শুনিয়েছিলাম। এটা-ওটা মিথ্যা বলে কাটাল। জামান ভাই কি আসে তোর সঙ্গে দেখা করতে? আমি তাকে লেখার কথাও চিন্তা করছি এ বিষয়ে, কাল-পরশু finally লিখব। শাহজাহান[৩] ভাই থাকলে বেশ হতো, as a third person। সে আবুদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারত। জামান ভাইকে দিয়ে এভাবে সম্ভব কি না জানাস কাল, তা না হলে জামান আবুকে direct লিখবে। যাক, তুই এ ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করিস না, আমি ব্যবস্থা করব। অবশ্য আমি ১০০% sure ওরা misunderstand করবে কিন্তু উপায় নেই।

১. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, পাকিস্তানি।
২. হুদার চাচাতো ভাই।
৩. হুদার খালাতো ভাই, পিআইএর বৈমানিক ছিলেন।

এতুর জন্মদিনের ব্যাপারে আবুদের নীরবতা আমাকে মর্মাহত করেছে। আমি এত shocked, বলতে পারি না। আমি যদি সেদিন আবুর জায়গায় হতাম, আমার বাসাতে আমার নিজের ছেলের থেকেও বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতাম। ওদের তরফ থেকে এটাকে আমি cruelty বলব। সত্যি বলতে কি, আমি মাঝে মাঝে আশা করতাম, আবু নিজে থেকে ওর জন্মদিন করাবে। এ দুঃখ আমার কোনো দিন যাবে না যে, আমার ছেলের প্রথম জন্মদিনে ও দাদি ও চাচার আশীর্বাদও পেল না, অনুষ্ঠান তো দূরের কথা। এ কথা আমি তাদের একদিন বলবই। আশা করি কাল আবুর কাছ থেকে সে চিঠির উত্তরটা পাব।

কোর্টে তোদের army officer-এর wife হিসেবে যে attitude নিয়েছিস, তা appreciate করি এভাবেই সম্মান বজায় রাখবি কিন্তু SB কোনো শুয়োর যদি আবার তোদের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তবে স্লিপার খুলে মুখে মারবি।

আর আমার জন্য চিন্তা করিস না, আমার depression ভাবটা চলে গেছে। তোদের হাসিমুখ দেখলেই আনন্দ পাব। এর পরদিন, বিশেষ করে আমাদের রিপোর্টারদের SB লোকদের শয়তানির কথা বলবি, নিশ্চয় ছাপা হবে এবং ওদের টনক নড়বে। খুব appeal দিয়ে বলবি।

আশা করি, তোরা সবাই ভালো আছিস। এর পরদিন শাদান-ফুয়াদের[১] সুনাম দিয়ে দিস nephew-nice বলে বয়স mention করে। আশা করি, MC Permission দেবে। ওদের দেখতে ও আদর করতে খুব ইচ্ছে করছে। ওদের ও এতুমণিকে আমার চুমা দিস। গণ্ডু ভাইদের সঙ্গে Fall of Roman Empire দেখিস। তুই অবশ্য ভাবিস না, আমাদের রুমে সব সময় গম্ভীর ভাব থাকে। আমি ও জামান মিলে...কে খুব হাসাই মাঝে মাঝে। ইলিশটা খুব মজার ছিল। মালাকে আমার চুমা দিস ওর রান্নার জন্য। Tobacco শেষ, কাল পাঠাস, Legation কম দাম পড়বে।

গুডু

এমনি করতে করতে দ্রুত সময় পেরোতে লাগল। মামলাও চলতে থাকল। আমার মন খারাপ থাকত মামলার কাজকর্ম বন্ধ থাকলে, ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ মিলবে না বলে। তারপর ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারিতে এই মামলার শুনানি শেষ হলো। এর আগে ১৮ জানুয়ারিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

১. আমার বড় ভাইয়ের ছেলে।

করে মিছিল বের করল। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হলে শুরু হলো ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মহা তোলপাড় করা সেই সব ঘটনা। তোফায়েল আহমেদ তখন ডাকসুর ভিপি। ছাত্রলীগের নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ আর নূরে আলম সিদ্দিকী। সেই সময় তোফায়েল আহমেদকে দেখলাম। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন দেখলাম। চারদিকে বিদ্রোহের আগুন।

এর মধ্যে শোনা গেল রাজনীতিবিদদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের কথা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে সেই বৈঠক আহ্বান করেছেন। বৈঠকে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এই সময় একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকল। ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে পাকিস্তানি মিলিটারি গার্ডরা ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় গুলি করে। এরপর তাঁদের দুজনকে সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পর ফজলুল হক বেঁচে গেলেও জহুরুল মারা গেলেন। তাঁদের দুজনকে গুলি করার ঘটনা ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ গতিতে প্রচার হয়ে গেল। রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হলো, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মিলিটারি গার্ডরা গুলি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই খবর কেউই বিশ্বাস করল না। বরং পরদিন ঢাকার সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে পড়ল। ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সব মানুষ যেন রাজপথে বেরিয়ে এল। জহুরুল হকের লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ মানুষ রাজপথ প্রদক্ষিণ করল। একপর্যায়ে জনতা বিশেষ আদালতের প্রধান বিচারক বিচারপতি এস এ রহমানের বাসভবনে (বাংলা একাডেমী চত্বরের বর্ধমান হাউজ) হামলা চালাল। পরে শুনলাম তিনি পালিয়ে গেছেন। জনগণের বিক্ষোভ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা নিহত হলে তখনকার সেই জনবিক্ষোভ গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হলো। প্রতিদিনই ঢাকায় মিছিল আর সমাবেশ হচ্ছে। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যোগ দিচ্ছে। সেনানিবাসের বিশেষ আদালত বন্ধ, কোন দিন রায় ঘোষণা হবে, কী হবে বুঝছি না! চারদিকে নানা গুজব।

মামলা থেকে সবাই মুক্ত

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আদালত বন্ধ। সকালে আমি এলিফ্যান্ট রোডে সার্জেন্ট জহুরুল হকের বড় ভাই আমিনুল হকের বাড়িতে গেলাম। যেতেই ওখানকার কাজের লোকজন আমাকে দেখে বলল, 'আপনি জানেন না! আজকে আগরতলা মামলার আসামিদের সবাই ছাড়া পেয়েছেন। সেনানিবাসের দিকে মিছিল যাচ্ছে। আপনি সেনানিবাসে যান।'

আমি তাঁদের কথা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। ওদের বললাম, ঠিক আছে, আমি তাহলে কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বাড়ি 'আলেয়া'তে যাই। তাঁর বাড়িও এলিফ্যান্ট রোডে ছিল।

আলেয়ায় গিয়ে দেখি, ওই বাড়ির সবাই গাড়িতে উঠছেন। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের মেয়ের হাতে ফুলের তোড়া। বেগম মোয়াজ্জেম আমাকে দেখে বললেন, 'গাড়িতে ওঠো। তুমি খবর জানো না? সবাইকে তো ছেড়ে দিয়েছে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

তাঁর গাড়িতে করেই ঢাকা সেনানিবাসে গেলাম। তখন দুপুর। সেনানিবাসের মুখে প্রচণ্ড ভিড়। সবাই গেছে তাঁদের আনতে। ঢাকার সেনা কর্তৃপক্ষ মামলার আসামিদের পরিবারের দু-একটা গাড়ি ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে এখন যেখানে জাহাঙ্গীর গেট, তার এপাশে অনেক লোক আর ওপাশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্ডন। তার ভেতর দিয়ে মিসেস মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আমি গেলাম। হুদাদের যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখি, আমার ভাশুরও এসেছেন। ওখানে আমি হুদাকে মুক্ত অবস্থায় পেলাম। শুনলাম, শেখ মুজিবকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হুদাকে সঙ্গে করে আমি ও আমার ভাশুর বেরিয়ে এলাম। আমরা সোজাসুজি গেলাম ধানমন্ডিতে আমার ভাশুরের পুরাতন ২০ নম্বর রোডের বাড়িতে। ওখানে আমার শাশুড়ি আগে থেকেই ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন, আমরা আমার ভাশুরের বাড়িতে এসেছি, তখন আমার শাশুড়ি তো কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না! তখন তো আর এখনকার মতো মোবাইল ফোন ছিল না। লোক মারফত বা টেলিফোনেই করা হতো সব ধরনের যোগাযোগ। খবর পেয়ে হুদাকে দেখতে আমার বড় ভাই, মেজো ভাইসহ আরও আত্মীয়স্বজন ভাশুরের বাড়িতে এলেন।

রাতে আমরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে গেলাম। সে বাড়ির আশপাশ লোকে লোকে মহারণ্য। মানুষজনের প্রচণ্ড ভিড়। রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা নেই। আমরা সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে বাড়ির ভেতরে গেলাম। সেখানে তখন মহা উৎসব চলছে।

সেই উৎসবে অনেকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। দেখা হলো শেখ সাহেবের সঙ্গে, তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে। সত্যি বলতে কি, সে সময় বেগম মুজিবের সঙ্গেও আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও আমার শাশুড়ির দিক থেকে আত্মীয়তার সূত্রে আমার ভাশুরেরা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। বেগম মুজিব হুদাদের আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তার পর থেকে আমি আর হুদা প্রায়ই ওই বাড়িতে যেতাম। প্রথম দিকে অবশ্য আমি একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলতাম, কিন্তু শেখ সাহেব সেটা করতে দিতেন না। দেখা হলেই বলতেন, আয়, বস, আরে তুই—এভাবে সম্বোধন করে আপন করে নিতে চাইতেন।

তাঁর গুণের আর একটি কথা না লিখলেই নয়। ৩২ নম্বরের বাড়িতে কয়েকটি ডালিমগাছ ছিল। কিছুদিন পর একটা বা দুটো গাছে বেশ ডালিম হয়েছিল। ছোট ছোট সব ডালিম। একবার হলো কি, আমার ছেলে হাত তুলে ওগুলো পাড়তে চাইছিল। তখন ওকে আমি বলছিলাম, না, ওটা পেড়ো না। ব্যাপারটা দেখে শেখ সাহেব আমাকে বললেন, 'কী, বাচ্চা একটা ডালিম পাড়তে চাচ্ছে, আর তুই পাড়তে দিবি না?' কথাটা বলেই আমার বাচ্চাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ওকে উঁচু করে তুলে ধরে ওর হাত দিয়েই ডালিম পাড়ালেন।

আমি শেখ সাহেবকে এত কাছ থেকে দেখেছি যে তাঁকে ভুলতে পারা সহজ নয়। আমার জীবনে তিনি একজন মহামানব। আমি যেমন মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, সুভাষচন্দ্র বসু, খুদিরাম, চে গুয়েভারাকে সব সময়

যে সম্মানের আসনে বসাই, শেখ মুজিবের আসনও আমার হৃদয়ে সেখানেই। সব সময় আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আগের কথায় ফিরে যাই। ২২ ফেব্রুয়ারিতে হুদাকে সোজা ভাশুরের বাড়িতে গেলেও আমরা রাতে থাকি আমার বড় ভাই মুরাদের বাসায়। রাতে ৩২ নম্বর থেকে আমরা সোজা সেখানে যাই। বড় ভাইয়ের বাড়িতে দু-তিন দিন থাকার পর আমরা বরিশালে গেলাম। আমার শ্বশুর খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেনের পৈতৃক বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। সরকারি চাকরিসূত্রে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার আগে বরিশালে বাড়ি কিনেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর আমার শ্বশুর স্থায়ীভাবে সেখানেই থেকে যান। হুদা বরিশালের বিএম কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।

বরিশালে এই সফরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমার বড় ভাশুর। সেখানে গিয়ে দিন কয়েক থাকলাম আমরা। তারপর ফিরে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় আসার পর থেকে আমাদের ভাবনা শুরু হলো, আমরা কোথায় থাকব, কী করব না করব—এসব নিয়ে। তখন হুদার চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই—এই আশঙ্কা ভেতরে ভেতরে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। জুন মাসে হুদাকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্তই করা হলো। এরপর আমরা একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম পল্লবীতে। পল্লবী তখন একটা গ্রামের মতো। ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম সেই সময় ওখানে একটা হাউজিং সোসাইটি করছেন।

ঢাকা শহরে থাকার মতো টাকাপয়সা আমাদের ছিল না। এত দিন আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। এবার আমরা সবাই যে যার মতো করে আলাদা থাকতে শুরু করলাম। তা ছাড়া হুদা যেহেতু রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামি ছিলেন, ছাড়া পেলেও তখনো আমাদের সাবধানে থাকতে হতো। আমার মেজো ভাশুর কাজ করতেন ব্যাংকে। হুদা চিন্তা করলেন, ওঁর কারণে তাঁর এবং অন্যদের যদি কোনো অসুবিধা হয়! ফলে সব দিক বিবেচনা করে কারও সঙ্গে থাকতে হুদা রাজি হলেন না। সে কারণেই আমাদের পল্লবীতে চলে যাওয়া। ওখানে ২২৫ টাকার একটা ভাড়াবাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলাম। সেই সময় আমাদের নগদ টাকাপয়সা, জিনিসপত্র তেমন কিছুই নেই। সঙ্গে ছিল শুধু এক কাজের ছেলে। ওর নাম কদম আলী। আমার তখনকার সব কথা মনে আছে।

হুদা সকালবেলা চলে যেতেন শহরে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ায় সে টাকাপয়সা কোনো কিছুই পায়নি। এ অবস্থায় আমাদের তখন ২২৫ টাকা ঘর ভাড়া দেওয়ারও সামর্থ্য ছিল না। আমার বড় ভাশুর, মেজো ভাশুর এবং আমার বড় ভাই আমাদের নানাভাবে দেখতেন, সাহায্য করতেন। সেই সময় ওখানে বেশি বসতি হয়নি। অল্প কিছু মানুষ। হুদা শহরে এলে আমি একা বাচ্চা নিয়ে বাসায় থাকতাম। আরেকটা কাজের ছেলে। আমার রীতিমতো ভয়ই হতো। আর পল্লবী থেকে আসা-যাওয়া করা ভীষণ একটা সমস্যা ছিল। বাসে করে আসতে হতো। তখন অবশ্য বাস যেত সেখানে। আমরা বাসেই যাতায়াত করতাম। মাঝেমধ্যে আমাকেও শহরে আসতে হতো নানা কাজে। ভাগ্যিস, কলকাতায় আমার জন্ম। সেখানে ট্রামে-বাসে চড়ার অভ্যাস ছিল। ফলে বাসে চলাচল করতে গিয়ে আমার সমস্যা হয়নি। আজও হয় না।

পল্লবীতে কিছুদিন থাকার পর আমরা বড় মগবাজারে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বাবার যে বাড়ি, তার পেছনের একটা গলিতে ৩০০ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটা একতলা বাড়ি ভাড়া নিলাম। সেই বাড়িতে দুটো বেডরুম, একটা রান্নাঘর, একটা বাথরুম, একটা বারান্দা। ওখানে আমরা থাকতে লাগলাম। আর হুদা চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে লাগল এখান থেকে সেখানে। কিন্তু তাঁর জন্য সব দরজা তখন বন্ধ। আত্মীয়স্বজনও কেউ কিছু করে দেন না। দেন না তাঁরা ভয় পান বলে। আমার এক ভগ্নিপতি, তাঁর নাম রফিকুল আমীন, তাঁকে আমি সারা জীবন স্মরণ করে যাব। ইস্পাহানিদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন। তিনিই হুদা আর এ এন এম নূরুজ্জামানকে ঘোড়াশালের দিকে একটা কাজ পাইয়ে দিলেন। ওখানে নদীর পাড় থেকে কাঁচা পাট কিনে পাটকলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। তাতে করে কিছু টাকা তাঁরা পেতেন। তাতেই আমাদের চলে যেত। নূরুজ্জামানেরও তখন আমাদের মতো অবস্থা। হুদা ও নূরুজ্জামান, দুই বন্ধু মিলে কাজটা করতেন। খুবই কষ্টের কাজ। ট্রাকের ওপর বসে তাঁদের যেতে হতো। নদীর পাড় থেকে পাট কিনে তা বিক্রি করতে হতো পাটকলে।

তখন এমন সময়ও গেছে, একেক দিন আমাদের বাচ্চার দুধ কেনার পয়সা পর্যন্ত থাকত না। এই অবস্থায় একদিন আমি হুদাকে বললাম, হাতে একদম টাকা নেই। আর কত লোকের কাছে হাত পাতব? তার চেয়ে আমি আমার কিছু গয়না বিক্রি করি। তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বিক্রি করতে পারো। তবে তোমার বাবার বাড়ির গয়না না। তুমি বিক্রি করতে পারো আমার মায়ের দেওয়া গয়না। তোমার শাশুড়ির দেওয়া গয়না।'

আমার অনেক গয়না ছিল। সব বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়া। তা থেকে কিছু গয়না আমি বিক্রি করলাম। আমার শাশুড়ির দেওয়া গয়না আর মায়ের দেওয়া দু-চারটা গয়না মিলিয়ে মোট ১০-১১ ভরি সোনা বিক্রি করে সেই সময় পেলাম প্রায় এক হাজার টাকা। এ সবকিছুই সেই ঊনসত্তর সালের কথা। সেই টাকা পেয়ে আমি দু-তিন দিন পর পর বাজার করেছি। এই সময় আমার মা হঠাৎ কলকাতা থেকে ঢাকায় এলেন। এসে দেখেন আমার ঘরে কোনো ফ্যান নেই, ফ্রিজ নেই, বসার মতো কোনো আসবাব নেই। মা আমাদের বসার ঘরের জন্য বেতের টেবিল-চেয়ার কিনে দিলেন। কিনে দিলেন একটা স্টিলের আলমারি, ফ্রিজ। লাগিয়ে দিলেন দুই ঘরে দুটো ফ্যান। দেখলেন, হুদার পরনে ভালো কাপড়চোপড়ও নেই। কলকাতায় আমার বড় বোনকে খবর পাঠালেন। তাঁকে বললেন ওঁর জন্য ছয়টা শার্ট পাঠিয়ে দিতে। আমার ঘরও সাজিয়ে দিয়ে গেলেন মা।

আমার বড় ভাশুর নূরুল হুদা ঠিকাদারি কাজ করতেন। সেই সময় তিনি কুষ্টিয়ার একটা নদীতে বাঁধ দেওয়ার কাজ পেলেন। এই কাজের অর্থের জোগানদাতা ছিলেন নিশাত জুট মিলের মালিকপক্ষের একজন। তাঁর নামটা আজ আর মনে করতে পারছি না। নিশাত জুট মিলের মালিকদের সঙ্গে আমার মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। সে কারণেই হয়তো নিশাত জুট মিলের ওই ব্যক্তি আমার বড় ভাশুরকে টাকা দিয়েছিলেন। বড় ভাশুর ওই ঠিকাদারি কাজটা পাওয়ার পর সেটা দেখাশোনা করতেন হুদা আর নূরুজ্জামান। এই কাজের সুবাদে তখন হুদার হাতে কিছু টাকাপয়সা এল।

কিছুদিন পর আমরা মগবাজারের বাড়ি ছেড়ে ২২ নম্বর হাতিরপুলে 'রিনাডেল' নামের একটা বাড়িতে এসে উঠলাম। সেই বাড়িতেও আমি একাই থাকতাম। হুদা কয়েক দিন পর পর ঢাকায় আসতেন। এসে দু-তিন দিন থেকে আবার কুষ্টিয়ায় চলে যেতেন। এই সময় আমি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়লাম। তারপর দেখতে দেখতে ১৯৭০ সাল এসে গেল। আগস্টে আমাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে।

এরপর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হলো পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হলো। শোনা গেল, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমতা দিল না। তখন আবার আন্দোলন শুরু হলো। আমার পক্ষে বাইরে

যাওয়া সম্ভব হতো না। খবরের কাগজ পড়ে বা এর-ওর মাধ্যমে যতটুকু জানতে পারি প্রতিদিনের ঘটনা। এই সময় হুদা প্রায়ই ঢাকায় আসতেন। তারপর ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ শেখ মুজিব তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনতে হুদা কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এলেন। তখন আমার মেয়ের ছয় মাস বয়স। হুদা কয়েক দিন ঢাকায় ছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে গেলেন তিনি আর আমার ভাই জাকারিয়া।

৭ মার্চের পর একদিন রাতে আমাদের বাসায় বাঙালি সেনা কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফ এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন আমার ফুফাতো বোনের স্বামী পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার সাইফুর রহমান মীর্জা। মীর্জা ভাই মুক্তিযুদ্ধের সময় যুব শিবিরের মহাপরিচালক ছিলেন। স্বাধীনতার পর সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সবাই এস আর মীর্জা নামে বেশি চেনে।

১৯৭১ সালের সেই সময় খালেদ মোশাররফ ঢাকার সেনা সদরে ছিলেন। তিনি তখন মেজর। ফেব্রুয়ারি থেকেই দেখি, হুদা ঢাকায় এলে খালেদ মোশাররফ এবং মীর্জা ভাই আমাদের বাসায় আসেন। তাঁরা হুদার মাধ্যমে ঢাকার সেনা সদরে কী কী হচ্ছে, তা শেখ মুজিবকে জানাতেন। সেদিন মীর্জা ভাই এসে সরাসরি হুদাকে দ্রুত বাড়ি ছাড়তে বললেন। তিনি হুদাকে বললেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতিগতি ভালো মনে হচ্ছে না, যেকোনো সময় তারা কিছু একটা করে বসবে। এ রকম অবস্থায় প্রথম লক্ষ্যবস্তু হবেন হুদারাই। খালেদ মোশাররফও হুদাকে ইংরেজিতে বললেন, 'তোমরাই প্রথম লক্ষ্যবস্তু হবে, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়ো আর গুপ্তস্থানে চলে যাও।' খালেদ মোশাররফ সেদিন হুদাকে এ কথা বলেছিলেন। শেখ মুজিবকেও তিনি এই খবরটা জানিয়েছিলেন হুদার মাধ্যমে।

খালেদ মোশাররফ আর মীর্জা ভাইয়ের সেদিনের কথায় আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় হুদা ঢাকাতেই থেকে গেলেন। কয়েক দিন পর আমরা ওই বাড়ি থেকে টিকাটুলীতে আমার নানার বাড়িতে চলে গেলাম। সেই তারিখটা ছিল একাত্তরের ১২ মার্চ।

আমার নানার বাড়িও ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। তাঁর নাম খান বাহাদুর আতাউর রহমান। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান, যিনি ব্রিটিশ আমলে প্রথম আয়কর কমিশনার হয়েছিলেন। দেশভাগের অনেক বছর পর আমার নানা কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে ঢাকার এই বাড়ি কিনেছিলেন। তিনি মারা যান ১৯৬৭ সালে।

আমরা ওখানে থাকতে গেলাম আমাদের থাকার অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য জায়গা ছিল না বলে। ওখানে কয়েক দিন থাকার পর মার্চের ২১ তারিখে আমরা কুষ্টিয়ায় চলে গেলাম আমার মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদার গাড়িতে করে। তিনি সেই গাড়িতে হুদার এক চাচাতো ভাই মোজাম্মেল হোসেন, আমার আরেক ভাশুর এবং আমাদেরকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের এ পাড়ে নামিয়ে দিয়ে যান। হুদা ওখান থেকে আরেকটা গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে গেলেন। আর আবু ভাই অর্থাৎ আমার মেজো ভাশুর ফিরে গেলেন ঢাকায়। খন্দকার কামরুল হুদাকে আমিও আবু ভাই বলে ডাকতাম।

প্রতিরোধ যুদ্ধে হুদা

২১ মার্চের পর আমি হুদার সঙ্গে কুষ্টিয়াতে ছিলাম। ওখানে গিয়েও শুনি, সেখানে প্রতিদিন মিটিং-মিছিল হচ্ছে। আমরা সেখানে একটা রেস্টহাউসে ছিলাম। আমি অবশ্য রেস্টহাউসের বাইরে তেমন বের হতাম না। বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকতাম। সকালে আর বিকেলে হয়তো বারান্দায় বা বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম। হুদা তাঁর নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ২৬ মার্চ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে হুদা ব্যস্তসমস্তভাবে আমাকে বললেন, 'বারান্দায় একদম যাবে না। সেনাবাহিনী চারদিক ঘিরে ফেলেছে।' আমি সেটা দেখার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই তিনি আমাকে বললেন, 'একদম না। সব সময় ভেতরে থাকবে। একদম বের হবে না। তুমি তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে চেনো না!'

আমাকে এই কথাগুলো বলেই তিনি কিছু সময়ের জন্য রেস্টহাউসের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেই বললেন, 'শোনো, খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা এখানে থাকতে পারব না। আমাদের গ্রামের দিকে চলে যেতে হবে।'

সেদিন রাতের বেলা আমরা রেস্টহাউসের প্রাচীর টপকে মানুষজনের বাড়ির উঠোনের মধ্য দিয়ে আমার খালুশ্বশুর ওয়াপদার প্রধান প্রকৌশলী আওলাদ হোসেনের ভাই আমজাদ হোসেনের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ওখানেই দুই দিন থাকলাম। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের কথা শুনলেও ঠিক কী হচ্ছে, তা আমি জানতে পারিনি। ওখানে যাঁদের কাছে রেডিও ছিল, তাঁরা রেডিও পর্যন্ত শুনতে ভয় পাচ্ছিল। যদি তার আওয়াজ বাইরে চলে যায়! কারণ তখন কুষ্টিয়া শহরে চারদিকে পাকিস্তানি

সেনাবাহিনী। আমজাদ খালুর বাড়িতে থাকার সময় শুনলাম, ২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আমরা কুষ্টিয়ায় যেখানে ছিলাম, সেখানে হামলা করেছিল। ওখান থেকে পালাতে গিয়ে একটা ছেলে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে মারা গেছে।

আমজাদ খালুর বাড়িতে দুই দিন থাকার পর ২৮ মার্চ আমরা নৌকায় চেপে কুষ্টিয়া থেকে পাংশায় চলে গেলাম। পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে আমি। নদী তো আমার কাছে একটা রীতিমতো আতঙ্ক। সেদিন বিকেলে আবার হঠাৎ শুরু হলো কালবৈশাখী। আমরা একটা স্থানে আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে গেলাম কসবা মাজাইলে। আমি তখন কুয়োর পানি খাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। সেই কুয়োর পানিও আমি খেয়েছি। পথে ছোট খাবার দোকান থেকে খাবার কিনে খেলাম। আমজাদ খালুর পরিবার আর আমরা পাংশা থেকে গরুর গাড়িতে করে চরের ওপর দিয়ে এসে কসবা মাজাইল গ্রামে পৌঁছালাম। পুরো পথ আমজাদ খালু সামনে আর হুদা একটা বন্দুক হাতে গাড়ির পেছনে-পেছনে হেঁটে এসেছেন ডাকাতের ভয়ে। তখন একদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভয়, অন্যদিকে ডাকাতের উপদ্রব। আমাদের এই ছুটোছুটির ফাঁকে সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারা দেশে কী করল না করল, আমি অত কিছু বুঝতে পারলাম না। তবে এই সময় হুদা আমাকে কয়েকবার বললেন, 'তোমাদের নিয়ে এসে আমি খুব ভুল করেছি। আমি জানি না, এখন কী করব।' কারণ আমাদের ফেলে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সে কোথাও যেতে পারছে না।

কসবা মাজাইলে গিয়েও আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে ভয়, হয়তো হুদার জন্যই এখানে পাকিস্তানি বাহিনী চলে আসবে। ওখানে আমি কোরআন শরিফ খুলে তাতে মাথা রেখে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, পাকিস্তানি বাহিনী যেন ওকে ধরে নিয়ে না যায় বা মেরে না ফেলে! আল্লাহ আমার এই প্রার্থনাটা রেখেছিলেন।

কসবাতে থাকা অবস্থায় দেখছি কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী থেকে, ঢাকা থেকে লোক আসছে বন্যার স্রোতের মতো। তাদের কাছ থেকে আমি কিছু কিছু ঘটনা শুনলাম। তখন ঢাকার দিকে তো লোক যেতেই পারছিল না। ঢাকা থেকে শুধু লোক পালিয়ে আসছিল।

হুদা অবশ্য আমার আগেই জেনে গেছেন সব ঘটনা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের আক্রমণ করে তাদের নির্বিচারে হত্যা এবং নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে। কোথাও কোথাও বাঙালিরা পাকিস্তানিদের

প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় তো হুদার প্রায় পাগলপারা দশা। আমি এবং ছেলেমেয়ে তখন তাঁর কাছে রীতিমতো একটা বোঝা। তিনি আমাদের ছেড়ে সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য যেতে পারছেন না, কোনো কিছু করতেও পারছেন না।

তখন এমন এক সময়, প্রচণ্ড ভয় আর আতঙ্কে বেশির ভাগ মানুষ দিশেহারা। তারা কীভাবে কী করবে, যুবতী মেয়েদের কী হবে—এই সব ভাবনায় মানুষজন তখন অস্থির। সাধারণ মানুষ একেবারে বোধবুদ্ধিহারা হয়ে পড়েছিল।

এর পাশাপাশি আবার কিছু মানুষের মধ্যে একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার মনোভাবও ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে তখন পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের ছেলেদের যুদ্ধ হচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, কুষ্টিয়াতেও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ হবে। এই খবর পেয়ে হুদা একদম অস্থির হয়ে পড়লেন। ২৯ কি ৩০ মার্চ, হুদা আমার হাতে জিন্নাহর মুখের ছবি আঁকা ১০০ টাকার দুটো কাগজের নোট গছিয়ে দিয়ে আমজাদ খালুকে বললেন, 'খালু, আপনি যদি খেতে পান, তাহলে এদের দুমুঠো খাবার দেবেন আর যদি সুযোগ পান, তাহলে এদের কলকাতায় ওর বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।' এরপর হুদা আরেকবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। কোনো কথা বলে আমার কাছ থেকে বিদায়ও নিলেন না। শুধু ইংরেজিতে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের দেখবেন।'

আমি আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আর ছেলের হাত ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমজাদ খালুর স্ত্রী বললেন, 'তুমি কি পাথর? ওকে চেপে ধরে রাখো, আটকে রাখো। ওকে যেতে দিয়ো না।'

আমজাদ খালুর স্ত্রীকে আমি চাচি আম্মা বলে ডাকতাম। তাঁকে আমি বললাম, 'চাচি আম্মা, ও আমার কোনো কথাই শুনবে না। ও যাবেই। ওকে যদি আটকে রাখি, আর পরে ওকে যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে যায়, তখন কী বলব সবার কাছে? ওকে যেতে দিন।' পরে শুনেছি, চাচি নাকি তখন কয়েকজনকে বলেছিলেন, আমার পাথরের মতো শক্ত মন। হুদা চলে যাওয়ার পর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমজাদ খালুর সঙ্গেই থাকলাম। তিনি কোথায় গেলেন আমি জানতে পারলাম না। কয়েক দিন পর রিচ পাংশা বলে একটা জায়গা থেকে হুদার একটা চিঠি এল। সেই চিঠিতে হুদা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি নদীপথ দিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে গেছেন। তাতে ঢাকায় কী হয়েছে না হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

৯ এপ্রিল তারিখে খালুর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম এল। সেই টেলিগ্রামটা এখনো আমার কাছে আছে। টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার ডিসি। তাতে লেখা ছিল, 'নূরুল হুদার ফ্যামিলিকে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দাও।' টেলিগ্রামটা পাওয়ার পর আমি কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তখন অনেকেই ভারতে বা সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। সেটা আমি শুনেছিলাম।

সেই সময় কুষ্টিয়া মুক্ত এলাকা। এই খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। ইপিআর-জনতা সমন্বয়ে গড়া প্রতিরোধ যোদ্ধারা চুয়াডাঙ্গা থেকে এসে সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে কুষ্টিয়া মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমি বুঝতে পারলাম, হুদাও ওই প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং তিনিও হয়তো ওই এলাকাতেই আছেন। তাই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম সরাসরি সীমান্তের দিকে না গিয়ে কুষ্টিয়া হয়ে যাওয়ার। কুষ্টিয়ায় যদি ওকে না পাই, তাহলে সীমান্তের দিকে যাব।

ওদিকে আমজাদ খালু তো আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। উনি বললেন, 'টেলিগ্রামে তো নূরুল হুদার কথা বলেছে। তুমি তো নাজমুল হুদার স্ত্রী।'

আমি তাঁকে বললাম, আগরতলা মামলার সময় থেকেই আমার এ ধরনের চিঠির সঙ্গে পরিচয়। ওটা সংকেতে বলা কথা মাত্র। নূরুল হুদার ফ্যামিলি বলতে আমাকেই বোঝানো হয়েছে। আমার বড় ভাশুর নূরুল হুদাকে সম্বোধন করে লিখেছে এ কারণে যে, নাজমুল হুদার নামধাম উল্লেখ করে লিখলে তো আমি ধরা পড়ে যাব। খালু, আপনি শুধু আমার সঙ্গে একটা লোক দিন। আমি কলকাতায় নয়, আগে কুষ্টিয়ায় যাব। কুষ্টিয়া তো এখন মুক্ত এলাকা। ওখান থেকে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে হুদাকে যদি পাই তো ভালো। আর যদি না পাই, তাহলে আমি সীমান্তের দিকে চলে যাব।

ইউসুফ নামে পটুয়াখালীর একটা ছেলে কুষ্টিয়াতে আমার স্বামীর সঙ্গে থাকত। ইউসুফ আমার সঙ্গেই ছিল। খালুকে বললাম, ইউসুফ আমার সঙ্গে থাকবে। আপনি আমাকে আর একজনকে দিন, যে আমাদের কুষ্টিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এদিকে আমজাদ খালু তো কিছুতেই আমার যাওয়ার ব্যাপারটা মানছেন না। অনেক বোঝানোর পর তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপর ঘোড়া না গাধা দিয়ে টানা হয়, ছইয়ে মাথা লেগে যায়, এমন একটা গাড়িতে করে

বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে আমি পাংশা রেলস্টেশনে গেলাম। ওখানে গিয়ে শুনি, সেদিন রাজবাড়ী থেকে আর কোনো ট্রেন সেখানে আসবে না। আমি হেঁটে বা অন্য কোনো বাহনে কুষ্টিয়ার দিকে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ সময় সেখানকার আওয়ামী লীগের দু-তিনজন নেতা এবং স্থানীয় এমপি ওখানে এলেন। তাঁরা আমার পরিচয় জানার পর কোনোভাবেই আমাকে যেতে দিতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, রাস্তায় পদে পদে বিপদ। সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

সেদিন, আমার গলায়-হাতে কিছু গয়না ছিল। সেগুলো আমি ইচ্ছা করেই পরে ছিলাম। ভেবেছিলাম, পথে কোথাও ডাকাত-টাকাত বা দুর্বৃত্ত কারও হাতে আক্রান্ত হলে তাদের ওগুলো দিয়ে জানে বাঁচার চেষ্টা করব। কিন্তু এমপি সাহেব আমার গয়নাগুলো দেখে আমাকে সেগুলো খুলে ব্যাগে রাখতে বললেন। ওনার কথায় আমি সেগুলো খুলে ব্যাগে রাখলাম।

আমি স্টেশনেই বসে থাকলাম। আমার তখন ভীষণ খিদে পেয়েছে। যেখানে বসে ছিলাম সেখানে একটা চাপকল ছিল। সেটা দেখে ভাবলাম, বাচ্চাদের গোসল করিয়ে দিই। ইউসুফকে বললাম চাপকল চেপে দিতে। ইউসুফ চাপকল চেপে দিল। আমি বাচ্চাদের গোসল করালাম। তারপর ইউসুফকে ১০টা টাকা দিয়ে বললাম, যা পাও, খাবার কিনে আনো।

আমার এখনো মনে আছে, ইউসুফ কোথা থেকে যেন বেগুন দিয়ে রান্না করা ইলিশ মাছের তরকারি আর মোটা চালের ভাত নিয়ে এল। আমি, আমার ছেলে আর ইউসুফ মিলে খেয়েছিলাম। আমার মেয়ের তখন মাত্র সাত মাস বয়স। ওকে কী খেতে দেব? কেবল সাদা ভাত ডলে ডলে ওর মুখে পুরে দিলাম।

ওখানেই বসে আছি। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় ওখানে রফিক নামের একজন প্রতিরোধ যোদ্ধা ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ত। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছেলে। রফিক আমাকে জানাল, সে এবং ওর সঙ্গীসাথিদের প্রায় সবাই শেখ কামালের বন্ধু। ওদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর রফিক কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলল। রফিক এখন কোথায় আছে জানি না। ওর কথাও আমার চিরদিন মনে থাকবে। সেদিন আমি ওকে আমার সমস্যার কথা জানলাম। ও আমাকে বলল, 'ভাবি, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা একটা ট্রেন এখানে আনার ব্যবস্থা করছি। একটা ট্রেন এখানে আসবে। আমরা আপনাকে সেই ট্রেনে তুলে দেব। ট্রেনটা কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাবে। ওখান থেকে আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।'

এরপর সত্যি সত্যি সাড়ে তিনটা-চারটার দিকে একটা ট্রেন ওখানে এল। ট্রেনের জন্য আমার অপেক্ষার প্রহর গোনা শেষ হলো। ইংরেজি ছবিতে আমরা এ ধরনের দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু আমার নিজের জীবনে এমন কিছু ঘটবে, সে কথা ভাবিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছোট, সাতচল্লিশের দাঙ্গার কথাও আমার তেমন মনে নেই। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ব্যাপারটাও আমি তেমন বুঝিনি, পূর্ব পাকিস্তানে চোখেই পড়েনি যুদ্ধের কোনো দৃশ্য। তখন ঢাকাতেই আমি। আল্লাহ যে আমাকে কত রকমের পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন, সে কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

ট্রেনটা এল রাজবাড়ী থেকে। কিন্তু আমি কীভাবে উঠব! দেখি গাড়িটার মাথায় বা ছাদে কিলবিল করছে মানুষ। দরজার হাতল ধরে ঝুলে আছে অগুনতি মানুষ। কামরার ভেতরে তো কথাই নেই!

আমার কোলে মেয়ে, হাতে ছোট একটা সুটকেস। তাতে সামান্য কাপড়চোপড়। আরেকটা ছোট ব্যাগে বাচ্চাদের জন্য কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র। সেটা ইউসুফের হাতে। সেদিন আমি যে কীভাবে ট্রেনে উঠলাম! আজও আমার কাছে সেটা একটা বিস্ময় হয়ে রয়েছে। ট্রেনে ওঠার পর সেই ভিড়ের মধ্যেও আমি বসার মতো একটু জায়গা পেলাম। আমাদের দেখে একটা ছেলে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। আমি মেয়েকে এবং ব্যাগটা কোলে নিয়ে বসলাম। ইউসুফ দাঁড়িয়ে থাকল আমার ছেলেটাকে কোলে করে।

একটু পর ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা চলছে আর আমি নানা কিছু ভাবছি। একসময় দেখি, আমার মেয়েটা একজন হিন্দু মহিলার হাতে কলা দেখে হাত তুলে দেখাচ্ছে। মানে সে কলা খেতে চায়। ভদ্রমহিলা দুটো কলা ছিঁড়ে আমার দুই বাচ্চার হাতে তুলে দিলেন। সেই কলা আমি আমার মেয়ে ও ছেলেকে খাওয়ালাম। একসময় ট্রেন এসে থামল গড়াই নদীর ব্রিজের কাছে।

ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। আমি ভেবেছি কোনো কারণে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকজন নেমে গেল খোঁজ করতে। কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে এলে জানা গেল ট্রেনটা সেতুর ওপর দিয়ে ওপারে আর যাবে না। ওখানে নৌকায় চেপে সবাই নদী পার হচ্ছে। লোকজন সব ট্রেন থেকে নেমে নদীর ঘাটে যাচ্ছে। তাদের দেখাদেখি আমিও ট্রেন থেকে নেমে নদীর ঘাটে গেলাম। ওখানে যাওয়ার পর ইউসুফ আমার দুই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটা নৌকায় উঠে গেল, কিন্তু আমি আর উঠতে পারছি না।

নৌকাটা ঘাটে লাগছে, আবার সরে যাচ্ছে। ঘাটে লাগছে, আবার সরে যাচ্ছে। ভয়ের চোটে তাতে আমি উঠতে পারছি না। আমি তো সাঁতার জানি না! আমার এই অবস্থা দেখে একটা ছেলে বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না। লাফ দিন, আমি আপনাকে ধরে ফেলব।' আমি চোখ বন্ধ করে লাফ দিলাম। ছেলেটা আমাকে ধরল। তারপর নৌকা আমাদের নামিয়ে দিল ওপারে একটা চরে। এখন হেঁটেই যেতে হবে।

আমার শরীর তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে জোর নেই। ভাবছি, কীভাবে আমি দুটো বাচ্চা নিয়ে চরের বালু পেরিয়ে অত দূরে হেঁটে যাব? চরের এতটা দীর্ঘ পথ ছেলেটা কীভাবে পার হবে—এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আমি একটা উপায় খুঁজে বের করলাম। বালুর মধ্য থেকে মাটি বা পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে আমি দূরে ছুড়ে মেরে ছেলেকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলাম, দেখি তো বাবু, কে আগে ধরতে পারে, আমি পারি, না তুমি পারো? এতে ভালোই কাজ হলো।

আমার ছুড়ে দেওয়া ঢিল ধরার জন্য বাচ্চা ছেলেটা দৌড়ে দৌড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওর পেছনে পেছনে আমি গেলাম স্বাভাবিকভাবে হেঁটে। সুটকেসটা আমার হাতে। মেয়েটা ইউসুফের কোলে। ছোট ব্যাগটাও ওর এক হাতে। এমনি করে শেষ পর্যন্ত চরের শেষে পৌঁছালাম। ট্রেনে আসা মানুষ যারা নদী পার হয়েছিল, তারা আমাদের অনেক আগেই নদীর পাড়ে পৌঁছে যে যার গন্তব্যে চলে গিয়েছে। নদীর পাড়ে যাওয়ার পর আমরা একটা রিকশা পেলাম। সেই রিকশায় উঠে রওনা হলাম কুষ্টিয়া শহরের দিকে। রাস্তায় তখন তেমন মানুষ নেই। কোথাও প্লেগ বা কলেরা মহামারি হলে যেমন হয়, মনে হলো সারা কুষ্টিয়ার সেই দশা। শহরের দিকে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল কেবল দু-চারটা রিকশা। মানুষ দু-চারজনকে যা-ও বা দেখা যাচ্ছিল, তারা ভয়ার্ত চোখে-মুখে ইতিউতি তাকাচ্ছিল। আমরা যখন কুষ্টিয়া শহরের কাছাকাছি, তখন আমাদের দেখে কেউ কেউ বলেও উঠল, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কি পাগল! কুষ্টিয়া শহর থেকে সবাই পালিয়ে গেছে। আর আপনি আসছেন এখানে। আপনি এক্ষুনি গ্রামে ফিরে যান। এখানে যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনারা আসতে পারে।'

আমি তাদের সঙ্গে বেশি কথা না বলে শহরে ঢুকে পড়লাম। তারপর আমার খালুশ্বশুরের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। তিনি আমাকে ওই বাড়ির সদর দরজার এবং ঘরের চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আমি রওনা হওয়ার আগে একজন লোককে সেখানে পাঠিয়ে তাকে বলে দিয়েছিলেন,

সে যেন বাড়ির সদর দরজা খুলে রাখে। কুষ্টিয়া শহরে ঢোকার পর দেখি, চারদিক খাঁ খাঁ করছে। বেশির ভাগ বাড়িতেই কোনো মানুষজন নেই। খালুশ্বশুরের বাড়িতে আমাদের পৌঁছতে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা সাড়ে ছয়টা বেজে গিয়েছিল। ওই বাড়িতে কাউকে আমি পেলাম না। যার থাকার কথা ছিল, দেখি সে নেই। আমার কাছে যে চাবি ছিল সেই চাবি দিয়ে সদর দরজায় লাগানো তালা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে, কিন্তু আলো জ্বালাতে পারছি না ভয়ে। যাতে শত্রুপক্ষীয় কেউ বুঝতে না পারে, এ বাড়িতে লোকজন আছে, আমরা আছি। রান্নাঘরের ভেতরে একটা ছোট কুপি জ্বালানো হলো। খালুশ্বশুর আমাকে বলেছিলেন, রান্নাঘরে কোথায় চাল বা অন্য সব সামগ্রী আছে, কুপির আলোয় তার সবই দেখলাম।

একটু পর ইউসুফকে পাঠালাম কুষ্টিয়ার ডিসির বাড়িতে। কারণ, তিনিই সেই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। ইউসুফ ওখানকার পথঘাট সবকিছু চিনত। কুষ্টিয়াতে সে আমার স্বামীর সঙ্গে থেকেছে। ওকে বললাম, তুমি যাও। ডিসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলবে, আমি এসেছি। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। সম্ভব হলে তিনি যেন একটা গাড়ি পাঠান। আর জেনে আসবে, আমি কখন তাঁর কাছে যাব।

ইউসুফ আমাদের রেখে চলে গেল। ডিসি সাহেবের কাছে যাওয়া মাত্র তিনি আমার জন্য গাড়ি পাঠালেন। আমি বাচ্চাদের নিয়ে তখনই তাঁর ওখানে চলে গেলাম। আমার যত দূর মনে পড়ে, কুষ্টিয়ায় তখন যিনি ডিসি ছিলেন, তাঁর নাম ছিল শামসুল হক। তিনি পরে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন। সেদিন তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি এসে গেছেন, খুব ভালো হয়েছে।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হুদা কোথায়?

তিনি বললেন, 'উনি কোথায় আছেন আমি জানি না, তিনি আমাকে কোনো খবর দেননি। তবে শুনেছি রাজবাড়ীতে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আছেন এসব এলাকারই কোথাও-না-কোথাও। মা, আপনাকে আমি গাড়ি দেব। সেই গাড়ি দর্শনা পর্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দেবে।'

আমি তাঁকে বললাম, আপনার কাছে আমার ভাশুরের একটা লাল গাড়ি আছে, টয়োটা করোলা। ওই গাড়িটা আমাকে দিন।

উনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওটাই বা অন্য যেকোনো একটা গাড়ি আমি আপনাকে দেব। সেটা আপনাদের দর্শনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

তারপর ডিসির বাড়ি থেকে খালুশ্বশুরের বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, ইউসুফ ভাত, আলু ভর্তা আর বাড়িতে থাকা ডিম তরকারি রেঁধেছে। খাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, এই দেশ ছেড়ে সারা জীবনের মতো হয়তো আমি চলে যাচ্ছি! আমি আল্লাহকে সব সময় বিশ্বাস করি। তিনি সব সময় আমার পাশে আছেন। মানুষের মৃত্যু তো আছেই। যার মৃত্যু আল্লাহ যেভাবে লিখে রেখেছেন, সেভাবেই তা হবে।

বাচ্চারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি নামাজে বসে সেজদা দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশে বলতে লাগলাম, আল্লাহ, আমাকে দেশ থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে তুমি অন্তত একবার এক মিনিটের জন্য হলেও আমার স্বামীর সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দাও।

সেদিন আল্লাহ সত্যি সত্যি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

আমি আল্লাহকে আমার পাশে কতভাবে যে পেয়েছি! তার শুমার নেই। আসলে না ডাকলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। আপনি টাকা চাইলে হয়তো তিনি দেবেন না; কিন্তু তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। আজ পর্যন্ত আমি একটা বেলাও না খেয়ে থাকিনি। হয়তো একটু কম খেয়েছি, হয়তো কম পরেছি, আমি হয়তো এখনো রিকশা আর বেবিট্যাক্সিতে চড়ি, মোটরগাড়িতে চলাচল করার সাধ্য হয় না, কিন্তু আমার তাতে কোনো খেদ নেই। কারণ, আমার চাইতে আরও কত লোক আরও বেশি কষ্টে আছে!

সেদিন আমার প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর আমি জায়নামাজেই বসে ছিলাম। এমন সময় বাইরে থেকে দরজার কড়া নড়ে উঠল। ইউসুফ তখন ঘরের বাইরে বারান্দায় ঘুমাচ্ছে। কড়া নাড়ার শব্দের পাশাপাশি হুদার কণ্ঠস্বর আর হাঁকডাক আমার কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল। তিনি ডাকছিলেন সমানে 'ইউসুফ' 'ইউসুফ' বলে। এটা যে হুদার গলার আওয়াজ, সেটা ঠাহর করতে আমার বিন্দুমাত্র ভুল হলো না। ইউসুফকে আমিও নাম ধরেই ডাকতাম। আমি তখন ইউসুফকে বললাম, ইউসুফ, দেখো, তোমার স্যার এসেছেন।

ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে সদর দরজা খুলে দেখি হুদা দাঁড়িয়ে। তাঁকে চার-পাঁচজন বাঙালি ইপিআর সদস্য ঘিরে আছে। সে আমাকে দেখেই ইংরেজিতে বলল, 'ভেতরে যাও।'

আমি ভেতরে চলে এলাম। হুদা বাইরে দাঁড়িয়ে ইপিআর সদস্যদের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বললেন। এরপর ওরা চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর তিনি ভেতরে এসে আমাকে বললেন, 'তুই কি পাগল, ওদের সামনে গিয়েছিলি কেন? ওরা সবাই এখন খ্যাপা কুত্তার মতো হয়ে আছে। কখন যে কী করে

বসবে! তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ওরা তো পাকিস্তানি সেনাও হতে পারত।' হুদা মাঝেমধ্যে আমাকে তুই-তোকারি বলতেন।

দেখি, তাঁর মুখভরা দাড়ি। সহজে চিনবার জো নেই। তাঁর পায়ে এতটাই ব্যথা যে জুতা পর্যন্ত খুলতে পারছেন না। ইউসুফকে শুধু বললেন, 'আমি একটু গোসল করব, আমাকে গরম পানি করে দে।'

আমি বললাম, ভাত আছে, ডিম ভেজে দিচ্ছি।

তিনি বললেন, 'আগে গোসল করব।' যখন জুতো খুললেন, তখন দেখলাম অনেক দিন জুতো না খোলার জন্য তার দুই পায়ে বড় বড় ফোসকা পড়ে গেছে। খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁর জুতো খুলতে। ব্যথায় উফ্-উফ্ করে কাতরাচ্ছিলেন। হুদা ইউসুফকে বললেন, 'গরম পানি কর। হালকা গরম পানিতে আমি পা ডুবিয়ে বসব।' তারপর আমাকে বললেন, 'ডিসি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, আমি তোমাকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব। তবে ভারতের ভেতরে যেতে পারব না। আমাকে সীমান্ত থেকেই ফিরে আসতে হবে।'

পরদিন সকালে তিনি আমাকে নিয়ে ডিসির দপ্তরে গেলেন। ডিসি আমাকে বললেন, 'তুমি মা ওকে নিয়ে ওপারে যেতে পারবে না। উনি কেবল সীমান্ত পর্যন্ত যাবেন। তুমি ওখানে গিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে।'

আমি সেই ডিসি সাহেবের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমাদের দেওয়া হলো একটা খোলা জিপ। ইংরেজি ছবিতে যেমন দেখায়, ঠিক সে রকমভাবেই যেন ঘটছিল সবকিছু। সেই জিপে করে আমরা সকাল ১০টার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। সেদিন ছিল এপ্রিলের ১০ তারিখ। আমার বিয়ের তারিখও ১০ এপ্রিল। আমার জীবনে ৭ আর ১০—এই নম্বর দুটো একটু অন্য রকম।

আমরা যাচ্ছি মাঠের ভেতর দিয়ে, মাটির রাস্তা দিয়ে, কখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। মূল রাস্তা দিয়ে তো আর যাওয়া যাচ্ছে না। একবার ওপরে উঠছি আবার নিচে নামছি। কুষ্টিয়া থেকে আমরা প্রথমে দর্শনায় গেলাম। ওখানে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর একটা ঘাঁটি ছিল। তিনি তখন ওই এলাকার বাংলাদেশের প্রতিরোধ বাহিনীর অধিনায়ক। উনি আমার বাবাকে আগেই ফোন করে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন এদিক দিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যান। দর্শনায় পৌঁছে আমরা আবু ওসমান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন উনি হুদাকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য বললেন। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী হুদাকে বললেন, ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে গোলাবারুদ দেওয়ার

জন্য তাদের অনুরোধ করতে। এই সব যোগাযোগ ইত্যাদি করে হুদাকে তিনি দু-চার দিনের মধ্যে চলে আসতে বললেন। মেজর আবু ওসমানের কথায় শেষ পর্যন্ত হুদাও সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতায় যাওয়ার।

তারপর আমরা দর্শনা স্টেশনের অপর পারে ভারতীয় রেলস্টেশন গেদের প্ল্যাটফর্মে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে তেমন লোকজন নেই। সেখানে বসে আছি আমি, হুদা, ইউসুফ আর আমার দুই বাচ্চা। বাচ্চারা তখন ক্ষুধায় অস্থির। আমার হাতে একটা পয়সা নেই। হুদার কাছেও বোধ হয় টাকা ছিল না। ওখানে চিঁড়া, কলা, রসগোল্লা আর কী কী সব যেন বিক্রি হচ্ছিল। বিক্রি হচ্ছিল শসাও। কিন্তু টাকা না থাকায় আমরা কোনো কিছুই কিনতে পারছি না। ঘণ্টা দুই পর হঠাৎ দেখি, কোথা থেকে একটা ট্রেন এসে ওখানে থামল। সেই ট্রেনেও খুব বেশি লোক ছিল না। একসময় দেখি, সেই ট্রেন থেকে নামছেন আমার বাবা আর আমার এক ফুফাতো ভাই। আমার মনে হলো যেন আকাশ থেকে এইমাত্র মর্ত্যের ধুলোয় এসে নামলেন ফেরেশতা। আমি আমার ছেলেটাকে বললাম, তোমার নানা এসেছে। সে তখন 'নানা', 'নানা', 'নানা' বলে চিৎকার করতে থাকল। আমি প্রায় দৌড়ে বাবার কাছে ছুটে গেলাম। আব্বা আমাদের দেখে তখন কাঁদছেন। আমিও কাঁদছি। আমাদের চোখে অবিরল পানির ধারা। ওই অবস্থায় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি বললাম, 'আব্বা, আমাদের খুব খিদে লেগেছে। খিদে লেগেছে বাচ্চাদেরও। আমাদের কিছু খাবার কিনে দাও।'

আব্বা তখন কেবল আমাদেরই নয়, আশপাশে আর যারা ছিল, তাদের সবাইকে শসা আর রসগোল্লা কিনে দিলেন। খাওয়াদাওয়া শেষে আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম। সেই ট্রেন কিছু সময় পর কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলো। তারপর একসময় আমরা পৌঁছলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে আমরা বাবার বাসায় গেলাম।

আমার বাবা মুসা কাজেমকে মুর্শিদাবাদের লোকজন যেমন চেনে, তেমনই চেনে কলকাতার লোকজনও। খুব নামকরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। কলকাতায় আমার বাবার বাড়ি যে এলাকায় ছিল সেখানকার লোকজন বলতেন, ভগবানকে প্রণাম করা যায় আর ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করা যায়। যা-ই হোক, আমরা কলকাতায় যাওয়ার পর খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই আমাদের দেখতে এলেন। তারপর আমরা গোসলটোসল করে আহারপর্ব সারলাম। আমার মা তো আমাদের জীবিত পাবেন, সে কথা ভাবতেই পারেননি। আমার মেয়েকে দেখে আমার বড়

বোন বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, সবাইকে রোগাপটকা দেখব, তোরা সব এত মোটা!'

কলকাতায় যাওয়ার পর আমি কিছুটা শান্তি পেলাম। আমার বাবার পরিবারের অনেকে মেদিনীপুরের পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। তাঁকে আমি চিনতাম। মা-বাবার সঙ্গে তার ওখানে আমি অনেকবার গিয়েছি। বিয়ের পর আর যাওয়া হয়নি। সেদিন আমার তার ওখানে খুব যেতে ইচ্ছে হলো। তারপর সেই রাতেই আমি মেদিনীপুরের পীর সাহেবের কাছে গেলাম। উনি সব শুনলেন। শুনে আমাদের দোয়া করলেন। আমি প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর কলকাতায় গেলাম। সেই পঁয়ষট্টি সালের ৩০ জানুয়ারি সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলাম আর গেলাম একাত্তরে। মাঝখানে কতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে!

পরদিন সকালে বাবার বাসায় সুব্রত মিত্র এলেন। তিনি খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন। সুব্রতদার স্ত্রী নন্দিতাদিও এলেন। আরও অনেকে এলেন। যাঁরা এলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত। তাঁদের সঙ্গে আমি হুদাকে পরিচয় করে দিলাম। সুব্রতদা আমাদের কাছ থেকে সব শুনলেন। তারপর চলে গেলেন হুদার জন্য কিছু কেনাকাটা করার জন্য। প্রাথমিক চিকিৎসাসামগ্রীসহ আরও এটা-সেটা কিনতে। আর হুদা খোঁজ খবর নিতে থাকলেন, কীভাবে ফোর্ট উইলিয়ামে যোগাযোগ করা যায়। সেদিন খবরের কাগজ পড়ে আমরা জানলাম, আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি সরকারও গঠন করেছেন। এই খবর হুদাকে উদ্দীপ্ত করল। একটা দিন দ্রুতই পেরিয়ে গেল। পরদিন আমার বাবার বাসায় আবু ওসমান চৌধুরীর ফোন এল। সেই ফোনে তিনি হুদাকে জানালেন, 'হুদা, তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, ফিরে এসো। পাকশী ফল করেছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পাকিস্তানি বাহিনী দখল করে ফেলেছে।'

পাবনার তখনকার ডিসি নুরুল কাদের খান ভাইও সেদিন ফোনের ও প্রান্তে ছিলেন। তিনিও হুদার সঙ্গে কথা বললেন। এই অবস্থায় হুদার পক্ষে আর ফোর্ট উইলিয়ামে যাওয়া সম্ভব হলো না। তিনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমিও তাঁকে চলে যেতে বললাম। হুদা আমার সঙ্গে এক কাপড়েই এসেছিলেন। আমার ছোট ভাই ওঁর মতোই লম্বা-চওড়া ছিল। সে ওঁর কয়েকটা কাপড়চোপড় হুদাকে দিয়ে দিল। দিল খাকি রঙের কডের একটা প্যান্টও। তাঁকে একটা কোটও কিনে দেওয়া হলো। না হলে ওঁর কষ্ট হবে।

কিছু ওষুধ আর কিছু খাবারদাবারও কিনে দেওয়া হলো। এরপর তিনি সবকিছু গোছগাছ করতে শুরু করলেন। অল্প কিছু জিনিসপত্র, কিট ব্যাগ আর ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে হুদা চলে গেলেন।

একাত্তরের ১২ এপ্রিল বিকেল পাঁচটার দিকের ঘটনা এটা। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো কথা হয়নি। আমার মনে আছে, আমি তখন আমার মায়ের ঘরে খাটের ওপর বসে আছি। হুদা আমাকে কোনো কিছু না বলেই চলে গেলেন। পরে পঁচাত্তরে শুনেছি যে, সুব্রতদা নাকি তখন ওকে বলেছিলেন, 'নীলুকে তুমি কিছু বলে যাবে না? তুমি যদি না ফেরো, তোমার সঙ্গে যদি ওর আর দেখা না-ই হয়, তুমি ওকে কিছু বলে যাবে না? ওর জন্য কিছু বলে যাও।'

এই অনুরোধে হুদা আমাকে উদ্দেশ করে কিছু কথা বলেছিলেন তাঁর কাছে। ওঁর সেই কথাগুলো সুব্রতদা তখন টেপ করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই টেপটার কথা আমি জানতাম না। সুব্রতদাও তখন আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। তারপর পঁচাত্তর সালের ৭ নভেম্বর হুদা মারা যাওয়ার পর আমি যখন কলকাতায় যাই, তখন সুব্রতদা টেপটা আমাকে দিয়েছিলেন। ওই টেপে ধারণ করা হুদার বলা সেই কথাগুলো স্রেফ সাধারণ কথা ছিল না, তখনকার চলমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আমাকে কী করতে হবে, ছিল তার দিকনির্দেশনাস্বরূপ কিছু কথা। ছিল তা আমার সারা জীবনের পথ চলার পাথেয়স্বরূপ বাণীও।

বড় সুন্দর ছিল টেপে রেকর্ড করা তাঁর সেই কথাগুলো। খুবই আবেদনময়। এখানে টেপে ধারণ করা হুদার সেই কথাগুলো দিচ্ছি।

> নীলু, হঠাৎ আমার চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি জানো, কী জন্য আমি যাচ্ছি। আশা করি, তুমি আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে যাবে, যেন আমি যে মিশন নিয়ে যাচ্ছি তাতে সফল হই। আর আমার মনে হয় আমি সব সময় সফল হব। কারণ আমি একটা কারণের জন্য যুদ্ধ করছি। তুমি জানো না, কত বাঙালি মারা যাচ্ছে সেখানে। এই অবস্থায় আমি এখানে এমনটা নিরাপদ জায়গায় থাকতে পারি না। তুমি সব সময় মনে একটু সাহস করে থাকবে। ঘাবড়াবে না। ইনশা আল্লাহ ঘাবড়াবার কিছু নেই। শুধু আমি যদি জানি, তোমরা ভালো আছ, তাহলে আমি যুদ্ধ করার শক্তি পাব। আর এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাস রেখে সবকিছু মোকাবিলা করবে এবং জয় আমাদের হবেই।

হুদা মুক্তিযুদ্ধে গেলেন

ভারতে যাওয়ার পর দেখলাম, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কেবল আমরাই আসিনি, বাংলাদেশের আরও কিছু মানুষ কলকাতায় এসেছে। তারা অবশ্য বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। তখনো ভারতে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের লোকজন আসতে শুরু করেনি। সেটা শুরু হলো সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার পর থেকে। এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অনেকে, বিশেষত হিন্দু জনগোষ্ঠী সবকিছু ছেড়েছুড়ে ভারতে চলে এল।

এদিকে হুদা সেই যে ১২ এপ্রিল আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তারপর থেকে তাঁর আর পাত্তা নেই। কোনো খোঁজখবর নেই। একেবারে গোনাগুনতি ১০ দিন এ রকম যোগাযোগহীন থাকলেন। তারপর ২০ এপ্রিল হুদা হুট করেই কলকাতায় আমার কাছে এসে হাজির।

এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন ১৭ এপ্রিল। সেদিনই রেডিওর খবরে আমরা এটা জানলাম। পরদিন খবরের কাগজে সে সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দেখলাম। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। মুজিবনগরে সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। হুদা আসার পর জানলাম, সেখানে হুদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানালেন, মেহেরপুরের এক আমবাগানে সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সেদিন থেকে ওই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে মুজিবনগর। চাষী নজরুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা সিনেমা আছে, তাতে ব্যবহার করা সেদিনের স্টক শটে হুদাকেও দেখা যায়।

হুদা জানালেন যে, তারা এখন পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে আছেন। আবু ওসমান চৌধুরী তাঁকে ১০ দিনের ছুটি দিয়েছেন কেবল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। তাঁর শরীরের নানা জায়গায়, বিশেষ করে দুই পায়ে ময়লা আর নোনাপানি লেগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁকে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়েছেন তাঁরা। তারপর তাঁকে দেওয়া হবে নতুন দায়িত্ব। বাংলাদেশের প্রতিরোধ যোদ্ধারা তখন সবাই ভারতে পশ্চাদপসরণ করছে। কারণ তারা তখন পুরোপুরি সংঘবদ্ধ না। ১০ দিন পর হুদা আবার কল্যাণীতে ফিরে গেলেন।

হুদা চলে যাওয়ার পর একটি ঘটনা ঘটল। ইউসুফ নামে যে ছেলেটিকে আমি সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম, সে হঠাৎ বলে বসল. ও নিজেও যুদ্ধে যোগ দেবে। ওঁর এই কথা শুনে আমার মা ওঁকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাবে? তুমি গরিবের ছেলে, তোমার মা-বাবা জানে না তুমি কোথায়। না, আমি তোমাকে যেতে দেব না। হুদার যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে এবং সে সেনা কর্মকর্তা। যুদ্ধে তাদের মতো লোকের খুব বেশি প্রয়োজন। হুদা ওর পরিবার এখানে রেখে গেছে। তোমাকে তো আমি যেতে দিতে পারি না।'

ইউসুফ তখন একটা মহৎ কথা বলল, 'নানি, স্যার যদি দুটো বাচ্চা আর আম্মাকে (অর্থাৎ আমাকে) রেখে যুদ্ধে যেতে পারেন, তাহলে আমার তো বউ-বাচ্চা কেউ নাই, আমি তো স্যারকে ফেলে চলে যেতে পারব না।' আমি এখনো ভাবি, লেখাপড়া না জানা একটা ছেলে সেই সময় কত মহৎ একটা কথা বলেছিল। আজও সে আমার দেখাশোনা করে থাকে। আর আমরাও তার দেখভাল করে থাকি। ও বাসায় এলে আমার ছেলে এহতেশাম এখনো নিজে মাটিতে শুয়ে ওকে খাটে শুতে দেয়। ও বলে, 'ইউসুফ ভাই, আমার তো বাবা-চাচা কেউ নাই, আপনিই আমার চাচা।' শেষ পর্যন্ত ইউসুফ কারও নিষেধ শুনল না। সেও চলে গেল যুদ্ধে।

এদিকে কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে বেশির ভাগ সময় আমি রেডিও খুলে বসে থাকতাম। আমার বাচ্চাদের মা-আপা দেখাশোনা করছিলেন। আর আমি সারাক্ষণ রেডিও খুলে বাংলাদেশে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, সেটা জানবার চেষ্টা করতাম। আমার ছোট ভাই তখন বিএ পড়ত। সে আমার স্বামীকে হিরো মনে করত। মে মাস থেকে ও যখন-তখন কল্যাণী চলে যাচ্ছে আর গিয়ে গিয়ে ওঁর খবর নিয়ে আসছে। অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদের ছেলেরা ওঁর বন্ধু—কুমার, ফেরদৌস ওরা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণ, ঢাকার যুবক বয়সের যারা, যাদের বয়স বাইশ থেকে তেইশের মধ্যে, তাদের নিয়ে থাকে ও।

তারপর যুদ্ধ তো চলতে লাগল। আমি কলকাতাতেই মা-বাবার সঙ্গে আছি। হুদা হঠাৎ হঠাৎ করে রাতের দিকে আমার বাবার বাসায় চলে আসেন। কোনো দিন একলা। কোনো দিন সঙ্গে কেউ থাকেন। একদিন তাঁর সঙ্গে রাতের দিকে এলেন মাহবুব (মাহবুবউদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, ১৯৭১ সালে মেহেরপুর মহকুমার পুলিশ কর্মকর্তা, পরে ঢাকার পুলিশ প্রশাসক), তৌফিক (তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, ১৯৭১ সালে মেহেরপুর মহকুমার মহকুমা প্রশাসক, পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব), সেনা কর্মকর্তা মুস্তাফিজ ভাই—মানে মুস্তাফিজুর রহমান, তিনি পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন। তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ও মাহবুবউদ্দিন আহমদকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন বিভাগে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা প্রশাসন পরিচালনার কাজে যোগ না দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন এতগুলো মানুষকে কোথায় রাখব! ভাবনায় পড়ে গেলাম। কারণ আমার বাবার বাড়িতে আর থাকার ঘর ছিল না। পরে তাদের কাউকে রাখা হলো বিচারপতি মোর্শেদের শ্বশুরবাড়িতে, কাউকে আমার চাচার বাড়িতে।

মুস্তাফিজ ভাই, তৌফিক আর মাহবুবকে দেখলাম তাঁদের প্রাণের কোনো মায়া নেই। তৌফিকের তখন বিয়ে হয়নি। কথায় কথায় তাঁরা বলছিলেন, 'আমরা মরে যেতে পারি।' তাঁরা নাকি হুদাকে যুদ্ধে যেতে অনেক করে নিষেধ করেছিলেন। ওরা বলেছিল আমাদের বউ-বাচ্চা নেই। বাঁচলে বাঁচব, মরলে মরব। আপনি যাবেন না। ওদের এই কথায় হুদা বলছিলেন, 'আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে। ওরা বাঁচলে বাঁচবে, মরলে মরবে।'

আমার স্বামীর মনোভাবও তখন এ-ই। একদিন আমার বাবাকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন, আমি জানি, আপনি কেমন মানুষ। ওদের দেখেশুনে রাখবেন। ওদের আপনার কাছে দিয়ে গেলাম।'

আমার বাবা তো হুদাকে অসম্ভব আদর করতেন। আমার মা-ও।

হুদা তখন মাঝেমধ্যেই আসতেন, যেতেন। না এলেও আমি তাঁর খবর পেতাম। হুদা ছিলেন যশোর সীমান্তসংলগ্ন বয়রায়। সেখান থেকে যখন-তখন কলকাতায় আসা যেত। হুদা লোক মারফত আমার কাছে চিঠি পাঠাতেন। আমি নিজেও তার কাছে চিঠি লিখতাম। বয়রার সাবসেক্টর অধিনায়ক ছিলেন তিনি। এটি ছিল ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (পরে কর্নেল) আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সেক্টরের সেক্টর অধিনায়ক ছিলেন। তারপর এলেন মেজর এম এ মঞ্জুর (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর

জেনারেল, ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর বন্দী অবস্থায় তিনি নিহত হন)। তিনি ১৮ আগস্ট সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব নিলেন।

এই সময় একবার আমি কিছু শুকনো খাবার কিনে হুদার কাছে পাঠালাম। তখন তিনি একটা চিঠি দিয়ে জানালেন, 'আমাকে ওসব খাবার পাঠিয়ো না। আমার লজ্জা লাগে। সকলে মিলে যা খাচ্ছে, আমিও তা-ই খাব।' ইউসুফও বয়রায় ছিল। মাঝে মাঝে সেও আসত। আমাকে ইউসুফ এসে বলত, 'স্যার ভাতের সাথে আলু ভর্তা, কাঁচা মরিচ আর পিঁয়াজ মেখে খান। আম্মা, স্যারের জন্য কিছু দেন।' আরেক দিন ইউসুফ এসে বলল, 'আম্মা, পুরো বাংকারে পানি ঢুকে গেছে। স্যার ঐখানে মাচা বানিয়ে বাঁশের চাটাই বিছিয়ে থাকেন। বালিশ আর তোশক এসব কিনে দেন।' এসব শুনে আমি ওগুলো পাঠিয়েছিলাম। সেগুলো পাওয়ার পর হুদা রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার জন্য এসব কিচ্ছু পাঠাবে না। কেন কম্বল, লেপ-তোশক এসব পাঠিয়েছ?' তিনি সবকিছু ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সবাই যেভাবে থাকে, আমিও সেভাবেই থাকব।'

তখন ব্যবসায়ী সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, সৈয়দ মুজতবা আলী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম—এঁরা সবাই কলকাতায়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাসুদ ছিলেন সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর বড় ভাই। কলকাতাতেই বসবাস করতেন। তিনি ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে আসেননি। তাঁরা মাঝেমধ্যেই আমার বাবার বাড়িতে আসতেন। অন্যদিকে কবে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশে ফিরব—আমার মাথায় কেবল এই এক ভাবনা। মনে আছে, একদিন হুদা এসেছেন মওদুদ আহমদকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন আমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রতদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। এ সময় আমাদের বাড়ি থেকে হঠাৎ করে ফোন এল। আমার মা বললেন, 'এক্ষুনি চলে এসো, দ্রুত। পাকিস্তানি বিমান থেকে কলকাতার আশপাশে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুদা ওখান থেকে উঠে সরাসরি বয়রায় চলে গেলেন। মওদুদ যাননি। আমার খুব ভয় লাগল। হুদা একেক দিন এ রকমভাবেই হঠাৎ হঠাৎই চলে আসতেন।

এ রকমই একদিন হুদার সেক্টরের যোদ্ধা সুবেদার মনিরুজ্জামান, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাদের বাড়িতেই। এটা সম্ভবত জুন মাসে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে হাসিমুখে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে হুদার টু-টু বোরের যে রাইফেলটা ছিল, ওটা কাঁধে করে নিয়ে

চলে গেলেন। কিছুদিন পর শুনি, তিনি যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুবেদার মনিরুজ্জামান সম্ভবত ২৭ জুন এক যুদ্ধে শহীদ হন। কাশীপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ওখানে আরও পাঁচ মুক্তিযোদ্ধার সমাধি আছে। তাঁদের একজন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদ ৫ সেপ্টেম্বর শহীদ হন। তিনিও হুদার সাবসেক্টরে ছিলেন। অসীম সাহসী যোদ্ধা। বয়রা সাবসেক্টরের যুদ্ধ নিয়ে পত্রপত্রিকায় তখন কলকাতার কাগজে অনেক সংবাদ ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতার পরেও ছাপা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর দৈনিক *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় বয়রা সাবসেক্টরের যুদ্ধ নিয়ে একটি সংবাদ ছাপা হয়। তাতে জনকণ্ঠের যশোর প্রতিনিধি শামসুর রহমান 'বয়রা সাবসেক্টরের বীরত্বগাথা' শিরোনামে লিখেছেন: '...মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ক্যাপ্টেন হুদাকে কেউ কোনদিন চোখের পানি ফেলতে দেখেননি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন আবেগ কখনই স্পর্শ করত না তাঁকে। কিন্তু তিনি চোখের পানি ফেলে ছিলেন মাত্র দু'দিন, যেদিন ২৭ জুন সুবেদার মনিরুজ্জামান শহীদ হন, আর যেদিন ৫ সেপ্টেম্বর আত্মত্যাগের মহিমা স্থাপন করে সহকর্মীদের জীবন বাঁচান নূর মোহাম্মদ।' ১৯৩৬ সালে নড়াইলের মহেশখালী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নূর মোহাম্মদ ইপিআরে যোগদান করেন ১৯৫৯ সালে। ১৯৭০ সালে বদলি হয়ে আসেন নিজের জেলা যশোরের সেক্টর সদর দপ্তরে। একাত্তরের ৩০ মার্চ যখন ইপিআরের যশোর সেক্টরের সদস্যরা বিদ্রোহ করেন, তখন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বয়রা সাবসেক্টরের অধীনে নূর মোহাম্মদকে তাঁর সাহসিকতা এবং নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির জন্য একটি কোম্পানি প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গঙ্গানন্দপুর পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটি থেকে কাশীপুর হয়ে বয়রা পর্যন্ত আসার কাঁচা সড়ক ছিল দুটি। একটি হলো, গঙ্গানন্দপুর-গোয়ালহাটি-আঁটুলিয়া-গুলবাগপুর-বেংদাহ-কাশীরপুর-বয়রা, অন্যটি গঙ্গানন্দপুর-বিষহরি-মৌতা-বেলতা-কাশীপুর-বয়রা।

তাদের আসার দুটি পথেই মুক্তিবাহিনীর তরফে কড়া প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। চালু রাখা হয় সার্বক্ষণিক টহলব্যবস্থাও। ৫ সেপ্টেম্বর এমন ধরনের একটি টহল দলের দায়িত্ব নিয়ে গোয়ালহাটিতে ছিলেন নূর মোহাম্মদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া এবং মোস্তফা, আর মূল দল ছিল আরও পেছনে আটুলিয়ার দিকে। তখন পড়ন্ত বেলা। ১৫০ জনের মতো পাকিস্তানি সেনা ও রেঞ্জারের একটি দল গঙ্গানন্দপুর থেকে গোয়ালহাটির দিকে এগোতে থাকে ত্রিমুখী কলাম ধরে। তাদের অগ্রবর্তী দলটির ওপর গুলি ছোড়া ছাড়া সেই মুহূর্তে তিনজনের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। গুলি ছুড়তে ছুড়তে নূর মোহাম্মদ

ও তাঁর দুই সঙ্গী নিরাপদ অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এলএমজি ছিল নান্নু মিয়ার হাতে, শত্রুর একটি গুলি এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি গুরুতর আহত হন। নূর মোহাম্মদ নিজ কাঁধে আহত সহযোদ্ধাকে তুলে নিয়ে পেছাতে থাকেন, গুলিও ছুড়তে থাকেন মাঝে মধ্যে শত্রুকে ঠেকাতে। এ সময় মোস্তফা কাছাকাছি এসে পড়ায় নূর মোহাম্মদ তাঁকে নির্দেশ দেন নান্নু মিয়াকে নিয়ে আরও পেছনে মূল অবস্থানে চলে যেতে। এরপর নূর মোহাম্মদ বারবার অবস্থান বদল করে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য গুলি ছুড়তে থাকেন। শত্রু মনে করে মুক্তিবাহিনীর অসংখ্য সৈনিক তাদের প্রতিরোধ করছে। এ সময় একটি মর্টারের গোলা এসে নূর মোহাম্মদের ডান পা গুঁড়িয়ে দেয়। জীবন-মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে তবুও সহযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর সুযোগ দিতে নূর মোহাম্মদ তাঁর শেষ বুলেটটি পর্যন্ত খরচ করেন। নান্নু মিয়াকে নিয়ে নিরাপদে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসা মোস্তফা আরও মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গীসহ শত্রুর মুখোমুখি হন। আধঘণ্টার তুমুল যুদ্ধ শেষে ২৩টি লাশ পিছু ফেলে পালিয়ে যায় হানাদার বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধারা গোয়ালহাটিতে এক জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পায় ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদের দেহটি। নরপশু হানাদারেরা গুলিবিহীন, এক কথায় নিরস্ত্র নূর মোহাম্মদকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছে। তুলে নিয়েছে তাঁর দুটো চোখও।

নূর মোহাম্মদের লাশ কাশীপুরে আনা হলে ক্যাপ্টেন হুদা সেখানে চলে আসেন। মাথার টুপি খুলে অভিবাদন জানান তাঁর প্রিয় সহকর্মীকে। বয়রা সাবসেক্টরের সাহসী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা শিশুর মতো সেদিন দুচোখের পানিতে বুক ভাসান। নূর মোহাম্মদের লাশ ছুঁয়ে শপথ নেন, যেভাবেই হোক, গঙ্গানন্দপুর থেকে শত্রুকে হটিয়ে দেবেন। পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় কাশীপুরে বয়রাগামী সড়কের ধারে নূর মোহাম্মদকে সমাহিত করা হয়। নূর মোহাম্মদ জানতেন মৃত্যু অনিবার্য, তবু টহল দলের অধিনায়ক হিসেবে নিজের জীবন দিয়ে তিনি সহকর্মীদের বাঁচিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর এই গৌরবগাথা চিরকালই অম্লান থাকবে। পর পর ছয়টি সমাধি রয়েছে কাশীপুর—প্রথমটি সুবেদার মনিরুজ্জামানের, দ্বিতীয়টি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের, তৃতীয়টি মাগুরার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ভারতে মারা যান জন্ডিসে এবং তাঁকে বাংলাদেশে এনে মুক্তাঞ্চল কাশীপুরে দাফন করা হয়। চতুর্থ কবরটি শহীদ বাহাদুরের, পঞ্চম ও ষষ্ঠটি যথাক্রমে শহীদ সিপাহি আব্দুস সাত্তার (২১ সেপ্টেম্বর-৭১) এবং শহীদ সিপাহি এনামুল হকের (১৭ নভেম্বর-৭১)। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ এই সমাধিগুলো জিয়ারত করেন। এরপর ক্যাপ্টেন হুদা তাঁর অঙ্গীকার রেখেছিলেন। তাঁর

নেতৃত্বাধীন বাহিনী বয়রা সাবসেক্টরের অধীন পাকিস্তানি বাহিনীর সমস্ত ঘাঁটি থেকেই তাঁদের বিতাড়ন অনিবার্য করে তুলেছিলেন অক্টোবরের শেষ নাগাদ। এই নিরাপদ রুট দিয়েই ১৩ নভেম্বর মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় হানাদারদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি যশোর দখলে অগ্রসর হয়েছিল। বস্তুত ৭ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত ও সেনানিবাস দখলে আসায় পদ্মার দক্ষিণে বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলায় হানাদারদের সমস্ত প্রতিরোধ শক্তিই গুঁড়িয়ে যায়। যশোরের পতন পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণকেও ত্বরান্বিত করেছিল। এই বয়রা সাবসেক্টর দিয়েই কাশীপুরের মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন ইংল্যান্ডের এমপি জন স্টোন হাউস ও পশ্চিম জার্মানির বিচারমন্ত্রী চেস্টওয়ার্থ। তাঁদেরকে মুক্তাঞ্চলে স্বাগত জানিয়ে পাসপোর্টে ভিসার সিল লাগিয়ে দিয়েছিলেন সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদসহ আরও অগণিত সাহসী বীরের অবদান রয়েছে বয়রা সাবসেক্টরের যুদ্ধে, যাঁদের কথা ইতিহাস কখনোই ভুলে যাবে না।

বয়রা সাবসেক্টরের গুরুত্ব ছিল মুক্তিযুদ্ধে অনেক কারণে। তার মধ্যে অবস্থানগত কারণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধাদের বীরত্বগাথার বিষয়টি। শত্রু জানত বয়রা সাবসেক্টরটির অবস্থান যশোর সেনানিবাসের জন্য বিষফোঁড়ার মতোই। এই সাবসেক্টরের জয়-পরাজয়ই দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে দেবে। শেষ পর্যন্ত হানাদার বাহিনী বিমান আক্রমণ পর্যন্ত চালিয়েছিল বয়রা সাবসেক্টর এলাকায়। তাদের সেসব পরিকল্পনা সফল হয়নি শেষ পর্যন্ত। জনগণ ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে নরঘাতকদের সমস্ত স্বপ্নই রুখে দিয়েছিল সেদিন, তবে অনেক রক্তের বিনিময়ে।'

তখন আমার তো কিছু করার ছিল না। আমার কাজ হয়ে দাঁড়ায় দিন-রাত কেবল রেডিওর খবর শোনা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং আকাশবাণীর খবর আমি নিয়মিত শুনতাম। রেডিওর খবর শুনে জানার চেষ্টা করতাম কোথায় কী হচ্ছে। হুদার চিঠিতেও যুদ্ধের নানা খবর পেতাম। অক্টোবরে একবার এক চিঠিতে তিনি লিখলেন :

১০ অক্টোবর ১৯৭১

নীলু,

একের পর এক ঝামেলাতে এর মধ্যে আসা হয়নি। জানি তোমার মন খুব খারাপ হয়ে আছে, এতুরও। আমিও যাওয়ার জন্য...কিন্তু একের

পর এক গোলযোগে যাওয়া হয়নি। তবে এবার ইনশাআল্লাহ ১৪-১৫ তারিখে আসব।

আজ কমলকে[১] ভেতরে পাঠাচ্ছি কোম্পানি দিয়ে। ও ছেলেটাকে আমার খুব ভালো লাগে। ও চলে গেলে গেরিলাদের সামলানো এক দারুণ ব্যাপার হবে। এর মধ্যে আমাদের কতগুলো খুব ভালো অপারেশন হয়েছে। ইনশা আল্লাহ তিন-চার দিনের মধ্যে সব থেকে বড় অপারেশন হচ্ছে। হুজুরকে আমাদের সবার জন্য দোয়া করতে বলো।

সেদিন ইন্ডিয়ান কোর কমান্ডার এসেছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলে এবং সব দেখে দারুণ ইমপ্রেসড হয়ে গেছেন। চারদিক বেশ গরম। ইনশাআল্লাহ, শিগগিরই আমরা সবাই ফিরে যাব।

এখানে দারুণ শীত পড়ে গেছে। এ মাসের মাইনা থেকে ইউসুফের সঙ্গে ৩০০ টাকা পাঠালাম। আমার কোনো জিনিসের দরকার নেই। শুধু দুই টিন পাইপ টোব্যাকো 'মার্কোপোলো' পাঠাবে।

এতু ও বেবি কেমন আছে? ওদের আমার আদর দিয়ো।

খালেদের খবর শুনে খুব মন খারাপ লেগেছে। এ সময় ওর মতো লোককে কিছুদিনের জন্য হারানো দারুণ ক্ষতি। দোয়া করি ও যেন জলদি ভালো হয়ে যায়। গত পরশু কুশলার এক লোক বলল, মা নাকি আবার কুশলাতে। বুঝতে পারলাম না সত্যি কি না। ওসব দিকে আমার বহু লোক পাঠানো হয়েছে। আশা করি, ইনশাআল্লাহ জলদি দেখা হবে এবং কয়েক দিন আমরা আনন্দে কাটাব। ভালোবাসা নিয়ো।

হুদা।

কমল সিদ্দিকীও আমাদের বাসায় কয়েকবার এসেছেন। কমল সিদ্দিকীর প্রকৃত নাম মাশরুরুল হক সিদ্দিকী, প্রকৌশলী ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কাজ করেছেন। কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন। যখন অবসর নেন তখন তিনি বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। বিএনপির নেতা মেজর জেনারেল (অব.) মাজেদুল হক তাঁর বড় ভাই। খালেদা জিয়ার শাসনামলে তিনি মন্ত্রী ছিলেন।

যুদ্ধের একদম শেষ দিকে সম্ভবত ১৫ ডিসেম্বর ভাটিয়াপাড়ায় কমল সিদ্দিকীর চোখে গুলি লাগল। সেই সময় হুদা ও কমল ওখানে গাছের গুঁড়ির আড়ালে ছিলেন। সকাল আটটার দিকে তাঁরা দুজন চা খাচ্ছিলেন। এমন সময় কমলের

১. কমল সিদ্দিকী (প্রকৌশলী মাশরুরুল হক সিদ্দিকী)।

চোখে গুলি লাগে। এরপর তাঁকে মুক্ত যশোরে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কলকাতায় নেওয়া হয়। কমল আমাকে মাঝেমধ্যে চিঠি লিখতেন। ওঁর অনেক চিঠি আমার কাছে আছে। কমলের চিঠিতে আছে, স্যার (অর্থাৎ হুদা) আমাকে নিচ্ছেন না, এ জন্য ওঁর অনেক কষ্ট। তিনি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে ছিলেন। কমল সিদ্দিকীকেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন বিভাগে নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তৌফিক ও মাহবুবদের মতো সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই চলছিল। নভেম্বরে মাঝামাঝি শুনলাম, সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ চলছে। শোনা গেল, বয়রাতেও তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ২০/২১ তারিখে শুনলাম, বয়রায় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়ে পিছু হটছে। অনেকে সেখানে যুদ্ধ মারা গেছে। তখন আমি হুদার খবর জানার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়লাম। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, সে জীবিত ও সুস্থ আছে। সেই সময় আমাদের সবার মধ্যে উত্তেজনা। চারদিকে শুধু যুদ্ধের খবর।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুকুল ভাইয়ের (এম আর আখতার মুকুল) ‘চরমপত্র’ শোনা আমার নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাসার আমরা সবাই অধীর বসে থাকতাম তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন। দেখা হলেই বলতেন, ‘চরমপত্র শুনেছিস, ক্যামন হইছে?’

আমি বলতাম, খুব ভালো হয়েছে মুকুল ভাই। আপনার প্রোগ্রামটা আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা।

তারপর হঠাৎ করেই ডিসেম্বরের ৩ তারিখ রাতে আমরা রেডিওতে জানতে পারলাম, পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে। সেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন।

পাঁচ তারিখের পর থেকে আমরা খবর পেতে থাকলাম, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক মুক্ত হচ্ছে। ৮ ডিসেম্বরে বয়রা সাবসেক্টরের আওতাধীন যশোর হানাদারমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওই দিনই ওখানকার সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের ফ্লাগ ওড়ানো হয়। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে সকালের খবরে বলা হলো, ৮ নম্বর সেক্টরের সাবসেক্টর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা যশোর সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছেন। যশোর এখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্ত। এই খবর পেয়ে সেদিন মিন্টু ভাই নামের একজন আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, ‘আরও দুটো দিন দেখে চলো, আমরা মুক্ত যশোরে যাই। তোমার বাচ্চাদের নিতে

হবে। ওদের বাবা যে দেশের একটা অংশ স্বাধীন করল, সেটা ওদের দেখাতে হবে না!'

আমি বললাম, ভয় লাগছে, দেড় আর সাড়ে তিন বছরের বাচ্চাদের নিয়ে কীভাবে যাব?

মিন্টু ভাই তখন বললেন, 'কিসের ভয়? নিজের দেশে যাবে। আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।' যশোর মুক্ত হওয়ার কয়েক দিন পর হঠাৎ করেই শুনি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেকোনো সময় আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। ১৪-১৫ ডিসেম্বর আমি বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটালাম।

মিন্টু ভাইয়ের পুরো নাম কাজী আবদুর রশিদ। তিনি মুসলিম লীগ নেতা সবুর খানের ভাগনে ছিলেন। সবুর খান পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করলেও মিন্টু ভাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। তিনি আমার এক ফুফাতো বোনের স্বামী ছিলেন।

১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে মিন্টু ভাই আর তাঁর স্ত্রী আমাদের বাসায় এলেন। ওনারা আমাকে বললেন, 'আজ যেকোনো সময় দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। চলো যশোর যাই।'

মিন্টু ভাইয়ের উৎসাহে সেদিন আমি তাঁদের সঙ্গে যশোরে গেলাম। গিয়ে শুনি, ওখানে হুদা নেই। ভাটিয়াপাড়া বলে একটা জায়গায় এক প্লাটুন পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করেনি। ভাটিয়াপাড়া তখনো দখল করা যায়নি। ওদের আত্মসমর্পণ করাতে হুদা ওখানেই আছেন।

মিন্টু ভাই আমাকে বললেন, তোমার কলকাতায় ফেরার দরকার নেই। তুমি এখানেই থেকে যাও। দেখলাম, মুক্তিযোদ্ধারাও আমাকে পেয়ে খুব খুশি। কারণ আমি তাঁদের অধিনায়কের স্ত্রী। তারাও আমাকে হুদা না আসা পর্যন্ত থাকার জন্য অনুরোধ করল। শেষ পর্যন্ত সেদিন আমি যশোরেই থেকে গেলাম। হুদা যেখানে থাকতেন সেখানে আমাকে তারা নিয়ে গেল। পরের দিন, অর্থাৎ ১৭ তারিখ রাতে তিনি এলেন। এসে আমাকে দেখলেন। কিন্তু কোনো কথা না বলে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তিনি আগেই আমার আসার খবর পেয়েছেন। এই খবর তাঁর কাছে ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা পাঠিয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম, কী হয়েছে তোমার?

ওই অবস্থাতেই হুদা ইংরেজিতে আমাকে বললেন, 'তুমি জানো, ওরা (পাকিস্তান সেনাবাহিনী) আমাদের সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। কেউ ওদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি ডা. ফজলে রাব্বিকেও ওরা হত্যা করেছে।'

ডা. ফজলে রাব্বি হুদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আবার পারিবারিক চিকিৎসকও। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় তিনি আমাকে সব সময় দেখে যেতেন। টাকা নিতেন না, বিনা পয়সায় ওষুধ দিতেন। হুদা তারপর বললেন মুনীর চৌধুরীর কথা। তাঁর ছেলে ভাষণ তখন কলকাতায়। সম্ভবত সে তখনো জানে না যে ওর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে যশোরে যাওয়ার পর আমার আর কলকাতায় ফেরা হলো না। আমি হুদার সঙ্গেই থেকে গেলাম। সেই সময় দেখলাম, যশোরের মানুষজন তো ওকে এক পলক দেখার জন্য, ওকে একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য পাগল। হুদারা সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেস্টহাউসে থাকতেন, তার পেছনে একটা মেয়েদের কলেজ ছিল। মেয়েরা দেয়াল টপকে আসত। তখন তিনি আমাকে হাসতে হাসতে বলতেন, 'এই শোন্, তুই ওদের সামনে বলবি না যে, তুই আমার বউ আর আমি তোর স্বামী। এই বাচ্চারাও আমার না, আর তুইও আমার বউ না। তুই তো বুড়ি, আর এরা সব আমার গুণমুগ্ধ ও ভক্ত। তুই কিছু বললে ওরা চলে যাবে।'

হুদার এসব কথায় আমি চুপ করে থাকতাম আর হাসতাম। এই রকম দিন যে আর ফিরে পাব না, তা তো ভাবতেই পারিনি।

তখন স্বনামধন্য লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীসহ কলকাতার আরও অনেকেই যশোরে আসতেন। চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে লোকজন এত খাবার নিয়ে আসতেন যে সে কথা বলার নয়। ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম এ মঞ্জুর রেস্টহাউসের এক অংশে, আর তার অন্য অংশে থাকতাম আমরা। হুদা তখন সবাইকে বলে দিলেন যে, 'কেউ আর খাবার আনবেন না।' আর আমাকে বললেন কোনো ধরনের খাবার বা অন্য কিছু না নিতে। মানুষজনের আনা খাবার ইত্যাদি না নিলে তারা কাঁদত কিন্তু ওঁর কঠোর নির্দেশ ছিল, কারও কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া যাবে না। এই সব দেখে মৈত্রেয়ী দেবী একদিন বলেছিলেন, 'হুদাটা না একটা বোকা ছেলে! এত মজার পিঠা নিয়ে এসেছে, অথচ আমাদের খেতে দিচ্ছে না।' সব খাবার ফেরত পাঠানো হতো।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে হুদার নতুন কর্মজীবন

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবাসী সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শুরু হলো পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলেন। তখন মানুষের সে যে কী আনন্দ! বঙ্গবন্ধু দেশের শাসনভার হাতে নেওয়ার পর হুদাকে যশোরেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। হুদা তখন মেজর হয়ে গেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাকে মেজর পদবি দিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ই তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর যশোর সেনানিবাসের ভেতরে একটা বাড়িতে আমরা চলে গেলাম। জায়গাটা তখন বিরান। এই সময় হুদার জলবসন্ত হলো।

যশোর সেনানিবাসের বাড়িতে গিয়ে তো দেখি, ওখানে দিনের বেলায়ও শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। সারা দিনরাত আমি দরজা-জানলা বন্ধ রাখি। আমার সব সময় ভয়, কখন বাচ্চাদের নিয়ে যায় শেয়ালগুলো! প্রায়ই শুনতে পাই সেনানিবাসের অমুক জায়গায় এতগুলো মৃতদেহ, তমুক জায়গায় পাকিস্তানি জোয়ানদের এতগুলো মৃতদেহ। শুনি, এইখানে এতগুলো কবর। যা ভয় পেতাম না তখন! স্বাধীনতার পর তিন মাস আমরা যশোরে থাকলাম।

এই তিন মাস সময়ের মধ্যে আমরা একবার ঢাকাতেও যাই। বরিশালেও যাই। আমার শাশুড়ির সঙ্গেও দেখা করি। বরিশালে বড় ভাশুরের সঙ্গে দেখা করে, ঢাকায় সবার সঙ্গে দেখা করে আবার আমরা ফিরে আসি যশোরে।

তখন যশোরে শেখ মুজিবের খুনি ফারুককে দেখতাম ধোপদুরস্ত পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে। তাঁকে ভালো ভালো গরম ব্লেজার পরে থাকতেও

দেখেছি। আর আমাদের তখন নিঃস্ব, ভিখারির দশা। রিলিফের কম্বল এই সব দিয়ে ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীত ঠেকাতে হচ্ছে।

ওখানে থাকার সময় ক্যাপ্টেন রহমতুল্লাহ নামে একজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর আর আমাদের বাড়ি ছিল একই গ্রামে।

তিন মাস পর হুদাকে ঢাকায় বদলি করা হলো। কিন্তু তখন সে ঢাকায় বাড়ি পায়নি বলে বললেন, 'যত দিন বাড়ি না পাই তত দিন তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকো। বাসার ব্যবস্থা হলে সরাসরি ঢাকায় চলে যেয়ো।'

এই অবস্থায় আমি বাচ্চাদের নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম। কলকাতায় চলে গেলেও অস্থির হয়ে উঠলাম ঢাকায় ফেরার জন্য। এক মাসের মধ্যেই হুদা ঢাকা সেনানিবাসে বাড়ি পেল। এখন যেটাকে বাশার রোড বলে, স্বাধীনতার আগে সেটা ছিল স্টাফ রোড। সেখানে ২৪ নম্বর বাড়ি। ওই রাস্তার শেষ বাড়িটা। ওই বাড়িটার সঙ্গে আছে আমার অজস্র স্মৃতি! সরকারকে এখনো আমি বলি, আমাকে ওই বাড়িটায় থাকতে দেওয়া হোক। আমি যে কদিন বাঁচি অথবা দু-তিন বছরের জন্য হলেও আমাকে ওখানে থাকতে দেওয়া হোক।

যা-ই হোক, কলকাতা থেকে ঢাকায় তো এলাম; কিন্তু হুদার আর দেখা পাই না। তিনি তখন একই সঙ্গে তিন তিনটা দায়িত্বে—আর্মি-সার্ভিস কোরের পরিচালক, অ্যাডজুটেন্ড জেনারেল, ঢাকার স্টেশন অধিনায়ক। তখন তো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সেনা কর্মকর্তা বেশি ছিল না। সারা দিন তিনি কাজ করতেন। সহজে তাঁর দেখা পাই না। সারা দিনই তিনি ব্যস্ত। তবু আমি এই ভেবে শান্তি পেলাম যে, থাকার জন্য আমরা একটা বাড়ি পেয়েছি। সেখানে বাচ্চা দুটো আর শাশুড়িকে নিয়ে আছি। সবচেয়ে বড় কথা, দেশ আজ স্বাধীন—বেশ ভালোই আছি। এর মধ্যেই তাঁকে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে আবার যেতে হলো যশোরে। এম এ মঞ্জুর তখন ৫৫ ব্রিগেডের অধিনায়ক। সে সময় তিনি কর্নেল। অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মতো সৎ মানুষের আজ আমাদের খুবই প্রয়োজন; কিন্তু কোথাও তাঁরা নেই!

হুদা যখন ছয় মাসের জন্য আবার যশোরে যায়, তখন আমি ঢাকাতেই ছিলাম। ভাবলাম, তিনি তো আর যশোরে বেশি দিন থাকবেন না। কারণ তিনি এবার গিয়েছেন বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে। সেটা যশোর-বরিশাল এলাকায়। আমি ১৫ দিন বা হপ্তা তিনেক পর পর যশোরে

যাই। হয়তো দু-তিন দিন থাকি। আবার ঢাকায় ফিরে আসি। অথবা হুদাও ঢাকায় আসেন। এক-দুই দিন থেকে আবার চলে যান। তিনি বেশির ভাগ সময় সেনাবাহিনীর কাজে আসতেন। তখন ঢাকা-যশোর বিমানের টিকিট ছিল ৫০ টাকা। যেহেতু তিনি সেনাবাহিনীর কাজে আসতেন, সেনা কর্তৃপক্ষই ওঁর যাওয়া-আসার খরচ বহন করত। তখন ওঁদের বেতনও কম ছিল। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর বেতন ছিল সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা। এই সময় হঠাৎ একদিন তিনি বিকেল চারটার দিকে বাসায় এসে হাজির। আমি বললাম, তুমি কোথা থেকে আসছ?

হুদা আমার কথায় উত্তর না দিয়ে বললেন, 'জিনিসপত্র সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেলো।'

আমি অবাক হয়ে তাঁকে বললাম, কী বলো!

তারপর বিছানায় শুয়ে হুদা বললেন, 'আমার বোধ হয় আর চাকরি নাই। শেখ সাহেব আমাদের ডেকেছেন। আজকেই আমাদের চাকরি থেকে বের করে দেবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারণটা কী?

হুদা বললেন, 'বরিশালে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর [পরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ (১৯৯৬-২০০১)] বাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে। তাতে করে নাকি আওয়ামী লীগারদের ছোট করা হয়েছে।'

তারপর সন্ধ্যাবেলা হুদা আর এম এ মঞ্জুর (তখন তিনি কর্নেল) গেলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে গণভবনে। আমি বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকলাম। আমাদের জীবনে তো কিছুদিন পর পরই বিপদ আসে। সেদিন অনেক রাতে তিনি ফিরে এলেন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, বঙ্গবন্ধু তাঁদের কাছ থেকে সব শুনেছেন। শুনে বলেছেন, আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের সবাই তাঁদের ওপর ক্ষিপ্ত। বঙ্গবন্ধু হুদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন তুই তল্লাশি করেছিলি?'

হুদা তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার ওপর নির্দেশ ছিল বলেই আমি করেছি।'

শুনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তোর ওপর যদি নির্দেশ থাকত যে আমার ছেলে কামালের ঘরে অস্ত্র আছে, তাহলেও কি তুই ওকে গ্রেপ্তার করতি?'

হুদা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সেনা-পোশাক পরে থাকলে অবশ্যই তা করতাম।'

তখন নাকি বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, ‘আমি তোদের মতোই সোনার ছেলে চাই। এই রকম ছেলে চাই। যা, যে কাজ করছিলি, ওই কাজই কর।’

শেখ সাহেব তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিদায় দিয়েছেন। হুদা এসব কথা আমাকে বললেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর হুদা কুমিল্লায় বদলি হলেন। হুদা কুমিল্লায় আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা টিলার ওপরে একটা বাড়িতে থাকতাম।

কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরে টিলার ওপরকার ওই বাড়িটা অসম্ভব সুন্দর ছিল। ওই বাড়িতে স্বাধীনতার পর প্রথমে জিয়াউর রহমান, তারপর কর্নেল আবু তাহের ও নূরুল ইসলাম শিশু (পরে মেজর জেনারেল) থেকেছেন। হুদাকে কুমিল্লায় বদলি করা হলো, কারণ ওখানে মিলিটারি একাডেমি হবে, অস্থায়ী ভিত্তিতে। হুদা একাডেমির প্রথম অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন।

জিয়াউর রহমান একাডেমি পরিদর্শন করতে মাঝেমধ্যেই কুমিল্লায় আসতেন। তিনি তখন ব্রিগেডিয়ার এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান। জিয়াউর রহমান কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কেন জানি তিনি হুদা আর আমাকে বেশ পছন্দ করতেন। হুদা তখন মিলিটারি একাডেমি করা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আর আমি ব্যস্ত ফুলের গাছ লাগানো আর বাগান করার কাজে। বাগান করতে আমি খুবই ভালোবাসতাম। জিয়াউর রহমান এসে একবার বলেছিলেন, ‘এই বাড়িতে তাহের থেকে গেছে, শিশু থেকে গেছে, আমি থেকে গেছি; কিন্তু পাহাড়ের টিলার ওপর যে এত ফুল ফোটে! তা আমার জানা ছিল না।’ জিয়া আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখছিলেন আর বলছিলেন, ‘এত ফুল আপনি কী করে করলেন! ফুলের বীজ পেলেন কোথা থেকে?’

বললাম, ‘বীজ আমি ঢাকা থেকে এনেছি। আজকাল নাকি বীজ আমদানিও করা হচ্ছে। আমি পরীক্ষামূলকভাবে লাগিয়েছি।’

তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘ইউ হ্যাভ এ গ্রোন ফিঙ্গার।’ উনি সাধারণত ইংরেজিতেই কথা বলতেন। আগের কথাগুলোও তিনি ইংরেজিতেই বলেছিলেন।

সেদিন কয়েকজন নিচের সারির সেনা কর্মকর্তা তখন আমাকে এসে বললেন, জিয়াউর রহমান তো সাধারণত কারও সঙ্গে কথা বলেন না। উনি আপনাকে কী জিজ্ঞেস করছিলেন?

আমি বললাম, আমাকে তিনি কী বলেছেন তা আপনাদের বলব কেন?

কৌতুক করেই তাঁদের কথাটা বললাম। তারপর সুর পাল্টে বললাম, না, কেবল বাগান সম্পর্কে উনি জিজ্ঞেস করেছেন।

সেনাবাহিনীর নিচের দিকের কর্মকর্তারা তো বটেই, তাঁর সমসাময়িক কর্মকর্তারাও জিয়াউর রহমানকে বেশ ভয় পেতেন, কিন্তু আমি পেতাম না। সকলেই তাঁকে ভয় পেত এবং সমীহ করে চলত। কিন্তু আমার কাছে তাঁকে খুব সহজ মনে হতো। উনি কুমিল্লায় এলে আমি তাঁকে বলতাম, 'জিয়া ভাই, আইসক্রিম খাবেন?'

তিনি আমাকে বলতেন, 'কুমিল্লায় আপনি কোথা থেকে আইসক্রিম খাওয়াবেন?'

আমি বলতাম, 'আমি যদি খাওয়াতে পারি, তাহলে আপনি আমাকে কী দেবেন?'

জিয়া বলতেন, 'আচ্ছা, খাওয়ান দেখি আগে।'

তারপর মিলিটারি একাডেমিতে 'পাসিং আউট' অর্থাৎ কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হলো হুদার নেতৃত্বেই। এই সময় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ডালিমের (শরিফুল হক ডালিম) চাকরি গেল। সে খবর দু-একজন ছাড়া আর কেউ তখনো পায়নি। ডালিমও জানতে পারেনি। হুদা কীভাবে যেন জেনেছিল। ডালিম তখন কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিল।

ঢাকায় লেডিস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে না কাকে যেন ডালিম মেরেছিল। কারণ ওর বউকে সেই ছেলে নাকি অপমান করেছিল। এখন তো মেয়েরা জিনস পরে। প্যান্ট-শার্ট পরে কেমন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশটা মনে হয় একটা পশ্চিমা দেশ হয়ে গেছে। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। ডালিমের বউ সেদিন ঢাকা ক্লাবে ও রকম পোশাকই পরে গিয়েছিল। সে কারণেই নাকি এ ঘটনা ঘটে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ডালিম কুমিল্লা থেকে ঢাকায় গিয়েছিল।

ডালিমের চাকরি চলে যাওয়ার কথা শুনে হুদা আমাকে বললেন, 'শোনো, ডালিম খুব তো রগচটা।' তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আজকের পাসিং আউট' প্যারেডটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করতে চাই। তুমি ডালিমকে সামলে রাখবে।'

কুমিল্লাতে তখন আওয়ামী লীগের স্থানীয় এমপি ও নেতারা কয়েকজন নানা রকম কাজকারবারও করে বেড়াচ্ছিলেন। শোনা যাচ্ছিল, তাঁদের কেউ কেউ ভারতে পেট্রল, আরও কী কী সব পাঠাচ্ছিলেন কসবা সীমান্ত দিয়ে।

আরও সব কোথায় কোথায় দিয়ে! আমি শুনেছি, ছাত্রজীবনে ডালিম ছিল এনএসএফের কর্মী। সেই সময় অস্ত্র উদ্ধার এবং চোরাচালান রোধের নামে ডালিম কুমিল্লা আওয়ামী লীগের লোকদের ইচ্ছামতো নির্যাতন বা হেনস্তা করেন। এসব কারণেও তাঁর চাকরি যেতে পারে।

যা-ই হোক, সেদিন ডালিমকে আমরা সামলে রাখলাম। সে বুঝতে পারল না যে তাঁর চাকরি চলে গেছে। পাসিং আউট প্যারেড ভালোভাবেই শেষ হলো। পরদিন হুদা গাড়ি নিয়ে ঢাকায় গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি আমাকে আর সেনা কর্মকর্তা আনোয়ারকে (পরে মেজর জেনারেল) বলে গেলেন, 'তোমরা ডালিমের সঙ্গে তাসটাস খেলে, ঘুরে বেড়িয়ে, বাইরে গিয়ে সময় কাটাও। ওকে জানতে দিয়ো না যে কী হয়েছে। সেনানিবাসের এক্সচেঞ্জ অপারেটরদের আমি বলে দিয়েছি, কেউ ওকে ফোন করলে বা ও কাউকে ফোনে চাইলে তারা যেন সংযোগ না দেয়। ডালিম যেন তাঁর চাকরি হারানোর কথা জানতে না পারে সে জন্যই এই ব্যবস্থা।' এ কথা বলে হুদা ঢাকায় গেলেন।

তারপর হুদা ঢাকায় যাওয়ার পর আমি ইচ্ছা করেই ডালিমের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ থাকলাম, যাতে সে বুঝতে না পারে, তাঁর চাকরি চলে গেছে।

এদিকে কুমিল্লায় যাওয়ার পর থেকেই আমি লক্ষ করেছি জিয়া, এম এ মঞ্জুর কুমিল্লা সেনানিবাসে এলে শহরে কার কাছে যেন যান। তাঁরা কোথায় যান, কার কাছে যান, সে কথা আমি সেদিন ডালিমের কাছে জানতে চাইলাম। সে বলল, 'ভাবি, ওনারা একজনের কাছে যান, আমি জানি। আনব তাঁকে? তাঁর নাম মনোরঞ্জন বাবু। তিনি একজন তান্ত্রিক, আবার সাধনা ঔষধালয়ের কবিরাজও। তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু আমি কখনো তাঁর কাছে যাইনি। তাঁরই কাছে স্যার (জিয়া) যান, মঞ্জুর স্যারও দিল্লি থেকে এলেই যান।' এম এ মঞ্জুর তখন ব্রিগেডিয়ার, সেই সময় দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে সামরিক অ্যাটাশে হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আমি অনুরোধের সুরে ডালিমকে বললাম, তাঁকে আনো না ডালিম, দেখি কী হয়! কেন জানি সেদিন আমারও বেশ কৌতূহল হলো ওই তান্ত্রিকের ব্যাপারে।

সেদিন আসলে আমি কাজ দিয়ে ডালিমকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম। ওই তান্ত্রিককে ডালিম আমার কাছে যে সত্যি সত্যি নিয়ে আসবে, তা ভাবিনি। আমার কথায় সেদিন ডালিম তাঁকে নিয়ে এল। ডালিম তাঁকে নিয়ে আসায় আমি তো খুব অবাক। আমি ভেবেছিলাম, উনি হয়তো আসবেন না। কারণ ওনার কাছেই জিয়া-মঞ্জুর যান।

তারপর ভাবলাম, নিয়ে যখন এসেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবুর সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে ঠিক করলাম, আমরা সবাই তাঁকে হাত দেখাই। আমার অনুরোধে মনোরঞ্জন বাবু সবার হাতের রেখা দেখলেন। ডালিমের হাত দেখে তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবু বললেন, 'বাবা, আপনার তো সরকারি চাকরি নাই।'

এই কথাটা কিন্তু ডালিম তখনো জানে না, জানি কেবল আমি, আনোয়ার আর হারুন (হারুন-অর-রশীদ, পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান)। মনোরঞ্জন বাবুকে এ সম্পর্কে আমরাও কেউ কিছু বলিনি। এই ঘটনা আজও আমার আশ্চর্য লাগে।

তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবু ডালিমকে লক্ষ করে আরও বললেন, 'আপনি এমন একটা কাজ করবেন, তাতে করে সারা দেশের মানুষ আপনার নাম জানবে।' আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক এ কথাই তিনি বলেছিলেন। এটা আমি বানিয়ে লিখছি না। একদম সত্যি। আর আমার হাত দেখে বলেছিলেন, 'হুদা সাহেব অনেক দূরে চলে যাবেন। আপনি থাকবেন। আপনি বাচ্চাদের দেখবেন।'

আমি তাঁকে বললাম, হুদা দূরে যাবে, মানেটা কী? সে সময় হুদার স্টাফ কলেজ কোর্সে কানাডায় যাওয়ার কথাবার্তা চলছিল। ভাবলাম, উনি হয়তো সেটার কথাই বলছেন। আমি তাঁকে বললাম, ও যে স্টাফ কলেজ কোর্সে কানাডায় যাবে, সেখানে আমাকে নেবে না?

উনি তখন মুখটা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর নিচুস্বরে বললেন, 'না, আপনি থাকবেন। আপনি বাচ্চাদের দেখবেন। হুদা সাহেব অনেক দূরে চলে যাবেন।'

আর ডালিমকে আবার বললেন, 'আপনার চাকরি নাই। আর আপনি এমন একটা কাজ করবেন, যার ফলে বাংলাদেশের সব লোক আপনার নাম জানবে।'

তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবু যখন ডালিমকে বললেন, আপনার চাকরি নাই, তখন আমি চমকে উঠলাম। মনে মনে ভাবছি, ডালিম এখন না জানি কী করে বসে! কিন্তু ডালিম চুপচাপ তাঁর কথা শুনল। একদম কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। তারপর যখন তান্ত্রিক বললেন, আপনি এমন একটা কাজ করবেন, যার ফলে বাংলাদেশের সব লোক আপনার নাম জানবে। তখন ডালিম শুধু বলল, আমি আবার কী করব! সে সময় ডালিম একেবারে শান্ত এবং ভাবলেশহীনই থাকল। এটা কিন্তু তার চরিত্রের একেবারে বাইরে ছিল।

সেই তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবু মারা গেছেন ১৪-১৫ বছর আগে।

তাঁকে গাড়ি পাঠিয়ে আনা হয়েছিল। সেদিন তিনি খুব বিষণ্ন মনে বসে ছিলেন। তিনি আমাকে আবার বললেন, 'আপনাদের উত্তরে যেতে হবে।' আমি বললাম, মোটেই না। আমরা এখানে তিন বছর থাকব। মাত্র এক বছর হয়েছে আমরা এখানে এসেছি। এখন কেন আমরা উত্তরে যাব? এখানে আমাদের কেবল এক বছর হয়েছে, আরও দু-বছর থাকব।

উনি আমাকে আর কিছু বললেন না। হাসলেনও না। তারপর তিনি চলে গেলেন। ওনার কথায় আমিও তেমন গুরুত্ব দিলাম না।

ওদিকে হুদা তো সেবার ঢাকা থেকে ফিরে এলেন। এসেই আমাকে বললেন, তিনি সফিউল্লাহ এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের কনভিন্স করতে পারেননি। হুদা ঢাকায় সেনা সদর দপ্তরে গিয়ে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লার সঙ্গে দেখা করেন ডালিমের ব্যাপারে কথা বলার জন্য। সফিউল্লাহ তাঁকে বলেন, এটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তো বটেই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরও সিদ্ধান্ত। সে জন্য আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারব না।

তারপর হুদা কুমিল্লায় ফিরে আসা মাত্র ডালিম তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে কি না, সেটা সে হুদার কাছে জানতে চায়। তান্ত্রিক তাঁকে বলেছে তাঁর চাকরি নাই, সে কথাও ডালিম হুদাকে জানায়। তখন হুদা ডালিমকে জানায়, সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

হুদার কাছ থেকে জানার পর ডালিম কিছুটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেল। তারপর সে ঢাকায় চলে যায়। আর কুমিল্লায় ফিরে এল না। ওর স্ত্রী তখন ঢাকায় ছিল। ওর বাড়িটা খালি পড়ে থাকল। পরে ডালিমের এক আত্মীয় ওদের জিনিসপত্র নিতে এল। একজন সেনা কর্মকর্তা সেই সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সবকিছুর তালিকা করা হয়। তারপর ডালিমের ওই আত্মীয় ওদের সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে ট্রাকে তুলে ঢাকায় নিয়ে গেল। ডালিম আমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করত, আমার স্বামীকেও। কিন্তু সে কী কাণ্ডটা না করল ১৯৭৫ সালে! একটা বাচ্চাকেও ওরা রেহাই দিল না!

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার কয়েক দিন পর তান্ত্রিক মনোরঞ্জন বাবুর কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ঘটনায় আমি একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকের সেই কথা মনে পড়েনি। যখন কথাটা মনে পড়ল তখন ভাবলাম, সত্যি সত্যি ডালিম এমন কাজ করল, যার ফলে বাংলাদেশের মানুষ তাঁর নাম জানল। এরপর আমার

মনেও বেশ ভয় ঢুকল। মনে পড়ল তান্ত্রিক তো আমাদের ব্যাপারেও কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা উত্তরে আসব, সেটা তো সত্যিই ঘটেছে। আর বলেছিলেন, হুদা দূরে কোথায় যাবেন। এই দূরে বলতে যে তিনি পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে একেবারেই চলে যাবেন, সেটা তো তখন আমি বুঝিনি।

১৯৭৪ সালের জুন মাসের শেষ দিকে অস্ত্র উদ্ধার আর লেডিস ক্লাবে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলেকে ডালিমের মারধর করার ঘটনায় হুদাকে উত্তরবঙ্গে বদলি করা হলো। এটা বোধ হয় শাস্তিমূলক বদলি ছিল। তা ছাড়া ওখানে নকশাল দমনেরও একটা ব্যাপার ছিল। শাফায়াত জামিলের জায়গায় হুদাকে ওখানে ফরমেশন অধিনায়ক করে পাঠানো হলো। তারপর তো আমরা রংপুরে চলে গেলাম। ওখানেই থাকলাম। রংপুরেও পেলাম ডাকবাংলোর মতো একটা বড় বাড়ি। ওখানে বাগান করি, থাকি। হুদা কাজে চলে যান। রংপুরে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে আমি কয়েক জায়গায় গিয়েছিলাম। আমার দেখা হয়েছে রাজশাহী। মখ্‌দুম শাহের মাজার। একেবারে বাংলাবান্ধা থেকে শুরু করে উত্তরের অনেক জায়গা তখন দেখেছি।

হুদার বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুর খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন সরকারি চাকরি করতেন। তিনি একসময় পঞ্চগড়ে ছিলেন। সেই পঞ্চগড়েও আমরা গিয়েছি। সেখানে আমার শ্বশুরের যেখানে দপ্তর ছিল, সেখানে আমরা গিয়েছি। সেখানে তখনো তাঁর নাম লেখা দেখেছি। এখনো আছে কি না জানি না। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী—এই এলাকাটা তখন আমি হুদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

হুদা তাঁর কাজ করে চলেছেন; বিশেষ করে, অস্ত্র উদ্ধারের কাজ। একজন মানুষকেও খুন-জখম না করেই। ওদের প্রচেষ্টায় তখন উত্তরবঙ্গে নকশালদেরও দমন করা হলো।

ওই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একবার নাটোরে আসেন। নাটোরের উত্তরা গণভবনে মন্ত্রিপরিষদের একটা সভা না কী যেন হয়েছিল—আমার ঠিক মনে পড়ছে না। সারা দিন তিনি ওখানেই ছিলেন। সেবার আমি আমার দুই বাচ্চাসহ ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন পরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হলো। সেখানে দুপুরে সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা ছিল। নাটোরের উত্তরা গণভবনের বিশাল লেকের মতো পুকুরে ছিল প্রচুর মাছ। বঙ্গবন্ধু নাকি বলে দিয়েছিলেন, 'যতজন আসবে তাদের সবাই ওই মাছ খেয়ে যাবে। ডাল-ভাত-মাছ খেয়ে যাবে।'

আমাকে দেখে তিনি চিনলেন। আমি তো খুব অবাক যে আমাকে তিনি মনে রেখেছেন। আমি এটা ভাবতেই পারিনি। উনি আমাকে বললেন, 'মহারাজার বাড়িটা দেখেছিস?'

আমি বললাম, 'না।'

উনি বললেন, 'ভালো করে দেখ। এত সুন্দর বাড়িতে ওনারা কেমন করে থেকেছেন।'

তারপর ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখলাম। রাজা-মহারাজাদের ব্যবহার করা পুরোনো আসবাব দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। এত সুন্দর সুন্দর জিনিস ফেলে ভারত ভাগ হওয়ায় তাঁরা নাটোর থেকে কলকাতায় চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগ জিনিসই এখানে রেখে গিয়েছিলেন। নাটোরের মহারাজার খাটটা এতটাই উঁচু ছিল যে তাতে উঠতে হতো কাঠের সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে। সিঁড়িটা খাটের সঙ্গে লাগানোই ছিল।

বঙ্গবন্ধু আসলেই ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ। সেদিন পরে ওখানে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মহারাজার খাটটাতে আমি শুই না। আমি হলাম দেশের সাধারণ মানুষ! আমি এখানে এলে এই বারান্দাতেই থাকি।' বঙ্গবন্ধু মহারাজার বেডরুমের পাশের একটা ঘরে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই ঘরটা ছিল একটা বারান্দার মতো। আমি খুব অবাক হলাম এই ভেবে যে তিনি দেশের এত বড় নেতা, আল্লাহ তাঁকে এত বড় জায়গায় নিয়েছেন, অথচ উনি কত সাধারণ! বারান্দাটাতে ছিল একটা কাউচ, ওটাতে বসে উনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন আর টানছিলেন তাঁর চিরাচরিত সেই পাইপ। আমি, হুদা আর কে কে যেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আজ আর সে কথা মনে পড়ছে না। তবে হুদার ৭২ ব্রিগেডের দু-চারজন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন এবং রাজশাহীর ১০ বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন, সে কথা বেশ মনে আছে। ১০ বেঙ্গলের তখনকার অধিনায়কের নামটা আমি এখন আর মনে করতে পারছি না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বসে আমরা এবং অন্য সবাই মিলে দুপুরের খাবারটা খেয়েছি। আহারপর্বের পর আমরা ওপরেই থাকলাম আর বঙ্গবন্ধু হুদা ও অন্যদের সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেদিনই বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে যান।

এই একটা দিন বঙ্গবন্ধুকে আমি আবার খুবই কাছ থেকে দেখেছিলাম। আরও কয়েকবার কাছ থেকে দেখেছি তাঁকে। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে আমার মনে হয়েছে, এই রকম একজন লোককে মানুষ হত্যা করে কী

করে? মারতে পারল কী করে? কেন মারল? কার স্বার্থে মারল—এটা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারি না।

এরপর তো আমার স্বামীকেও মেরে ফেলল। অনেকে হুদা আর খালেদ মোশাররফের দোষ ধরে। জাসদের ওরা সিপাহি বিপ্লব করে ওদেরকে চিহ্নিত করল ভারতের দালাল বলে। বঙ্গবন্ধুকে যখন মেরে ফেলল তখন আমি হুদাকে বলেছিলাম, দেখো, আমার ভালো লাগছে না। চলো, আমরা ভারতে চলে যাই। উনি তখন বলেছিলেন, 'ভারতে যাব কেন? ভারতও আমাদের বাঁচতে দেবে না।'

আমি বলেছিলাম, কেন?

তখন হুদা বলেছিলেন, 'কোনো দেশ স্বাধীন হলে, সেই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ বাঁচতে দেয় না। ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়ে রাখার নজির কম। আমাদের তারা বাঁচতে দেবে না।'

আমি বললাম, তাহলে আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় থাকব? তোমার তো কিছুই নেই। আমাদের তো মাথা গোঁজার জন্য টিনের একটা ঘরও নেই।

তখন তিনি হাত উঁচু করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে কোনো কিছুই করে দিয়ে যেতে পারব না। তারপর ইংরেজিতে বলেছিলেন, 'ইটস হি উইল ডু।' এ কথা বলে আঙুল উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তারপর আবার ইংরেজিতে বললেন, 'হি উইল গিভ ইউ দ্য শেল্টার। হি উইল লুক আফটার ইউ।'

হুদার এই কথায় আমি খুব অস্থির হয়ে পড়লাম। ওকে বললাম, আগরতলা মামলার সময় আমি আমার ভাইদের সঙ্গে ছিলাম, এখন যদি তোমাকে মেরে ফেলে! তুমি কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িয়ো না।

বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার পর বঙ্গভবন তখন রশিদ-ফারুকদের দখলে, তখন প্রায়ই ঢাকা থেকে ফ্লাইং ক্লাবের ছোট বিমান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ছোট বিমান রংপুরে আসত। সেই বিমানে হুদাকে ঢাকায় যেতে হতো। ঢাকায় যে কাজে যেতেন, সে কাজ শেষে সন্ধ্যার দিকে রংপুরে ফিরে আসতেন। সেই সময় তাঁকে খুব অন্য রকম লাগত। সারাক্ষণ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলতেন না। মাঝেমধ্যে শুধু স্বগতোক্তির মতো করে আমার সামনে বলতেন, 'এর প্রতিশোধ নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।'

হুদা ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিলেন কর্নেল জামিলকে মেরে ফেলাতেও। বারবার আমাকে বলতেন, 'আর একজন সহজ-সরল মানুষকে ওরা মারল!'

কর্নেল জামিল আবার সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর। তাঁর সঙ্গেও আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। হুদা আমাকে কয়েকবার বলেছেন, 'এই যে খুনিরা অবোধ বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাইকে মারল, দেশটাকে কয়েকটা জানোয়ার জিম্মি করে রেখেছে, বঙ্গভবনে বসে যা খুশি তা-ই করছে আর আমাদের সেনাবাহিনী তার কিছুই করতে পারছে না। এরা দেশ স্বাধীন করলেও কিছুই করতে পারছে না!' এই সবকিছু নিয়ে তিনি সে সময় খুবই অস্থির থাকতেন। ভালো করে কোনো কথাই বলতে পারতেন না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেও না। তারপর তো একের পর এক ঘটতে থাকল, আরও অনেক ঘটনা।

কুমিল্লা থেকে রংপুর এবং কালো পঁচাত্তর

আমরা প্রায় এক বছর চার মাস রংপুরে ছিলাম। অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। পনেরোই আগস্টের আগ পর্যন্ত বেশ ভালোই ছিলাম। যখন তেমন কোনো কাজ থাকত না তখন মাঝে মাঝে হুদা শিকারে যেতেন। তিনি শিকার করতে ভালোবাসতেন। গাড়ি চালাতে চালাতে হুদা কখনো ১০ মাইল, কখনো ২০ মাইল দূরে চলে যেতেন। ১৯৭৫ সালের শুরুতে একবার এভাবে তিনি বগুড়ায় চলে গেলেন। তখন বোধ হয় শীতকাল। সেদিন শনিবার হওয়ায় তিনি বললেন, 'আজ এখানেই থাকব। কাল তো রোববার, ছুটির দিন। কাল যাব।' বগুড়ায় আমরা সার্কিট হাউসে উঠলাম।

বগুড়ার সার্কিট হাউসে গিয়ে দেখি, ওখানে ডালিম। তাকে ওখানে দেখে খুবই অবাক হওয়ার পালা আমাদের। ডালিমও হুদাকে দেখে একটু হকচকিত হলো। হুদা ডালিমকে বললেন, 'তুমি হঠাৎ এখানে? কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

হুদার প্রশ্নের জবাবে ডালিম বলল, 'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' সে আর কিছুই বলল না। রাতে আমরা একসঙ্গে খেলাম। রাতে আমাকে হুদা বললেন, তাঁর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছে—ডালিম এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! এইটুকুই শুধু বললেন। পরদিন আমরা রংপুরে ফিরে এলাম। ডালিমের তখন চাকরি নেই। চাকরিতে নেই অথচ সার্কিট হাউসে কেন সে—এ নিয়ে হুদার চিন্তার শেষ নেই। ডালিম সার্কিট হাউসে আছে, কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—এ চিন্তাই সেদিন ঘিরে ধরল তাঁকে। বগুড়া থেকে রংপুরে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি কয়েকবার কথাটা

আমাকে বললেন। রংপুরে গিয়ে তিনি এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেছেন কি না বা তার পরের ঘটনা সম্পর্কে আমি আর কিছু জানি না।

আরেকটা কথা, যেটা আগে লিখতে ভুলে গিয়েছি। ১৯৭১ সালে যশোর মুক্ত হওয়ার পর ফারুক (মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, বঙ্গবন্ধুর খুনি) যখন হুদার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়, তখন থেকেই হুদা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'ফারুক যদি পালিয়েই আসে, তাহলে তাঁর সঙ্গে এত জিনিসপত্র কেন?'

ফারুক দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু আগে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো একটা দেশ থেকে প্রথম কলকাতায় আসে। হুদা আমাকে বলতেন, ফারুক একটা বিতর্কিত চরিত্রের। তাঁর কথাবার্তা থেকে শুরু করে হাবভাব সবকিছুই হুদার কাছে অদ্ভুত লাগত। হুদা আমাকে বলতেন, 'দেখ, মঞ্জুর (এম এ মঞ্জুর, পরে মেজর জেনারেল) ভাই দুই বাচ্চাসহ পালিয়ে এসেছে। কিন্তু সে এসেছে এক কাপড়ে। কোনো কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসেনি। পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে তারাই এসেছে এভাবে।' আর ফারুক সঙ্গে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। এই কারণেই তার ব্যাপারে হুদার সন্দেহ হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁর সন্দেহটাই সত্যি হলো। সে পাকিস্তানি এজেন্ট ছিল কি না আমি জানি না, তবে এজেন্ট ছিল কারও, কোনো না কোনো দেশের।

যা-ই হোক, ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের আগ পর্যন্ত ভালোই দিন কেটে গেল আমাদের। তারপর বঙ্গবন্ধুকে যেদিন হত্যা করা হলো সেদিন হুদা রংপুরে। ১৪ আগস্ট রাতে একটা ডিনার ছিল ১৫ বেঙ্গলের। আমরা সেই ডিনারে গেলাম। গানবাজনা হলো। সেখানে সেনা কর্মকর্তা (পরে সেনাপ্রধান) হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী গান গেয়েছিলেন। তখন বোধ হয় হারুন ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমার এখনো মনে আছে, 'নুরজাহান, নূরজাহান' বলে একটা বাংলা গান, আরও কী কী গান যেন গেয়েছিলেন হারুনের স্ত্রী।

এসবই ছিল ১৪ আগস্ট রাতের ঘটনা। ১৫ আগস্ট সকালে হুদা অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় রংপুর সিএমএইচের একজন ডাক্তার, তাঁর নাম সবুর, তখন কী পদে ছিলেন জানি না। পরে কর্নেল হয়ে অবসর নেন। তিনি হুদার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনিই হুদাকে ফোন করে বললেন, 'স্যার, এখনই রেডিও খুলুন। রেডিও খুলে শুনুন, ব্যাপারটা কী।'

আমাদের একটা রেডিওগ্রাম ছিল। সেটা আমার মেজো ভাশুর বিয়ের পর আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ঢাকার বাসার সব লুট হয়ে গিয়েছিল। ওটা আমি আমার ভাইয়ের বাসায় রেখে গিয়েছিলাম।

তাঁর বাসায় লুটপাট হয়নি। স্বাধীনতার পর তিনি ওটা আমাকে ফেরত দেন। সেই রেডিওগ্রামের নব ঘোরাতেই শোনা গেল ডালিমের গলা। ডালিম বলছে, 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' তখন পর্যন্ত তাঁকে যে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে, এ কথা বলেনি। শুধু শেখ মুজিবের কথা বলেছে।

এ কথা শোনার পর বাজ পড়লে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, হুদার তখন সেই অবস্থা। তিনি একেবারে হতবাক। আমিও হতবাক। আমরা দুজনই একেবারে হতবাক। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না—দুজনের কেউ কোনো কথা বলতে পারছি না। হুদা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য হুদা হতবিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে ঢাকায় ফোন করলেন—সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহকে। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর কাছ থেকে তিনি সব শুনলেন। তারপর তিনি ফোন করলেন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে।

সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ আর সিজিএস খালেদ মোশাররফ, তাঁরা দুজন যা বলছিলেন, হুদা টেপরেকর্ডারে তা টেপ করছিলেন। ওই টেপটা হুদা আমাকে দিয়েছিলেন। সেটা আমাদের বাসাতেই ছিল। ৯ নভেম্বর যখন আমি ঢাকায় আসি, তখন লে. কর্নেল জাফর ইমামের কাছে সেই টেপটা দিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম ঢাকায় যাচ্ছি, ওখানে কি-না-কি হয়, আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায়! সেই সময় জাফর ইমামও ভয়ে তাঁর বাড়িতে থাকেনি। ফলে তাঁর ওখান থেকে সেগুলো বেহাত হয়ে গিয়েছিল। এটা আমি পরে জানতে পারি। যখন জানলাম তখন খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

আমি সেদিন হুদার কথা শুনেছি। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ কী বললেন তা শুনতে পাইনি। হুদা সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে আপনি ট্রুপস মুভ করান।' সেনাপ্রধান কী বললেন জানি না। কারণ আমি তো আর ওপাশের কথা শুনছি না। তারপর হুদা ফোন রেখে দিলেন। ফোন রেখে একটা মন্তব্য করলেন। সেটা বলা ঠিক হবে কি না জানি না। আমি তো এখন কোনো কিছুকে ভয় পাই না। কাকে আমার ভয়? হুদা আমাকে বললেন, 'সফিউল্লাহ একটা কাপুরুষ।' হাজার সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে হলেও এটা তাঁর থামানো উচিত ছিল। যাঁরা ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধরা উচিত ছিল। ভীষণ আফসোস করতে লাগলেন তিনি। তারপর যখন শুনলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে মারা হয়েছে, জামিলকেও মারা হয়েছে, তখন তাঁর নাওয়াখাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তিন-তিনটা দিন একেবারে পাগলের মতো ছিলেন

তিনি। এই সময় কয়েকবার স্বগতোক্তির মতো করে তিনি আমাকে বললেন, 'খুনিরা আমাদেরকেও বাঁচতে দেবে না।'

সেটা শুনে আমি তাঁকে বলি, তোমাদের কী দোষ? তোমাদের বাঁচতে দেবে না কেন?

তখন তিনি বললেন, 'যারা দেশ স্বাধীন করে তাদেরকে কেউ বাঁচতে দেয় না। তুমি ইতিহাস পড়ে দেখবে, তাদের কেউ বাঁচে না।'

তাঁর এই কথায় আমি তাঁকে বললাম, চলো, আমরা ভারতে চলে যাই। দিনাজপুর-রংপুর দিয়ে তো ভারত অনেক কাছে। চলো, আমরা বাংলাবান্ধা দিয়ে চলে যাই।

'আমার কথা শুনে তিনি বললেন, সীমান্ত অতিক্রম করতে গেলে বিএসএফ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলবে। বলবে যে, একবার তোমাদের জায়গা দিয়েছি, আবার কেন? তারাও বাঁচিয়ে রাখবে না আমাদের।'

আমি এবার বলি, তোমার কিছু করার কোনো দরকার নেই।

আমি সে সময় যখন-তখন অঝোরে কেঁদেছি।

১৫ আগস্টের পর রংপুর সেনানিবাসের যে পরিবেশ হয়েছিল, সেটা উল্লেখ করার মতোই ঘটনা। একদিন একজন সেনা কর্মকর্তা আমাকে উদ্দেশ করে বলছিলেন, 'সাপ মারলে সাপের বাচ্চাকেও রাখতে হয় না।' তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক! সেই সময়ই টের পেলাম, সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক সেনা কর্মকর্তা শেখ মুজিববিরোধী। সৈনিকদের মধ্যেও দেখি একই অবস্থা। এর আগে এদের এই মনোভাবটা কিন্তু তেমন বোঝা যায়নি। সেনাবাহিনীর যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাঁদের কারও কারও ভেতরেও দেখি একই রকম প্রতিক্রিয়া। এই অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর যাঁরা সেনা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন, তাঁরা কোনো মন্তব্য করছিলেন না।

১৫ আগস্টের পর থেকে প্রায় দিনই সেনা কর্মকর্তারা দল বেঁধে আমাদের বাসায় আসত। তারা এসে নানা আলাপ-আলোচনা করত। একদিন আমি যাঁরা মুজিববিরোধী তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম। হুদা তখন আমার কাছে একটা ছোট্ট চিরকুট পাঠালেন। হুদা আমাকে যে চিরকুট পাঠিয়েছিল তাতে লেখা ছিল, 'কেবল শুনে যাও। কারও সঙ্গে কোনো তর্কে যাবে না। কে কী বলছে, কেবল শুনে যাও।' আলোচনাটা সেদিন আমাদের খাবার ঘরে আর বসার ঘরে বসে হচ্ছিল। অনেক সেনা কর্মকর্তাই সেদিন এসেছিল। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদেরও অনেকে এসেছিল। এত দিন যারা খুব 'মুজিব' 'মুজিব' করেছে, দেখি তারাই এখন মুজিবের বিরুদ্ধে কথা বলছে।

বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পর সেনা কর্মকর্তা হান্নান শাহ [পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে (২০০১-২০০৬) মন্ত্রী]—তখন তিনি রংপুরে, সেই সময় তাঁর কী পদবি ছিল, আমার মনে নেই—৬ বেঙ্গলে ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর অধীনস্থ এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে একটা মিছিল বের করেন ১৫ আগস্টের সমর্থনে। শোনা গেল, মেজর বজলুল হুদাও ঢাকায় মিছিল করেছেন তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার আনন্দে, যেটা একেবারে সামরিক বাহিনীর রীতির বাইরে। এটা করলে কোর্ট মার্শাল হয়।

সেই সময় তো কেউ কিছু করতে পারছে না। বঙ্গভবন খুনিদের দখলে। তখন প্রায় দিনই থেকে থেকে ডালিম, শাহারিয়ার (সুলতান শাহারিয়ার রশিদ খান) রংপুর সেনানিবাসে ফোন করছে। এদের সবাই, অদৃষ্ট বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলি, কুমিল্লাতে হুদার সঙ্গে কর্মরত ছিল। সৈয়দ ফারুক রহমান, খন্দকার আব্দুর রশিদ, বজলুল হুদা, শরিফুল হক ডালিম, আজিজ পাশা—এদের সবাই কুমিল্লায় কর্মরত ছিল। শুধু নূর (মেজর এম এইচ এমবি নূর চৌধুরী) কুমিল্লায় ছিল না। বঙ্গভবন থেকে ফারুক হুদার কাছে ফোন করে খুব বাহাদুরি করেছে। ভাব দেখিয়েছে, যেন দেশ উদ্ধার করেছে। হুদা কেবল তাঁদের সব কথা শুনে যান আর টেপ করেন। আর মাঝেমধ্যে ঢাকায় যান-আসেন। এসে বলেন, ঢাকায় কেউ কিছু করছে না।

এর মধ্যে একদিন শুনলাম, ডালিম একদিন বনানীতে আমার মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদার বাড়িতেও গিয়েছিল রাতের দিকে। ওখানে গিয়ে নাকি সে কিছুটা দম্ভ ভাব নিয়ে আমার মেজো ভাশুরের সঙ্গে কথা বলেছে। খুব বাহাদুরির কাজ করেছে, দেশ উদ্ধার করেছে, ভালো কাজ করেছে—এ রকমভাবে কথা বলেছে। আমি এই সব কথাবার্তার সম্যক সাক্ষী ছিলাম না। এসব আমার মেজো ভাশুরের কাছ থেকে শোনা। আমার মেজো ভাশুর নাকি তখন ডালিমকে বলেছিল, 'তোমরা এরকম একটা খারাপ কাজ কী করে করতে পারলা!'

ডালিম শেখ সাহেবের সহধর্মিণীকে 'মা' বলত—আমি নিজের কানে এটা শুনেছি। রেহানারা ওকে 'ভাইয়া' বলত—এও আমার নিজের কানে শোনা। ডালিমের বউ নিম্মিকে ওরা 'ভাবি' বলত। ডালিম কুমিল্লাতে যখন ছিল, তখন ওরা কুমিল্লায় বেড়াতে এসে ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

হুদাও ডালিমকে একবার বলেছিল, 'যারা তোমাকে ভাইয়া বলে, তোমার বউকে ভাবি বলে, না-হয় তোমার চাকরি খেয়েছিল; কিন্তু তুমি কীভাবে

বাচ্চাদের মারলে!' তখন নাকি ডালিম বলেছিল, 'আমি ওখানে (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে) ছিলাম না।'

হুদা আমাকে বলেছিল, ডালিমকে সেদিন ওই কথা বলার পর ও নাকি অঝোরে কেঁদেছিল। তারপর বলেছিল, 'স্যার, আমি জানতাম না যে, মেরে ফেলা হবে। আমাকে বলা হয়েছিল শুধু শেখ মুজিবকে আটক করবে। আটক করে নিয়ে যাবে। এইভাবে যে রাসেলকেও মেরে ফেলবে, তা আমার ধারণাতেও ছিল না।' তখন হুদা ওকে বলেছে, 'তুমি তো এর থেকে জীবনেও বের হয়ে আসতে পারবে না। তুমি এর সঙ্গে জড়িত। তুমি এই হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে মুক্তি পাবে না।'

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ডালিম আর তাঁর স্ত্রী কোনো বিয়ে বা জন্মদিনজাতীয় কোনো একটা অনুষ্ঠানে ছিল। সেখান থেকে রশিদরা ওকে ডেকে নেয়। ফারুক-রশিদ জানত যে, ডালিম বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। আর ডালিমের খুব হুজুগে পড়ার অভ্যাস ছিল। তখন ওর অল্প বয়স, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে। তা ছাড়া ওর স্ত্রীকে অপমান করেছে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে। ওর ভেতরে একটা ক্ষোভ ছিল। ও বোধ হয় এভাবেই জড়িত হয়ে যায়।

তারপর দিন যেতে লাগল। হুদা এরপর থেকে প্রায়ই ঢাকায় যায় এবং ফিরে আসে। সেনা সদর দপ্তরের ওপর সে তখন ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত। হুদা আমাকে কয়েকবার বলল, নূরুজ্জামান থাকলে হয়তো সে এটা প্রতিরোধের চেষ্টা করত। মানে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পরিচালক নূরুজ্জামান। তিনি সে সময় লন্ডনে ছিলেন। এর মধ্যে সফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে নতুন সেনাপ্রধান করা হলো।

রংপুরে হুদা যাঁদের বিশ্বাস করতেন, তাঁরা হলেন জাফর ইমাম (পরে লে. কর্নেল) ও ক্যাপ্টেন হারুন-অর-রশীদ (পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান)। ওঁদের কাছে এখন জিজ্ঞেস করে জানা যাবে, হুদার মনের অবস্থা তখন কেমন ছিল। ওঁরাও তখন খুব বিপর্যস্ত ছিলেন। জাফর ইমাম যে খুব খুশি ছিলেন, তা আমি বলব না। পরে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন, সেটা ভিন্ন কথা। বেশির ভাগ সেনা কর্মকর্তা একেবারে চুপ, একেবারেই চুপ করে ছিলেন তাঁরা। কেবল হান্নান শাহ এবং আরও কয়েকজন বাদে। সেই সময় জাফর ইমাম কয়েকবার হুদার কাছে এসেছেন। তিনি হুদার খুব ভক্ত ছিলেন।

যা-ই হোক, ২৬ অক্টোবরেও হুদা ঢাকায় গিয়েছিলেন। ওই দিনই সেখান থেকে ফিরে এলেন। সেদিন আবার একটা ঘটনা ঘটে। প্রবীণ

সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক, তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন। উনি জাফর ইমামের স্ত্রী নয়নের চাচাতো বা মামাতো ভাই বা এই ধরনের কিছু একটা হতেন। ওবায়েদ-উল হক সাহেব রংপুরে এসেছিলেন। সেদিন আমাদের রংপুরের বাড়িতে বসে উনি এবং আরও কয়েকজন তাস খেলছিলেন। হেড অব দ্য টেবিলে হুদা বসেছিলেন, ডান দিকে সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক। তার বিপরীত দিকে বসেছিলাম আমি। অন্যরা টেবিলের বিভিন্ন প্রান্তে। খেলার এক ফাঁকে সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক হঠাৎ কেন জানি হুদার হাত দেখতে চাইলেন। হুদা ওঁর হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উনি হুদার হাত দেখে বললেন, 'হুদা ভাই, আপনি আগ্নেয়াস্ত্রে হাত দেবেন না, কোনো ইলেকট্রিক সুইচ দিয়ে বাতি জ্বালাবেন না, সব রকম ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম এবং আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আপনি দূরে থাকবেন। আর যদি পারেন, তাহলে একটা রক্তমুখী নীলার আংটি পরবেন।'

তখন হুদা আমার দিকে ইশারা করে বললেন, 'আছে, তার কাছে তো অনেক কিছু থাকে।'

আমি বললাম, না, আমি নীলা কোথায় পাব! নীলাকে আমার খুব ভয় লাগে।

তখন ওবায়েদ-উল হক সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি পারেন, ওনাকে একটা পরিয়ে দেবেন।'

তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, আপনি কেন বলছেন নীলার আংটি পরতে?

উনি বললেন, 'আমি সংগত কারণেই বলছি। ওটা পরে ফেললেই ভালো হয়।'

তারপর ৩০ অক্টোবর তারিখে ঢাকায় হুদাদের একটা কনফারেন্স ছিল। সে দিন ফ্লাইং ক্লাবের একটা ছোট বিমান রংপুরে এল। হুদা ওই বিমানে ঢাকায় গেল। আবার সেই দিনই ফিরে এল।

এরপর এল নভেম্বরের ১ তারিখ। সেদিন আমরা দুজন একসঙ্গে শেষ কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। সেদিনও একটা ডিনার ছিল রাতের বেলা। কার বাড়িতে দাওয়াত ছিল সেটা আমার মনে নেই। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের কোনো এক কর্মকর্তার বাড়ি ছিল সেটা। ওখানে গিয়ে হুদা তো কোনো কথাই বলেন না। আমি ওকে বলি, 'তুমি একটু স্বাভাবিক হও। সবাই কী মনে করবে, বলো তো?'

রাতে বাসায় ফিরে আসার পর উনি আমাকে বললেন, 'কালকে ২ নভেম্বর ঢাকা থেকে উজ্জ্বল আর আবু ভাই আসবে।' আবু মানে ওঁর মেজো ভাই। আমার মেজো ভাশুর খন্দকার কামরুল হুদা। উজ্জ্বল হলেন অভিনেতা, চলচ্চিত্র অভিনেতা। উনি বললেন, 'তারা আসবে সৈয়দপুরে। সেখানে একটা গানের অনুষ্ঠান আছে। বিকেলে ওরা আসবে, রাতে ওরা এখানে খাবে।'

অভিনেতা উজ্জ্বল আসবেন বলে আমি তো মহা খুশি। পরদিন রাতে ওনারা এলেন। আমি দেখলাম, আবু ভাই হুদার সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছেন। তাঁরা দুজন যখন কথা বলছিলেন তখন হুদাকে বেশ খুশি হতে দেখলাম। একসময় আবু ভাই বললেন, 'এত দিন পরে তাহলে কিছু একটা হতে যাচ্ছে!' আমি তাঁর এই কথার অর্থ বুঝলাম না।

তারপর রাতে উজ্জ্বল আর আবু ভাই খেয়েদেয়ে সৈয়দপুরে চলে গেলেন। আর হুদাকে সারা রাত বেশ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটাতে দেখলাম। সে শুধু সিগারেট খাচ্ছে আর পায়চারি করছে। সকালে শুনলাম যে, জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেছেন।

হুদা আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন যে ঢাকায় সেনা সদরে যে সভা বা বৈঠক হতো, তাতে কেউ মুখ খুলতেন না, একমাত্র (পরে মেজর জেনারেল) দস্তগীর ছাড়া। এটা আমার হুদার কাছ থেকে শোনা। তিনি নাকি একবার এই রকম একটা সভায় বলেছিলেন, এই যে সেনাবাহিনীর কয়েকজন লে. কর্নেল, মেজর আর ক্যাপ্টেন মিলে দেশকে হাইজ্যাক করে রেখেছে, এদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেনা কর্মকর্তা দস্তগীর সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াকে বলেছিলেন, 'কেন আপনি ব্যবস্থা নেন না। এ রকমটা চলতে পারে না। সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙে গেছে। একে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আপনি ব্যবস্থা নিন।'

তারপর জিয়া যখন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না দেখা গেল, তখন সেনা কর্মকর্তা কর্নেল শাফায়াত জামিল, মেজর হাফিজসহ (পরে বিএনপি নেতা) ঢাকার সেনা সদর দপ্তরে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই মিলে ২ নভেম্বর গভীর রাতে, তখন অবশ্য সময় অনুসারে ৩ তারিখ, সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করেন। তাঁরা কিছু সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে জিয়ার বাড়ি ঘিরে রাখেন।

৩ নভেম্বর সকালে আমি শুনেছি, হুদার সঙ্গে শাফায়াত জামিল, খালেদ মোশারফের কথা হচ্ছে জিয়ার জীবনহানির মতো ঘটনা কেউ যেন না

ঘটান, তাই নিয়ে। কোনো রকম নির্যাতনজাতীয় কিছু যেন না করা হয় তাঁকে। হুদার টেলিফোনের লাইন চালু ছিল। তাই তিনি যোগাযোগ করতে পারছিলেন। তিনি বলছিলেন, জিয়াকে যেন সসম্মানে রাখা হয়। আমরা কিন্তু তখন জেলহত্যার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানি না। সেদিন হুদা রংপুরেই ছিলেন। নানা ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটল। ৪ নভেম্বর সকালে ফোন এল ঢাকা থেকে। সভায় যোগ দিতে ঢাকায় যেতে হবে। সবাই ফোন করছে।

এই সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা না বললেই নয়। যখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অনুগত সৈন্যরা বঙ্গভবন ঘিরে ফেলেছে, তখন ফারুক না রশিদ—তাঁদের যেকোনো একজন ফোন করে হুদাকে। পরে আমি শুনেছি, খন্দকার মোশতাকই তাদের হুদাকে ফোন করতে বলেন। যা-ই হোক, তাদের কেউ একজন হুদাকে ফোন করে বলে, এরা (খালেদের অনুগত বাহিনী) বঙ্গভবনের ওপর বিমান চক্কর দিচ্ছে। চারদিক ঘিরেও রেখেছে। তুমি কিছু একটা করো। মোশতাক জানত যে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে হুদার সম্পর্ক খুব ভালো। তাঁদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। আমার মেজো ভাশুর কামরুল হুদার স্ত্রী পপি ভাবি খালেদ মোশাররফের স্ত্রী আপন বোন ছিলেন। খালেদ মোশাররফের স্ত্রীর ডাকনাম রুবী।

খুনি ফারুক-রশিদ ও মোশতাকের তখন প্রাণের ভয় এসে গেছে। খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে ট্যাংক এনেছে, বিমান ওড়াচ্ছে। খন্দকার মোশতাকও বোধ হয় ফোনে হুদার সঙ্গে একবার কথা বললেন। হুদাকে সেদিন তির্যক ও বক্র হাসি হাসতে দেখলাম। হেসে বললেন, সেদিন নিরীহ বাচ্চাদের তুমি মেরেছ। আর আজকে নিজের প্রাণের এত ভয়! এটা ৩ নভেম্বরের কথা।

৪ নভেম্বর হুদা ঢাকায় গেলেন। শাফায়াত জামিল, মেজর হায়দার সবাই রংপুরে ফোন করলেন। ফোন করে হুদাকে বললেন, তুমি শিগগিরই ঢাকায় চলে এসো।

সে সময় আমরা দুজনই খুব সংশয়ের মধ্যে আছি। রংপুরে থাকার ফলে ঢাকায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শাফায়াত জামিল ফোন করার পর আমি ওকে বললাম, তুমি যেয়ো না। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে যেতেই হবে। হুদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে সেদিনই ফিরে আসবেন। বলেছিলেন, 'আমি সকালে যাচ্ছি, বিকেলেই চলে আসব। আমাকে ঢাকাতে থাকতে হবে না। আমি চলে আসব।'

সেদিন হুদার সঙ্গে জাফর ইমামও ঢাকায় গেলেন। আমি রংপুরেই থেকে গেলাম। আমার শাশুড়িও তখন আমাদের সঙ্গে রংপুরে ছিলেন। ৪ তারিখে, আমার মনে আছে, রংপুর সেনানিবাসের যে বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেই বাড়ির বসার ঘর আর খাবার ঘরের মাঝখানে যে বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হুদা আদর করলেন। মেয়েকেও কোলে নিয়ে আদর করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। ছোট একটা বিমান অবতরণক্ষেত্র ছিল ওই বাড়ির অদূরেই। ওখানে ছোট ছোট বিমান ওঠানামা করত। সেই বিমান অবতরণক্ষেত্র এখন আছে কি না জানি না। সেনানিবাসের ওই বাড়ি থেকে বিমান অবতরণক্ষেত্র দেখা যেত। গাড়িতে করে হুদা বিমানের কাছে গেলেন। প্লেনটা যখন উড়ে গেল, দূরে মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। তখন কেন জানি আমার মনে হলো, আর কখনো আমার সঙ্গে হুদার দেখা হবে না। এ কথা ভেবে আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। আমার শাশুড়ি আমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে বললেন, 'তুমি এমন করে কাঁদছ কেন? এমন করে কাঁদতে নেই। চোখের পানি—ওটা খুব খারাপ। তুমি আর কেঁদো না। কান্না বন্ধ করো। আল্লাহর কাছে দোয়া চাও।'

তারপর ৪ তারিখ গেল।

৫ তারিখে দেখি জাফর ইমাম রংপুরে ফিরে এসেছেন। আমি বললাম, 'তুমি আসলা, তোমার হুদা ভাই কই?'

জাফর ইমাম বলল, 'হুদা ভাই আজকে আসেননি, কালকে আসবেন। হুদা ভাইয়ের কিছু কাপড় রেডি করে দেন। তিনি তো এক কাপড়ে গেছেন। সেনা পোশাক পরে গেছেন।' তারপর আমি সেনা পোশাক ও অন্যান্য কিছু কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিলাম। সঙ্গে জুতা আর চপ্পলও দিয়ে দিলাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়ার পর জাফর ইমাম ওগুলো নিয়ে চলে গেল।

জাফর ইমাম চলে যাওয়ার পর থেকে কেন যেন ভাবছি, এগুলো তিনি পাবেন, না পাবেন না। কী হচ্ছে ঢাকায়। তাঁর সঙ্গে আমার কোনোই যোগাযোগ নেই। এবার ঢাকায় গিয়ে তিনি একটা ফোনও করেননি। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি।

পরদিন ৬ নভেম্বর। জাফর ইমাম বলেছিল তিনি ৬ তারিখে আসবেন। কিন্তু ৬ তারিখ পার হয়ে গেল। সে দিনও তিনি এলেন না। এর মধ্যে জেল হত্যাকাণ্ডের কথা আমি শুনেছি। ভাবলাম, জাতীয় চার নেতাকে মেরে ফেলা হয়েছে। হয়তো সে জন্যই তাঁর দেরি হচ্ছে। ৭ নভেম্বর সকালে তিনি অবশ্যই ফিরবেন—আমি এ রকমই জাফর ইমামের কাছ থেকে শুনলাম।

৬ তারিখ বিকেলে আমি বাগান থেকে ফুল তুলে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ভাবলাম, পরদিন তাঁর সঙ্গে অনেকেই হয়তো দেখা করতে আসবেন। তাই ঘর সাজালাম। লোকজন আসবেন বলে একটু খাবারও রেডি করলাম। হুদা চিংড়ি মাছ খেতে ভালোবাসতেন। একজন আমাকে একটু চিংড়ি মাছ দিয়েছিল, সেটা অল্প রান্না করে রাখলাম। আর রাতের বেলা শোবার সময় ভাবলাম, হুদাকে নিয়ে বিমান হয়তো সকালে আসবে। শোবার আগে টেলিফোন অপারেটরকে বলে রাখলাম, আপনি আমাকে সকাল সকাল টেলিফোন করে জাগিয়ে দেবেন। ঘুম ভাঙানোর জন্য আমাকে কল দেবেন।

পরদিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর আমার যখন ঘুম ভাঙল, তখন আটটা সাড়ে আটটা বেজে গেছে। দেখি, বাসায় সবকিছুই স্বাভাবিক। ভাবলাম, তাহলে কি হুদা এসে সরাসরি অফিসে চলে গেলেন। বাসায় এলে তো উনি আমাকে অবশ্যই ডাকতেন।

আগের দিন মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, বিমান অবতরণক্ষেত্র থেকে হুদাকে আনার জন্য আমিই গাড়ি পাঠাব। তাই টেলিফোন অপারেটরকে রাতে আমি বলে রেখেছিলাম। টেলিফোন অপারেটর আমাকে ফোন না করায় আমি ফোন করে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে আপনি জাগাননি কেন? আমি ওনার জন্য গাড়ি পাঠাতাম! তখন অপারেটর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ম্যাডাম, একটা খারাপ খবর আছে।'

আমি বললাম, কী খবর?

তিনি বললেন, 'ঢাকায় তো আবার পাল্টা অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। এই পাল্টা অভ্যুত্থান খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে। জিয়া সাহেব, জেনারেল জিয়া আবার বের হয়ে গেছেন।'

খালেদ মোশাররফ এবং তাঁদের হুদা স্যাররা যে নিহত হয়েছেন, ততক্ষণে তাঁরা সেটা জেনে গেছেন; কিন্তু আমাকে সেটা বললেন না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আপনাদের স্যার কোথায়?

তাঁরা বললেন, 'স্যারের তো কোনো খবর নেই। সম্ভবত ওনারা কোনো গুপ্ত স্থানে চলে গেছেন। ঢাকায় সিপাহি বিপ্লব হয়েছে, সে কারণে হয়তো তাঁরা আত্মগোপন করেছেন।'

এসব শুনেটুনে ঘটনা আসলে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য যে-কারও কাছে ফোন বা যোগাযোগ করব তা আমার মনে পড়েনি। আমি পাগলের মতো বসে কাঁদতে লাগলাম। আমার শাশুড়ি এসে বললেন, কী হয়েছে? আমি তাঁকে যা শুনেছি তা বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, 'তুমি এভাবে কেঁদো না। এভাবে কাঁদতে হয় না। কখনো এইভাবে কাঁদবে না। যা হয় হবে। সেটাই গ্রহণ করবে।'

তারপর বেলা ১১টার দিকে আমাদের বাসায় মুনিব আর জাফর ইমাম এলেন। তখন মুনিব কাঁদছিলেন। মুনিব (মুনিবুর রহমান) আর মিজান (মিজানুর রহমান), দুই ভাই। ওরা দুই ভাই-ই সেনাবাহিনীতে ছিল। পরে মেজর পদ থেকে অবসর নেয়। ওরা দুজনই মুক্তিযোদ্ধা ছিল। মুনিব অঝোরে কাঁদছিলেন। আর জাফর ইমাম আমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। মুনিব কোনো কথা বলতে পারল না। জাফর ইমাম আমাকে শুধু বলল যে, 'ঢাকাতে তো সিপাহি বিপ্লব হয়ে গেছে। আপনার তো এখানে থাকা ঠিক না। কখন যে এখানেও এই বিপ্লব শুরু হয়ে যায়, তার ঠিক নেই। ঢাকায় অনেক সেনা কর্মকর্তাদের ওপর হামলা হয়েছে। আপনি সন্ধ্যার দিকে, ঠিক মাগরিবের সময় তৈরি থাকবেন। আপনি বাচ্চা দুটো আর খালাম্মাকে নিয়ে শহরে কারও বাড়িতে থাকবেন। তারপর কী হয়, দেখা যাবে। এখানে থাকা যাবে না।'

আমি জাফর ইমামকে বললাম, 'সিপাহি বিপ্লব মানে!' এই ব্যাপারটা তখন আমি অতটা বুঝিনি। তারপর জাফর ইমামকে বললাম, 'কেন আমাদের বাসা ছেড়ে যেতে হবে!'

সে আমার ওই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল বলল, একেবারে প্রয়োজনীয় অল্প কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।'

আমি একটা ছোট ব্যাগে করে কিছু কাপড় নিলাম। তারপর সেনা কর্মকর্তা সাবিউদ্দিনের (পরে ব্রিগেডিয়ার ও রাষ্ট্রদূত) বাবার বাসায় গিয়ে উঠলাম। অল্প কিছুদিন আগে তিনি আমেরিকায় মারা গিয়েছেন। তিনি হুদার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা একই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সাবিউদ্দিনের বাবা-মা আবার আমার বাবা-মারও বহু পুরোনো পরিচিতজন। তাঁর ওখানেই তখন আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো।

আমি বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি, ওখানে আরও অনেক সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীরাও আছেন। তাঁরা ছাড়াও আছেন আরও অনেকে। ওদের ওখানে দেখে তো আমি একেবারে অবাক। তাঁরা এখানে কেন আমি ভেবে কূল পেলাম না।

একটু পর আমি ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলাম। সিপাহি বিপ্লবের কারণে সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। সৈনিকেরা কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। তাঁরা সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারদের ওপর আক্রমণ করছে। এখানেও এটা যেকোনো সময় শুরু হতে পারে। তাই সবাই এই নিরাপদ স্থানে চলে এসেছে।

আমাদের দেখে তাঁরা সবাই চোখ বড় বড় করে তাকালেন। কিন্তু তাঁরা কেউ আমার চোখে চোখ ফেলছেন না। দেখলাম, কয়েকজন কাঁদছেন। অন্যদিকে আমি যেন কিছুই হয়নি—এমন একটা ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছি। হুদা আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'আমি কোনো দিন কোনো অন্যায় কাজ করিনি। সব সময় মাথা উঁচু করে থাকবে। কখনো কারও কাছে মাথা নোয়াবে না।'

এই তিনটা কথা আমি আজও মেনে চলি। ওখানে উপস্থিত সবাই আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, আবার আমি ওঁদের স্বামীদের অধিনায়কের স্ত্রী, ওখানে আমি কান্নাকাটি করব কীভাবে? আমি তাঁদের সামনে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে চলছে তোলপাড়। আমি যখন নামাজের সেজদায় যাচ্ছি, তখন বলছি, আল্লাহ আমাকে একটা কোনো আলো দেখাও। কিন্তু চারদিকে কেবল অন্ধকার দেখি। আলোর কোনো রেখা দেখি না।

৭ তারিখ সারা রাত এভাবে গেল। ৮ তারিখও গেল, দেখি কোনো খবর নেই। ৯ তারিখে জাফর ইমাম, হারুন আর নাসিররা এল। এসেই বলল, 'এখন বাসায় চলেন। ঢাকা থেকে একটা বিমান আসবে। আপনাকে ঢাকা যেতে হবে। হুদা স্যার ওখানে বন্দী।'

এরপর আমি বাসায় এলাম। আমার শাশুড়ি কিন্তু বাসাতেই ছিলেন। তিনি সাবিউদ্দিনের বাবার বাসায় যাননি। তখন তিনি বলেছেন, 'না, আমার ছেলে যদি ঘুরে আসে, খালি বাড়ি পাবে।' জাফর ইমামদের তিনি বলেছিলেন, 'তুমি বউ আর বাচ্চাদের নিয়ে যাও। আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে কেউ কিছু বলবে না। আমি এই বাড়িতেই থাকব।'

৯ তারিখে বাসায় এসে শাশুড়িকে বললাম, 'আম্মা, আমাদের ঢাকায় যেতে হবে। ওঁকে নাকি বন্দী করেছে।'

আমার কথা শুনে উনি কোনো কথা বললেন না। হাত তুলে শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলেন। আমাকে জাফর ইমামরা বলল খুব অল্প জিনিস সঙ্গে নিতে। মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের ব্যক্তিগত জিনিস বলতে তেমন কিছু ছিল না। কিছু কাচের জিনিসপত্র ছিল, তাও এর-ওর দেওয়া। আর ছিল প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়চোপড়। তখন টাকাপয়সা নেই—কী দিয়ে জিনিসপত্র কিনব? আমাদের অল্প যে জিনিসপত্র ছিল—সবকিছু একটা ঘরে ভরলাম। হারুন ইতিমধ্যে আমার চিঠিপত্র, কাগজপত্র গুছিয়ে ফাইলবদ্ধ করে আমার সঙ্গে দিয়েছিল। ওইরকম একটা অসহ ও অরাজক অবস্থায় হারুন (পরবর্তীতে

সেনাপ্রধান) আমার সেই মল্যবান চিঠিপত্র ও সামগ্রীগুলো গুছিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল বলে আজ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁকে এবং জাফর ইমামসহ অন্যদেরও স্মরণ করছি। আমার গয়নাগাঁটি একটা ব্যাগে ভরে সাবিউদ্দিন ভাইয়ের আম্মাকে দিয়েছিলাম রাখতে। ভেবেছিলাম, ঢাকায় কী হয় না হয়! তবে তখনো আমি 'যেন কিছুই হয়নি' এমন একটা ভাব রক্ষা করে চলেছি। কিন্তু ভেতরে যে আমার কী তুমুল তোলপাড় চলছে, সে আমি কাউকে বোঝাতে পারব না।

আমি হাতে কখনো চুড়ি পরতাম না। খুব একটা গয়নাও পরতাম না। সেদিন যে আমার কী হলো! সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি চুড়ি পরছি, সোনার বালা পরছি, অন্যান্য গয়না পরছি, শাশুড়ির দেওয়া বড় সোনার চেনটা পরছি। তা দেখে জাফর ইমামের বউ মুখ নিচু করে ঝরঝর করে কাঁদছে। সেও আমার সঙ্গে এসেছিল। আমি তাঁকে বললাম, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

আমি আড়াই মাস আগে জুলাইয়ে কলকাতা থেকে সিল্কের যে ভালো শাড়িটা এনেছিলাম, সেটা পরছি। হারুন, জাফর ইমামকে তখন বলতে শুনলাম, 'ভাবি যা পরে আছেন, তা-ই পরে চলেন। গোসল করতে হবে না। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নেন।'

আমি বললাম, 'না, তোমার হুদা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। তোমার হুদা ভাই আমাকে এভাবে দেখলে খুব রাগ করবে।' ওই যে হুদা আমাকে বলত, মাথা উঁচু করে থাকবে, নিজের আবেগ কাউকে দেখাবে না, সে কারণেই আমি বললাম, 'তোমার হুদা ভাই রাগ করবে।'

আমি বাচ্চাদেরও ভালো করে কাপড় পরালাম। দেখি, আমাদের বাসায় হান্নান শাহসহ আরও কয়েকজন এসেছেন। কর্নেল অলি আহমদও তখন রংপুরে ছিলেন। বোধ হয় আগে থেকেই তিনি মুজিববিরোধী ছিলেন। উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন না। আরও কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন—মোহাম্মদ আলী (পরে মেজর। এই পদ থেকে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বরিশালে), তারপর মুনিব অথবা মিজান—এঁদের দুজনের একজন ছিলেন। বোধ হয় মুনিবই ছিলেন। সবার নাম এখন মনে নেই। ওই দিন শেষবার ফ্লাগ হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। হুদার ব্যবহার করা গাড়িতে চড়েই এলাম। ওরা শেষ সম্মানটা দিল আমাকে। গাড়িতে চেপে এয়ারপোর্টে এলাম। সবাই বিদায় জানাল।

একটা ছোট বিমান আমাদের নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি সেই বিমানে উঠলাম। বিমানে ওঠার পর আমি, আমার শাশুড়ি আর আমার দুই বাচ্চা পাশাপাশি বসলাম। যখন বিমানটা ঢাকার কাছাকাছি এসেছে তখন আমি সূরা

ইয়াসিন পড়ছিলাম। সেনাবাহিনীর পুরোনো যে মসজিদটা সিএমএইচের পেছনে আছে, তার মিনারটা যখন দেখা গেল, তখন আমার অন্তর আমাকে বলে দিল, হুদা আর নেই। ও মারা গেছে। ওঁর সঙ্গে আমার আর কখনোই দেখা হবে না। আমি তখন অঝোরে কাঁদতে শুরু করলাম। আর আমার ছেলে, ওর বয়স তখন আট বছর, ও আমার চোখ দুহাত দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'আম্মু কেঁদো না, আম্মু কেঁদো না।'

পরে ও আমাকে বলেছিল যে হান্নান শাহর ছোট ছেলে ওকে রংপুরেই বলেছিল, 'তোমার বাবাকে ঢাকাতে মেরে ফেলেছে।' কিন্তু তখন ও কথাটা বিশ্বাস করেনি। তারপর ঢাকায় এলাম। ঢাকায় এসে, সেনানিবাসের জাহাঙ্গীর গেটের কাছে এখনো যে হ্যাঙ্গারটা আছে, সেখানে বিমানটা এসে থামল। বিমান থেকে যখন সেখানে নামলাম, তখন সেনাবাহিনীর কাউকে সেখানে দেখতে পেলাম না। কেউ নেই। কেবল আমার মেজো ভাই জাকারিয়া, ছোট ভাই হাসান আবদুল্লাহ, সেনা কর্মকর্তা রহমতুল্লাহ আর মুক্তিযোদ্ধা হিডি দাঁড়িয়ে আছে। রহমতুল্লাহ অবশ্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আসেনি। রহমতুল্লা আমাদের পরিচিত। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'রহমতুল্লাহ, তোমার হুদা ভাইয়ের খবর কী?'

রহমতুল্লাহ বলল, 'চলেন, বলব। ভালো আছেন, হুদা ভাই ভালো আছেন।'

আমার দুই ভাই আর হিডি কোনো কথা বলল না, চুপ করে থাকল।

এখানে হিডির কথা একটু না বললেই না। হিডি বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, সে ৮ নম্বর সেক্টরে ছিল। ওর ভালো নাম ইশতিয়াক হোসেন। স্বাধীনতার পর যেদিন আমি মিন্টু ভাইদের সঙ্গে কলকাতা থেকে যশোরে আসি, সেদিন হিডি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সে অসীম সাহসী একজন যুবক। আজও সে আমাদের ভালোবাসে। খোঁজখবর রাখে।

যা-ই হোক, একটু পর ওখানে দুটো গাড়ি এল। আমার বড় ভাই তখন একটা ব্রিটিশ কোম্পানির হয়ে ভারতে কর্মরত। তিনি ঢাকায় ছিলেন না। মেজো ভাইয়ের গাড়ি ছিল না। আমার ছোট ভাই থাকত খুলনায়। ও এসেছে ওর শ্বশুরের একটা গাড়ি নিয়ে। রহমতুল্লাহও এসেছে তাঁর গাড়ি নিয়ে। আমার মেজো ভাই, আমি আর রহমতুল্লাহ একটা গাড়িতে উঠলাম। আর হিডি আমার শাশুড়ি ও বাচ্চাদের নিয়ে আরেকটা গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়িতে উঠে আমি রহমতুল্লাহকে বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

সে কোনো উত্তর দিল না।

এই সময় আমার তখন মনের অবস্থা এমন যে ঠিকভাবে কোনো কিছু চিন্তাও করতে পারছিলাম না। আমি ওকে বললাম, 'গুলশানে বুবুর ওখানে চলো।' মানে আমার দুলাভাই বিচারপতি মোর্শেদের বাড়িতে।

এদিকে ওদের আশাজাগানিয়া কথার পরও আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, হুদা নেই, হুদা বেঁচে নেই। মেজো ভাই জাকারিয়াকে বললাম, দ্যাখ, তুই তো আমার কাছে কোনো দিন কোনো কিছু লুকাস না। সত্যি করে বল তো, তোর গুডু ভাই বেঁচে আছে কি নেই?

তখন ও বলল, 'দ্যাখো, তুমি তো জিজ্ঞেস করছ। তোমাকেই তো মোকাবিলা করতে হবে বাস্তবতাটা। সারা জীবন তোমাকেই মোকাবিলা করতে হবে। তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি। ৭ নভেম্বর ঢাকাতে তথাকথিত যে সিপাহি বিপ্লব হয়, তাতে খালেদ মোশাররফ, হায়দার আর গুডু (কর্নেল হুদা) ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মৃতদেহ এখনো সিএমএইচে আছে জানি। আমি দেখিনি। কিন্তু আমাদের চেনা-জানা অনেকেই দেখে এসেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় মেরেছে? সিএমএইচে?

জাকারিয়া বলল, 'না, শেরেবাংলা নগরে মারা হয়েছে। সেখান থেকে এনে তাঁদের লাশ এখন সিএমএইচে রাখা হয়েছে।'

জাকারিয়া এ কথা বলার পর আমি তখন একটুও কাঁদিনি। শুধু ভাবছি আর ভাবছি, এই খবরটা কী করে আমার ছেলেমেয়ে আর শাশুড়িকে বলব! কীভাবে বলব? কী হতে যাচ্ছে এরপর? তাঁর লাশটা আদৌ পাব কি পাব না—এই রকম একটা ভাবনা আমার মনে তোলপাড় শুরু করে দিল। ওঁর সঙ্গে জীবন শুরু করার পর আগরতলা মামলা থেকে আমার জীবনের বড় একটা শিক্ষা হয়ে গেছে। কোনো কিছুতেই আমি আবেগের বশে ঘাবড়াই না। যা কিছু হয় আমি মোকাবিলা করি।

যা-ই হোক, ওদের সঙ্গে আমি দুলাভাই বিচারপতি মোর্শেদের বাড়িতে গেলাম। বুবু আমার দুই বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলেন; কিন্তু কোনো কথা বললেন না। দেখলাম, আমাদের অল্প কজন আত্মীয় সেখানে উপস্থিত আছেন। তারাও কেউ কিছু বলল না। দুলাভাইয়ের ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একটা কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'ওকে আমি দেখতে পারব না। এই বাড়ি থেকে ও বউ সেজে গেছে, এই বেশে ওকে আমি দেখতে পারব না।'

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি চুপ হয়ে গেলাম। একসময় দুলাভাই শান্ত হলেন। আমিও শান্ত হলাম। বাবার বুকের

মধ্যে গেলে যেমন লাগে, দুলাভাই আমাকে বুকে টেনে নিতেই আমার ঠিক সেই রকম লেগেছিল।

তাঁর মেয়ের চেয়েও বয়সে আমি ছোট। তিনি আমাকে অনেক আদর করতেন। তারপর আমি আমার শাশুড়ির কাছে এলাম। তিনি একটা ঘরে খাটে বসে ছিলেন। ওই ঘরে আমার দুই ছেলেমেয়েও ছিল। তারা তখন লাফাচ্ছে, দুষ্টুমি করছে। আমি ওদেরকে ডেকে বললাম, 'তোমরা এসো। শোনো, দরকারি কথা আছে।'

আমার মেয়েটার বয়স তখন পাঁচের কিছু বেশি। ও কাছে এলে শাশুড়িকে বললাম, আম্মা, আপনাকে একটা কথা বলব। আপনি শুনুন, আপনি এদেরকে দেখবেন। আমি কী করে কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। আম্মা, ও নাই। দুনিয়াতে ও নাই। ৭ তারিখ সকালে হুদা, খালেদ মোশাররফ আর হায়দারকে সেনাবাহিনীর কয়েকজন গুলি করে মেরে ফেলেছে।

শুনে আমার বাচ্চারা তো কাটা মুরগির মতো চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আর আমার শাশুড়ি আমাকে তাঁর বুকে গভীর করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ এর (অর্থাৎ আমার) কী হবে?'

বলে তিনি দুই হাত ওপরে তুলে ধরলেন। আর সমানে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ, আমার নীলুর কী হবে? এই বাচ্চা দুটোর কী হবে? গুডু তোর মনে যদি এ-ই ছিল! তুই যদি দেশটাকেই এত ভালোবাসবি, তাহলে বিয়ে করেছিলি কেন? এদেরকে দুনিয়াতে কষ্ট দেওয়ার জন্য রেখে গেলি কেন?'

অন্য শাশুড়িরা হলে হয়তো বলতেন, 'এই অভাগা মেয়ের জন্য আমার ছেলেটা মরে গেল!' এ ধরনের কথা অবশ্য অনেকেই আমাকে পরবর্তীকালে বলেছে। তারা বলেছে, আমার মতো কুলক্ষণার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলেই হুদা মারা গেছেন! কত রকমের অপ্রীতিকর কথাই না আমি শুনেছি! কিন্তু আমার শাশুড়ি কোনো দিনও এ ধরনের কথা বলেননি। উল্টো তিনি তাঁর ছেলের ওপর রাগ করেছেন। ছেলেকে দোষারোপ করেছেন। বলেছেন, এদেরকে দুনিয়ায় রেখে তুই কেন চলে গেলি?

তারপর আমার ভাইয়েরা দুলাভাই বিচারপতি মোর্শেদকে বলল জেনারেল ওসমানীকে ফোন করতে। জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে দুলাভাই আগে নাকি একবার কথা বলেছিলেন, আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে। জেনারেল ওসমানী দুলাভাইকে বলেছিলেন, আমাকে সড়কপথে ঢাকায় আনা হবে। কিন্তু দুলাভাই তাতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, সড়কপথে এলে পথে ওর

বিপদ হতে পারে। রাস্তাতে কোথাও তাঁকে কেউ মেরে ফেলতে পারে। দুলাভাই আমাকে আনার জন্য বিমান পাঠাতে বলেন। সেনাপ্রধান জিয়া আর জেনারেল ওসমানী কথা দিয়েছিলেন যে আমার জন্য বিমান পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিমান পাঠিয়েছিলেন।

ঢাকায় আসার পর জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কথা বললাম। আমাকে জিয়া বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনি যা চাইবেন, যেভাবে চাইবেন, আপনার জন্য সব করব। শুধু আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'জিয়া ভাই, আপনি থাকতে হুদা মারা গেল কীভাবে? ওকে কে মারল? আপনি থাকতে তো ওকে মারার কথা না।'

তখন জিয়া ইংরেজিতে বললেন, 'হি ওয়াজ মিসগাইডেড উইথ খালেদ মোশাররফ। দ্যাটস হোয়াই হি ওয়াজ কিলড।'

আমি তাঁকে বললাম, 'খালেদ মোশাররফকেই বা মারা হবে কেন? তিনি তো আপনাকে মারেননি। যিনি এক ফোঁটা রক্তও ঝরাননি, তাঁকে কেন মারা হলো? আপনার লোকেরা কেন তাঁকে মারবে?'

আমার এ কথার পর তিনি চুপ থাকলেন। টেলিফোন রিসিভার রেখে দিলেন না।

এরপর জিয়াকে আমি বললাম, হুদার লাশ কখন পাব?

জিয়া বললেন, 'এখন তো রাত হয়ে গেছে। সেনানিবাস, শহর উত্তপ্ত, সৈন্যরাও উত্তপ্ত, এখন তো হবে না। কালকে আপনি আবার আমাকে ফোন করবেন। আমি আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি যেভাবে যা চাইবেন, সেভাবেই সব করে দেব।'

সেদিন আমি তাঁকে একটা অনুরোধ করেছিলাম, যা উনি রাখতে পারেননি। হয়তো ইচ্ছে থাকলেও রাখতে পারেননি। তখন যে পরিবেশ-পরিস্থিতি যাচ্ছিল, সম্ভবত সে কারণেই। আমি একটা জাতীয় পতাকা ওঁর কফিনে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি তাঁর কাছে চাইনি।

৭ নভেম্বরের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল, তারা কিন্তু সেই ঘটনার সব আমাকে বলেছে। তারা বলেছে কারা মেরেছে, কার নির্দেশে মেরেছে। ওই ঘটনার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করে না। কোনো মামলা হয়নি। ওই তিনজন যেন মানুষই ছিলেন না। খালেদ মোশাররফের জন্য যদি বা বলে, হুদা ও হায়দারের জন্য কেউ কিছুই বলে না। দেশমাতৃকার জন্য হুদার অবদান রাখার শুরু মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই। আগরতলার

মামলার তিনি আসামি ছিলেন। দেশদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক মাস তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল চরম মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, রংপুর সেনানিবাসে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর মিলিটারি একাডেমি যখন কুমিল্লায় প্রথম অস্থায়ী ভিত্তিতে হয়, তখন তিনি তার প্রথম অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হায়দার মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। নিয়াজি আর অরোরার মধ্যে ১৬ ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে, হায়দার সেদিন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আসলে এসব কথা কাকে বলব? কার কাছে ক্ষোভ জানাব? কাদের জানাব? কেউ নেই। এসব শোনার কেউ নেই। সবাই নিজের আত্মপ্রচারে মগ্ন। আল্লাহ আছেন ওপরে।

পরদিন সকালে আমি জিয়াকে আবার ফোন করলাম, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হলো। উনি বললেন, 'স্টেশন অধিনায়ক কর্নেল হামিদকে আমি বলে দিয়েছি।' তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'কে যাবে তাঁকে আনতে?'

আমি তাঁকে বললাম, আমার ভাই যাবে, আর বিচারপতি মোর্শেদের ছেলে যাবে।

তখন ওরা দুজনই ছিল খুব কম বয়সী। একজন ২৫-২৬ বছরের, অন্যজনের বয়স হবে হয়তো ২৮। ওরা কর্নেল হামিদের কাছে গেলে ওদের কাগজপত্র দেওয়া হয়।

আমি চেয়েছিলাম, হুদাকে যেন সেনানিবাসের কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু কর্নেল হামিদ (দাবাড়ু রানী হামিদের স্বামী) বললেন, 'যারা সিপাহি বিপ্লবে মারা যায়, তাদের সেনানিবাস কবরস্থানে কবর দেওয়া যায় না।' তিনি সে অনুমতি দিলেন না। যদিও খালেদ মোশাররফকে সেনানিবাসের কবরস্থানেই কবর দেওয়া হয়েছে!

অনুমতি পাওয়ার পর হলো আরেক সমস্যা। হুদার লাশ আনার জন্য কেউ গাড়ি দিতে চায় না। দুলাভাইয়ের বাড়িতে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন। আমার মেজো ভাশুর ঢাকায় থেকেও ভাইয়ের লাশ দেখতে পারেননি। তিনি একদিকে হুদার ভাই, অন্যদিকে খালেদ মোশাররফের স্ত্রীর আপন বোন তাঁর স্ত্রী। খালেদ মোশাররফের প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনিও কিছুটা যুক্ত ছিলেন। এ জন্য তাঁকে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছিল। সে কারণে আসতে পারেননি। বড় ভাশুর খন্দকার নূরুল হুদা বরিশালে ছিলেন। তিনিও সময়মতো ঢাকায় পৌঁছাতে পারেননি। হুদার এক চাচাতো ভাই, আমার

ভাইয়েরা, আর কয়েকজন মহিলা আত্মীয় এসেছিলেন। সবারই তখন প্রাণে ভয়! অথচ আমার দুলাভাইয়ের কী সাহস ছিল চিন্তা করুন! তাঁর বাড়িতে তখন নিজের যুবক বয়সী তিনটা ছেলে। থাক সে কথা।

কেউ তো গাড়ি দিতে চায় না, কোথাও গাড়ি পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে পড়ল, সেনাবাহিনীতে হুদার সমসাময়িক এবং একই ব্যাচের কোরেশী ভাই তো বিডিআরে আছেন। আমার ভাইকে বললাম কোরেশী ভাইকে ফোন করতে। তাঁর পুরো নাম নুসরাত আলী কোরেশী। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হয়ে অবসর নেন। আমার ভাই কোরেশী ভাইকে ফোন করল। ফোন করার পর কোরেশী ভাই আমার ভাইকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। বিডিআরের বাজেয়াপ্ত করা একটি বাস উনি দিলেন। কোরেশী ভাইয়ের কাছে আমি চিরঋণী। গাড়িটা আমার মেজো ভাই চালাল, ওর সঙ্গে আমার ছোট ভাই হাসনাত আবদুল্লাহ আর আমার এক আত্মীয়, সেও সম্পর্কে আমার ভাই হতো, ওরা বাসটা নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে গেল। সিএমএইচে ওরা ঢোকে প্রায় বন্দুকের নলের মুখে। ওখানে ওরা খালেদ মোশাররফের লাশ, হায়দারের লাশ দেখে এসেছে। তাঁদের লাশগুলো মাটিতে স্ট্রেচারে শোয়ানো ছিল। সে সময় ওখানে কেউ ওদের সাহায্য করেনি।

আমার মেজো ভাই এখনো বলে, 'মানুষ মরে গেলে লাশের যে এত ওজন হয়, আগে তা জানা ছিল না। আমাদের দিয়ে এত ওজন বহন করিয়েছিলেন গুডু ভাই!' সে বলে আর হাসে।

সিএমএইচ থেকে হুদার লাশ ওরা গাড়িতে করে দুলাভাইয়ের বাড়ি নিয়ে এল। সে সময় ওদেরও জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কারণ শহরের পরিবেশ তখনো থমথমে। সবকিছু স্বাভাবিক হয়নি। ওই সময় তো আর মোবাইল ফোন ছিল না। অপেক্ষা করে আছি, কখন আসবে, কখন ওরা লাশ নিয়ে আসবে। তারপর একসময় আমার মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, 'আম্মু, আব্বুকে এনেছে। আম্মু, আব্বুর পা দুটো না সাদা!' ও তো লম্বা ছিল খুব। ৫ ফুট ১০-১১ ইঞ্চি লম্বা ছিল। আমি খাটে বসে বসে তখন কোরআন শরিফ পড়ছিলাম। মেয়েকে বললাম, এখানে বসো। ও বারবার বলতে লাগল, 'আম্মু, দেখো না, আব্বুর পা দুটো না সাদা।'

আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখব। এদিকে আমার ছেলে তখন ওর বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতো অঝোরে কাঁদছে। আমার ভাইয়েরা ওকে চেপে ধরে কোলে করে নিয়ে এল। তারপর আমি যেতে চাইলে ভাইয়েরা বলল, 'না, তুমি এখন দেখো না। আগে আমরা গোসল করিয়ে আনি। তারপর দেখো।'

এ কথাটা ওরা বলল এ কারণে যে, তখন ওঁর সারা শরীরে ছোপ ছোপ রক্ত। দেখে আমি যদি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাই!

তারপর ওকে গোসল করানো হলো। আমার এক খালু, তিনি আমার বিয়ের উকিল ছিলেন, আমার বাবা তো আমাদের বিয়ের সময় ছিলেন না, '৬৫ সালের যুদ্ধের কারণে ভারত থেকে আসতে পারেননি। আমার এক খালাতো ভাই, আমার ভাইয়েরা—তারা সবাই মিলে হুদাকে গোসল করায়। গোসল করানোর পর কাফন পরিয়ে যখন নিয়ে আসে, তখন শুনলাম, ওকে সেনা কবরস্থানে কবর দেওয়া হচ্ছে না। দুই হাজার টাকা দিয়ে বনানী কবরস্থানে জায়গা কিনতে হবে। বনানী কবরস্থানে কবর দেওয়ার জন্য ওরা আমার অনুমতি চাইল।

আমি বললাম, হ্যাঁ, দাও। তার আগে আমি একবারই বনানী কবরস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে অল্প কিছুকাল আগে থেকে কবর দেওয়া শুরু হয়েছে। তখন মাত্র দুই কি আড়াই সারি কবর ওখানে। আমার কেমন জানি লাগল! তার আগে একবার গিয়ে দিনের বেলায়ই শেয়াল দেখেছিলাম ওখানে। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদেরও যে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি তখন জানতাম না।

হুদাকে কাফন পরিয়ে বুবুর গাড়িবারান্দায় এনে যখন রাখা হলো, তখন আমি গেলাম। দেখলাম, ও শুয়ে আছে। চোখটা সামান্য একটু খোলা। আমার ছেলে ওঁর ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে আর বলছে, 'আব্বুকে বসিয়ে দাও। তাহলে আব্বু বসবে। আব্বু তো সব দেখছে, দেখছ না তাকিয়ে আছে? আব্বুকে বসিয়ে দাও।' আর আমার মেয়ে এত ভয় পেয়েছিল যে, আমার ভাইয়ের স্ত্রীর কোলে চড়ে ঘাড়ের কাছে মুখ লুকিয়ে রেখেছিল। আমার মেয়ে আজও বলে আর কাঁদে, 'আমি সেদিন কেন এত ভয় পেয়েছিলাম। কেন আব্বুকে দেখিনি। আমি কেন আব্বুকে ভালো করে দেখিনি। আমি কেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

তারপর তো গাড়িতে করে ওঁকে নিয়ে গেল ওরা। তখনো আমি কাঁদিনি। আমি সেদিন রাতেও কাঁদিনি। কেঁদেছি পরের দিন। যেখানে ওকে গোসল করানো হয়েছিল, ওখানে ওঁর শার্টটা রাখা ছিল, সেই শার্ট আর বারান্দায় থাকা রক্ত দেখে, শার্টে লেগে থাকা রক্ত দেখে কেঁদেছিলাম। ওকে বেয়নেট চার্জও করা হয়েছিল। বুকের ঠিক মাঝ বরাবর গুলির দাগ ছিল। গুলি বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল। আজও আমি সেই শার্টটা রেখে দিয়েছি। শার্টটাকে ধুয়েছি, কিন্তু রক্তের দাগটা এখনো আছে।

তারপর তো দিন চলতে লাগল। কবরস্থানে যাই আমি। ওখানে গিয়ে পাগলের মতো কাঁদতাম। সেটা দেখে একজন সাধারণ লোক, কবরস্থানের একজন মালী আমাকে জীবনে একটা শিক্ষা দিলেন। তাতেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি যখনই সময় পেতাম কবরস্থানে চলে যেতাম আর পাগলের মতো কাঁদতাম। ওই মালী আমাকে বলেছিলেন, 'মা, কোটি বছর ধইরা কানলেও সে ফিরব না। কোনো দিনও ফিরব না। কাইন্দা যদি নদী বওয়াইয়্যা দেন, তাহলেও ফিরব না।' তাঁর এই কথায় সেদিন আমি অনুধাবন করলাম, সত্যিই তো, লোকটা তো সত্যি কথাই বলছে! একজন চলে গেলে তো কোনো দিনও ফেরে না। সেদিনই আমার মনের মধ্যে কেন জানি একটা ধাতস্থ ভাব এল। এটা হুদার নিহত হওয়ার মাস দুই-তিনেক পরের কথা।

এ সময় আমার ছেলেমেয়েরা, আমার মেয়ের তো তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স। সবে লিখতে-পড়তে শিখছে। ছবি আঁকত। হয়তো সে একটা কাগজে বিমানের ছবি আঁকল। তারপর সেই ছবিটা কবরের মাটি সরিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখত, যেন সেটা ওর বাবার কাছে পৌঁছে যাবে! চিঠি লিখেও একইভাবে কবরের মাটি চাপা দিয়ে রাখত। ভাবত, ওর বাবা দেখবে এবং পড়বে। ওরা এভাবেই ওদের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করত।

আমার নতুন জীবনযুদ্ধ

তারপর দিন যায়। মাস যায়। নানাজন আমাকে নানা উপদেশ দেয়। সেনাবাহিনীর লোকজনের মধ্য থেকে প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন লে. কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান। পরে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, জিয়া ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে। তিনি তখন বোধ হয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন না। আর দেখা করতে এসেছিলেন মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর। তখন তিনি ব্রিগেডিয়ার। সে সময় তিনি দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। ৭ নভেম্বরের ঘটনার পর উনি প্রথম যেবার ঢাকায় আসেন, সেবার ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে সোজা আমার কাছে চলে এসেছিলেন। দিনক্ষণ এখন আমার মনে নেই। তবে ওই হত্যাকাণ্ডের পরপরই এসেছিলেন। পনেরোই আগস্ট শেখ সাহেব নিহত হওয়ার পর উনি সড়কপথে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। পরে হুদারা মারা যাওয়ার পর একেবারেই ঢাকায় চলে এলেন।

এম এ মঞ্জুর ভাই এসে আমাকে বললেন, 'আপনার হাতে তো কোনো টাকাপয়সা নেই।'

আমি বললাম, রংপুর থেকে আসার সময় জাফর ইমাম আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছেন, ১৫ বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ক্যাপ্টেন হারুন দিয়েছেন এক হাজার টাকা। এই দুই হাজার টাকা নিয়ে আমি ঢাকায় এসেছি।

উনি বললেন, 'এই দুই হাজার টাকা দিয়ে তো আপনার কিছুই হবে না! এই নিন, পাঁচ হাজার টাকা রাখেন।'

হুদাকে বনানী কবরস্থানে কবর দেওয়ার জন্য কবরের জায়গা কেনার টাকা সেদিন আমার কাছে ছিল না। আমার আরেক ভাশুর, তিনি বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং বিমানের পাইলট ছিলেন, ক্যাপ্টেন সাইদ, উনি টাকাটা

দিয়েছিলেন। আমার ভাইয়েরা তো তখন ওঁর মৃতদেহ আনার পাশাপাশি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। টাকাপয়সা খরচ করবে কী!

সেদিন মঞ্জুর ভাই আমাকে বললেন, 'আমি যত দিন বেঁচে থাকব, আমার বাচ্চারা যদি ডাল-ভাত খায়, আপনার বাচ্চারাও খাবে। আমি থাকতে কোনো দিন আপনার কোনো কষ্ট হবে না।' মঞ্জুর ভাই যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন চেষ্টা করেছেন তাঁর কথা রক্ষা করতে।

আর সেনাপ্রধান জিয়া যে বলেছিলেন, উনি আমাকে দেখবেন, উনিও আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। তিনি যখন দেশের রাষ্ট্রপতি, তাঁর দল সংসদে, তখন তিনি আমাকে মনোনীত মহিলা সংসদ সদস্যের কোটায় সাংসদ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু আমি তাঁর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এই বলে চিঠি দিয়েছিলাম যে, 'যত দিন না আমি জানতে পারব যে হুদা কীভাবে মারা গেছে, কেন মারা গেছে, আপনি থাকতেও কী করে সে মরল, তত দিন আমি কিছুই নেব না।' তার পরও একটা প্লট তিনি আমাকে জোর করে দিয়েছেন। বর্তমানে আমি যে বাড়িতে থাকি, সেই জায়গাটা অবশ্য জেনারেল জিয়ার নির্দেশেই পাওয়া।

মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশু তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ছিলেন। শিশুও জানতেন যে আমাদের কিছুই নেই। জেনারেল জিয়া নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'হুদা তো কিছুই রেখে যায়নি। দেখো, নীলু যেন একটা জমি পায়। ওকে যেন ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটিতে (ডিওএইচএস) একটা জায়গা দেওয়া হয়।' মহাখালী ডিওএইচএসে এই জমিটা যখন দেওয়া হয়, তখন নিয়মমতো ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও আমার কাছে ওই পরিমাণ টাকা ছিল না। আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এটা ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে কিংবা ১৯৭৭ সালের কথা। শিশু তখন আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহকে বলেছেন, 'নীলুর মাথা পুরো খারাপ হয়ে আছে। মুরাদ ভাই, আপনি কিংবা আমি টাকাটা দিয়ে দিই।' তারপর আমার বড় ভাই টাকা দিয়ে জমিটা রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে তখন বলেননি। এসব আমি তখন জানতাম না। পরে শুনেছি। জেনারেল জিয়া পরে আমার সঙ্গে অনেকবার দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি আর দেখা করিনি।

শিশুর মতো বন্ধু মানুষের বোধ হয় কম হয়। হুদা এমন একজন মানুষকে আমার পাশে রেখে গিয়েছিলেন, যে আমার শোকে, দুঃখে, আনন্দে, কষ্টে—সবকিছুতে আমার পাশে থেকেছেন। প্রয়োজনে আমাকে বকাও দিয়েছেন।

শিশু যখন বিদেশে গেছেন, তখন নিজের বাচ্চাদের জন্য কিছু না এনে আমার বাচ্চাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। হয়তো শাড়ি এনেছেন তিনখানা। তাঁর স্ত্রীর জন্য এবং হয়তো আমার জন্যও একটা। কিন্তু প্রথম পছন্দ করতে দিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, 'প্রথম তুমি পছন্দ করবা।' তাঁর স্ত্রীও এমনই। ওঁর এত বড় মন! ওঁর স্বামী যে আমার জন্য এত কিছু করছেন, সে জন্য কোনো দিন আমাকে এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত করেননি। শিশু শাড়ি এনে বলেছেন, 'তুমি আগে পছন্দ করে নাও।' ওঁর বউ বলেছেন, 'ভাবি, আপনি আগে পছন্দ করে নেন।' একবার আমাদের বাড়িতে ওঁরা এসে দেখেন, আমাদের ফ্রিজ নেই। তখন ওঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'রান্না করা খাবার বেঁচে গেলে কী করো?'

জবাবে বলেছি, প্রতিদিন যেমতো প্রয়োজন, সেমতো রান্না করি। তারপর খেয়ে নিই।

'তাতে তো তোমার অনেক কষ্ট হয়। বাড়তি খাবারগুলো কী করো?'

'সে রকমভাবে করি না। অল্প অল্প করে করি।'

পরদিন শিশু একজনের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রিজ কেনার জন্য। খুঁটিনাটি সবকিছুর খেয়াল রাখতেন তিনি। সে সময় ১৫ হাজার টাকা দিয়ে একটা ফ্রিজ কিনে দেওয়া সহজ কথা ছিল না।

লে. কর্নেল জাফর ইমামও আমার জন্য অনেক করেছেন। হুদা মারা যাওয়ার পর আমার ছেলের একবার টাইফয়েড হয়েছিল। তখন ওকে কোলে করে তিনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। সে সময় জাফর ইমাম ঢাকায়। আর আমার ভাইদের কথা তো বাদই দিলাম। তাদের সঙ্গেই থাকতাম, খেতাম—সবকিছু চলত তাদের ওপর দিয়ে। কারণ, তখন আমার টাকা নেই, পয়সা নেই, কী করব আমি! একপর্যায়ে আমার মা এলেন কলকাতা থেকে। তিনি এসে আমাকে কিছু টাকা দিলেন।

তারপর আমার দিন চলতে থাকল ভালো-মন্দ মিলে। আমি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাইদের সঙ্গে থাকি। ওরা পড়ালেখা করতে থাকল।

অনেক বছর পর সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক সাহেবের সঙ্গে হঠাৎ আমার আবার দেখা। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কুশল-বিনিময়ের পর তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওবায়েদ ভাই, আপনি আমাকে একটা কথা বলেন, আপনি সেদিন (১৯৭৫ সালের ২৬ অক্টোবর) কী দেখেছিলেন?

উনি বলেছিলেন, 'বোন, আমি মাত্র একঝলক ওর (হুদার) হাত দেখেছিলাম। দেখে বুঝেছিলাম, গুলিতে ওর প্রাণ যাবে।'

আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি কী করে তা বুঝতে পারলেন?

উনি বলেছিলেন, 'হাতের এই শাস্ত্রটা বিরাট একটা শাস্ত্র। যে পারে সে ঠিকই বলতে পারে। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা উল্টো কিছু বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। এই শাস্ত্র আমি কিছুটা জানি।'

আর শেখ সাহেব মারা যাওয়ার আগেভাগে, জুন মাসের দিকে আমার খুব জ্বর হচ্ছিল। সে সময় আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম মা-বাবার কাছে। ছেলেমেয়েরাও গেল। উদ্দেশ্য, ওখানে ডাক্তার দেখাব। হুদারও পরে যাওয়ার কথা। আমি কিছুদিন, অর্থাৎ মাস খানেক থেকে ফিরব। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কিন্তু কলকাতায়ও আমার শরীর ভালো ছিল না। তারপর হুদা কয়েক দিন পর এলেন এবং কলকাতায় কয়েক দিন থাকলেন।

আমার বাবার পরিবারের অনেকে মেদিনীপুরের পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। সে কথা আগে লিখেছি। সেই সূত্রে বিয়ের আগে, মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং তার পরে যখন আমি কলকাতায় গেছি, তখন তাঁর ওখানে গিয়েছি। সেবারও কলকাতায় গিয়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। হুদাও গেলেন। আমরা গেলাম সম্ভবত ২৪ জুন। ওখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হলো। মেদিনীপুরের পীর সাহেব হুদাকে বললেন, 'তুমি একটু সাবধানে থেকো। তোমাদের দেশের অবস্থা তো ভালো না। সাবধানে থেকো।'

আর আমাকে বললেন, 'যা হয় তা খুব ঠান্ডা মাথায় নিতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছা কেউ কখনো খণ্ডন করতে পারে না। যেটা আমার ভাগ্যে লেখা আছে সেটা হবেই। হয়তো অনেক পীর-বুজুর্গানের দোয়ায় কারও হায়াত বাড়ে; কিন্তু যেভাবে মানুষের মৃত্যু লেখা রয়েছে, সেভাবেই তার মৃত্যু হবে।' আমি মনোযোগসহকারে শুনলাম তাঁর কথা। তারপর ফিরে এলাম।

সেবার কলকাতায় গিয়েও আমার জ্বর ভালো হলো না। তাই হুদার সঙ্গে ঢাকায় এলাম। এসে আমরা ঢাকা সেনানিবাসের ভিআইপি রেস্টহাউসে কয়েক দিন ছিলাম। এ সময় সিএমএইচের চিকিৎসক আমাকে দেখছেন। দেখেটেখে চিকিৎসক আমাকে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। তারপর আমরা রংপুরে যাব, এমন সময় হঠাৎ গণভবন থেকে লোক এসে বলল, শেখ সাহেব আমাদের শেখ কামালের বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। দুই দিন দেরি করে আমরা যেন রংপুরে যাই। সে কারণে আমাদের ঢাকায় থেকে যেতে হলো।

তখন আমরা ওই অনুষ্ঠানে গেলাম। ঢাকা সেনানিবাসের ভিআইপি রেস্টহাউসে আমাদের সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা মীর শওকত আলীও (পরে লে.

জেনারেল) ছিলেন। তিনিও ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার দাওয়াত পেয়েছিলেন। যেদিন অনুষ্ঠান, সেদিন আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে বাচ্চাদের রেখে এসেছিলাম। মীর শওকত ও আমরা একই গাড়িতে করে ওই অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম। মীর শওকতের কোথায় যেন একটা রাগ ছিল খালেদ মোশাররফের ওপর। সেটা সেদিন আমি বুঝতে পারলাম। ওই দিন গাড়িতে করে যেতে যেতে তিনি সারাক্ষণ খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। তাঁর এসব কথায় আমি নিজেকে সামলে না রাখতে পেরে মীর শওকত আলীকে বললাম, ভাই, আপনি তাঁর সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলছেন কেন? আমার তো তাঁকে খুব ভালো লাগে। আপনিও একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা, উনিও একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা। আপনি কী করছেন আর উনি কী করছেন, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। আপনি তাঁর সম্পর্কে বিরূপ কথা বলতে পারেন না। অন্তত আমার সামনে বলবেন না। আমি তাঁকে খুব পছন্দ করি। আপনি তাঁকে গাল দেবেন না।

তখন উনি হুদার দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে কিছুটা তির্যক সুরে বললেন, 'শুনছ, শুনছ! তোমার বউ কী বলে?'

তারপর তো ওই অনুষ্ঠানে গেলাম। গণভবনে কামালের বিবাহ-উত্তর সংবর্ধনা। কামালের বউ সুলতানার বাবার বাড়ি ছিল ঢাকার বকশীবাজারে। ওখানে পানির ট্যাংকের পাশেই ওদের বাড়ি। ওখানে আমার বাবারও একটা বাড়ি ছিল। '৬৫ সালের পর আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহর মাধ্যমে তিনি সেই বাড়ি কিনেছিলেন। ওই বাড়িতে আমি মাঝেমধ্যে গেছি। তখন সুলতানাকে দেখেছি। সুলতানা সেদিন অনেক গয়না পরেছিল, সোনার মুকুটও পরেছিল। কিন্তু ওগুলো বেশির ভাগ অন্যদের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পাওয়া। আমার খুব ভালো লেগেছিল। তবে এমন কিছুই ছিল না সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। অবশ্য প্রচুর লোক ছিল। আর বেগম মুজিব সাদা একটা বেনারসি শাড়ি পরেছিলেন। একটা ছোট ঘরে উনি বসে ছিলেন। ওখানে বসেই তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। সুলতানার ডাকনাম বোধ হয় খুকুই ছিল। রেহানাও তখন ছোট। ভাবিনি যে কামাল-সুলতানা এভাবে দিন কয়েক পর মারা যাবে। তারপর ১৭ জুলাই আমরা রংপুরে ফিরে যাই।

পরে শুনেছি, মীর শওকত আলী যেমন খালেদ মোশাররফকে দেখতে পারতেন না, খালেদ মোশাররফও নাকি একইভাবে শওকতকে দেখতে পারতেন না।

যা-ই হোক, ৭ নভেম্বর হুদাদের হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে আরেকটুখানি বলি। সেনা কর্মকর্তা (পরে মেজর) মোক্তাদির, সিরাজুল ইসলাম ও নওয়াজিশ আহমদ ওদের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁরা সবাই দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। মোক্তাদির ব্রিগেডিয়ার মহসিনউদ্দীনের ছোট ভাই। ব্রিগেডিয়ার মহসিন, মোক্তাদির ও নওয়াজিশ আহমদকে জিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথিত অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সেদিনের ঘটনার বিবরণ প্রথম আমি শুনি ক্যাপ্টেন সিরাজের কাছ থেকে। সিরাজ পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীদের বাড়িতে ওরা ভাড়া থাকত। সিরাজ মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও ছিলেন। আমাদের পরিবারের অনেককে সে চিনত। আমরা রংপুরে থাকার সময় হুদা রাজশাহীতে দশম বেঙ্গল পরিদর্শনে গেলে সিরাজ নিজ থেকেই পরিচিত হয়েছিলেন আমার সঙ্গে। সে ৭ নভেম্বরের ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সিরাজ আমাকে সবকিছু সবিস্তারে বলেছিলেন, ওই দিন দশম বেঙ্গলে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে। পরবর্তী সময়ে যখন অন্যদের কাছ থেকে শুনি, সিরাজের বলা প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে তা মিলে যায়। পরে মোক্তাদিরদের কাছ থেকে শুনি, আরও অনেকের কাছ থেকে শুনি—কোন জায়গায় কীভাবে কাকে হত্যা করা হয়েছিল!

সিরাজ একদিন আমার বাবার বকশীবাজারের বাড়িতে বসে আমাকে বলেছিলেন, ৬ নভেম্বর গভীর রাতে হুদা, হায়দার আর খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবন থেকে রাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। একটা গাড়িতে করে তাঁরা বেরিয়ে আসেন বঙ্গভবন থেকে। সেই গাড়ি তখন চালিয়েছে সেনাবাহিনীর এক সৈনিক চালক। ঢাকা মেডিকেলের সামনে বড় যে গাছটা আছে, তার সামনে দিয়ে আজিমপুর হয়ে নিউমার্কেটের সামনে দিয়ে তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন রক্ষীবাহিনীর সেন্টারে। হায়দার সে সময় তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাবেন বলে ছুটিতে ছিলেন। ওই পথটা ধরেই তাঁরা যাচ্ছিলেন। সেখানে যাওয়ার সময় হঠাৎ তাঁরা ধানমন্ডি ৮ নম্বরে রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালকের যে বাড়ি, সেখানে অর্থাৎ নূরুজ্জামানের বাড়িতে নামেন। তখন মধ্যরাত, একটা কি দুইটা বাজে। সময় অনুসারে ৭ নভেম্বর।

ইউসুফ নামের যে ছেলেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল, পরে হুদার সাবসেক্টরে ছিল, সে স্বাধীনতার পর জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে জয়েন করে। ইউসুফ পরে নূরুজ্জামানের দেহরক্ষী হয়। সেদিন সে ওই বাড়িতেই ছিল। ৬ নভেম্বর রাতে ওখানে কী হয়েছিল, তার

একজন বড় প্রত্যক্ষদর্শী ছিল সেও। সে আমাকে বলেছিল, খালেদ স্যারকে তো আমি চিনি না। স্যার (হুদা) এসেছিলেন আর তাঁর সঙ্গে আরও দুজন এসেছিলেন। তাঁরা সবাই সেনাবাহিনীর পোশাকে ছিলেন।

তারপর তাঁরা তিনজনই নূরুজ্জামানের বাসায় এসে বেসামরিক পোশাক পরে নেন। ওখানে এসে তাঁরা কিছু খেতে চান। কিন্তু অত রাতে কী খাবার মিলবে! এমন সময় চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে থাকে। এ সময় আমীর নামের যে সৈনিক তাঁদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বলতে থাকে, 'ক্যু হয়ে গেছে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। এরা পালাচ্ছে। এদের গ্রেপ্তার করো।' তখন ওখানে কর্তব্যরত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ওকে ধমক দেয়।

এদিকে ওখানে থাকা অবস্থায় খালেদ মোশাররফ আবার দশম বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন দশম বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ আহমদ। তিনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। নওয়াজিশকে খালেদ মোশাররফ খুব বিশ্বাস করতেন। দশম বেঙ্গলকে খালেদ মোশাররফই রংপুর থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। খালেদ মোশাররফের খুবই আস্থা ছিল যে, যদি কিছু হয়, তাহলে নওয়াজিশ তাঁকে রক্ষা করবে বা নিরাপত্তা দেবে। নওয়াজিশ তাঁদের দশম বেঙ্গলের সদর দপ্তরে যেতে বলেন।

এরপর তাঁরা গাড়ির চালক অর্থাৎ আমীর নামের ওই সৈনিককে ছেড়ে দেন। তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নেন, হুদা গাড়ি চালাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা তিনজন গাড়িতে করে আবার রওনা হন। যাওয়ার সময় পথে কোনো একটা জায়গায় তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে হুদার হাতে আঘাত লাগে। ধানমন্ডির পুরাতন ২৭ নম্বর সড়কের মোড়ে ফাতেমা নার্সিং হোম নামের তখন একটা ক্লিনিক ছিল। ওখানে নেমে তিনি হাতের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করেন অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। ওখানে থাকা অবস্থায় তাঁরা আবার দশম বেঙ্গলের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা ফাতেমা নার্সিং হোম থেকে দশম বেঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হন।

মানিক মিয়া এভিনিউয়ের পূর্ব প্রান্তে এখন যেখানে টিঅ্যান্ডটি অফিস তার বিপরীতে যে খেজুরবাগানটা আছে, ওখানে তাঁরা পৌঁছলে তাঁদেরকে আটকানো হয়। দশম বেঙ্গলের এক সেনা কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল সৈনিক তাঁদের ওখানে আটকায়। তারপর তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র তারা নিয়ে নেয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা তাঁদের ঘেরাও করে এমপি হোস্টেলে নিয়ে যায়। এটা দশম বেঙ্গলের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাদের মুখ থেকে আমার শোনা। তাঁরা

এখনো বেঁচে আছেন। তাঁদের যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এটা জানা যাবে। তাঁদের যদি সৎ সাহস থাকে, তাহলে তাঁরা বলবেন।

সংসদ ভবনে, এখন যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়, ওখানে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাঁদের দোতলার একটা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। তখন ভোররাত। সকাল হতেই তাঁরা খাবার খেতে চেয়েছিলেন। নাশতা চেয়েছিলেন। তাঁদের সেমাই, বনরুটি আর চা দেওয়া হয়েছিল খেতে। তখন সকাল আটটার বেশি বাজে।

এদিকে নওয়াজিশের সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসের সদর দপ্তরে যোগাযোগ হচ্ছে, দ্বিতীয় আর্টিলারি রেজিমেন্টে অবস্থানরত মেজর জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছে। তখন সেখানে মীর শওকত আলী (পরে লে. জেনারেল, রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী), মইনুল হোসেন চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা), মান্নাফ (পরে মেজর জেনারেল)—তাঁরা ছিলেন। তদন্ত করলেই জানা যাবে আসল ঘটনা। ওই সময়ে দ্বিতীয় আর্টিলারি রেজিমেন্টে অবস্থানরত লে. কর্নেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) আমাকে বলেছিলেন যে, প্রথমে নারায়ণগঞ্জ এলাকার কোনো এক থানা থেকে সেখানে ফোন আসে কর্নেল সাফায়েত জামিলের অবস্থান নিয়ে। প্রায় একই সময়ে কর্নেল নওয়াজিশ জেনারেল জিয়াকে টেলিফোন করে বলেন যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও মেজর হায়দার তাঁর ব্যাটালিয়নে অবস্থান নিয়েছেন। জিয়া নওয়াজিশকে বলেন যে, তাঁদেরকে যেন সুরক্ষিতভাবে রাখা হয় এবং তাঁদেরকে কোনো ধরনের চিন্তা না করতে বলেন। নওয়াজিশ জিয়াকে বলেন, তাঁদের জন্য নাস্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এই সময় সেই কক্ষে অবস্থানরত কর্নেল তাহের বাইরে যান এবং মিনিট ১৫ পর ফেরত আসেন। এর আধ ঘণ্টা পর সেখানে আবার টেলিফোনে খবর এল, নওয়াজিশের ব্যাটালিয়নে বাইরে থেকে কিছু পোশাকধারী এসে খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দারকে গুলি করে হত্যা করে বেয়নেট চার্জ করেছে।

একদিকে তাঁদের ব্যাপারে এসব কথাবার্তা চলছে, অন্যদিকে তখন তাঁদের খাবার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা খাবার নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় এক প্লাটুন সৈন্য সেখানে আসে। তাঁরা তখন খাবারটা মাত্র মুখে দিয়েছেন, ঠিক তখনই অস্ত্রের মুখে তাঁদের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনা হয়। প্রথমে খালেদ মোশাররফ, পরে হায়দার ও হুদাকে। হুদা সে সময় কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। আর খালেদ মোশাররফ খুবই নির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে হুদাকে

বলেন, 'কাম অন হুদা আওয়ার ডেজ আর নাম্বারড।' কারণ তিনি হয়তো বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর বাঁচার আর কোনো আশা নেই। তা ছাড়া চারদিকে তাঁর এত শত্রু! যদিও তিনি জিয়াউর রহমানকে প্রাণে মারা তো দূরের কথা, তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটেননি। তার পরও খালেদকে মরতে হলো। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের আমলে বহুজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সেটা তো আমরা পরে দেখেছি। তিনি একজন কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন বলে অনেকেই মনে করেন।

তারপর ওদের নামিয়ে আনা হয়। তিনজনের মধ্যে খালেদ মোশাররফ বয়সে সবার বড় ছিলেন। তিনি চুপচাপ হেঁটে আসেন। হায়দারও নাকি বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁদের মারার জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সময় একটা ঘটনা ঘটে। খালেদ মোশাররফ, হুদা, হায়দারের অস্ত্রশস্ত্র তারা নিয়ে নেওয়ার পরও হায়দারের জ্যাকেটের পকেটে একটা ছোট পিস্তল কীভাবে যেন রয়ে গিয়েছিল। হায়দার সেটা বের করে প্রতিরোধ করার একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেটা বের করার মুহূর্তে সেখানেই সবার সামনে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়।

খালেদ মোশাররফ ও হুদাকে যেখানে গুলি করে মারা হয়, সে জায়গাটা আমি পরে দেখেছি। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁরাই আমাকে জায়গাটা দেখিয়েছেন। ও জায়গাটা এখন কেউ দেখতে চাইলে আমি দেখাতে পারি। ওঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে তখন কয়েকটা ধানের পালুই (খড়ের গাদা) ছিল। ওখানে নিয়ে একটা ধানের পালুইয়ে খালেদকে আর তাঁর থেকে ২০০ বা ২৫০ ফুট দূরে আরেকটাতে হুদাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের গুলি করা হয়। ওঁদের অসংখ্যবার বেয়নেট চার্জও করা হয়। এইভাবে তারা মেরে ফেলে দুজনকে। হায়দারকে তো আগেই মেরে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের হত্যা করার পর ছবিও তোলা হয়। সেই ছবিও আমি পরে পাই।

ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে তখন একটা স্টুডিও ছিল। নাম স্টুডিও মিরাজ। ওটার মালিক ছিলেন জসিম ভাই, তিনি বগুড়াতে আমার শ্বশুর যখন কর্মরত ছিলেন, তখন আমার বড় ভাশুরের সঙ্গে পড়তেন। জসিম ভাইকে আমার স্বামী হুদা ভীষণ সম্মান করতেন। যখনই দেখা হতো, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন। জসিম ভাই কিছুদিন পর আমার এক খালাতো ভাইয়ের মাধ্যমে আমার ঠিকানা জোগাড় করে হুদা, খালেদ মোশাররফ আর হায়দারের মৃতদেহের ছবি আমাকে দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীরই কেউ তুলেছিল। তাঁকে

দিয়েছিল প্রিন্ট করতে। সেই নেগেটিভ প্রিন্ট করে যখন দেখলেন তাঁদের তিনজনের ছবি, তখন তিনি অতিরিক্ত কিছু ছবি প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন গোপনে। সেই ছবিগুলোই আমার কাছে এখনো আছে।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানও নিহত হলেন। তিনিও বাঁচতে পারলেন না। জিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে নওয়াজিশদের ফাঁসির আদেশ হলো, তখন ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে তাঁদের স্ত্রীরা, পরিবারের সদস্যরা অনশন করলেন। তাঁদের সমবেদনা জানাতে আমি তখন ওখানে গিয়েছিলাম। এম এ মঞ্জুর ভাইয়ের স্ত্রীও ছিলেন। মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুরকে তো আগেই মেরে ফেলা হয়েছে। আমি নওয়াজিশের বউকে আগে হয়তো দেখেছি। কিন্তু তখন ওর বউকে চিনি না। ভুলেও গিয়েছি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে যাওয়ার পর একজন হঠাৎ আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তাকিয়ে দেখি এক মেয়ে। সে কাঁদছিল আর বলছিল, 'ভাবি, আপনি আমাদের মাফ করে দেন, ওরা যে অন্যায় করেছিল, তার ফল আজকে আমরা পাচ্ছি। আমাদের মাফ করে দেন।'

সে বলল, ও নওয়াজিশের স্ত্রী। তখন ওকে আমি চিনলাম।

ব্রিগেডিয়ার মোহসিনের ভাই আমাকে বলেছিলেন, যেকোনো সময় ওদের ফাঁসি হয়ে যাবে। ওই সময় আমারও পাগলের মতো অবস্থা। কারণ যাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকে আমি চিনতাম। রওশন আলী, ইয়াজদানীকে চিনি, এই সব অল্প বয়সী ছেলেকে চিনতাম। তখন আমিও পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছি। এর বাড়ি ওর বাড়ি যাচ্ছি। এই সময় জিয়া হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত কয়েকজন আমাকে বলছে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে সেদিন তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাতে সাহায্য করিনি। উল্টো আমরা তাঁদের ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এই শাস্তি দিলেন। মনে হয়, পৃথিবীতেই মানুষের বিচার হয়ে যায়!

একটা সাইকেল চলতে থাকে আর কি! মানে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি বলে জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছেন। খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দারকে যাঁরা তাদের প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাও বাঁচতে পারেননি।

খন্দকার নাজমুল হুদা ও আমি, প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে (১০ এপ্রিল ১৯৬৭) তোলা

খন্দকার নাজমুল হুদা

বিয়ের আগে তোলা আমার ছবি

১৯৭১ সালে বয়রা সাবসেক্টরের ক্যাম্পে খন্দকার নাজমুল হুদা ম্যাপ সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছেন

বয়রা সাবসেক্টর ক্যাম্পে যুদ্ধে যাওয়ার আগে মুক্তিযোদ্ধাদের সাবসেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদা ব্রিফিং দিচ্ছেন
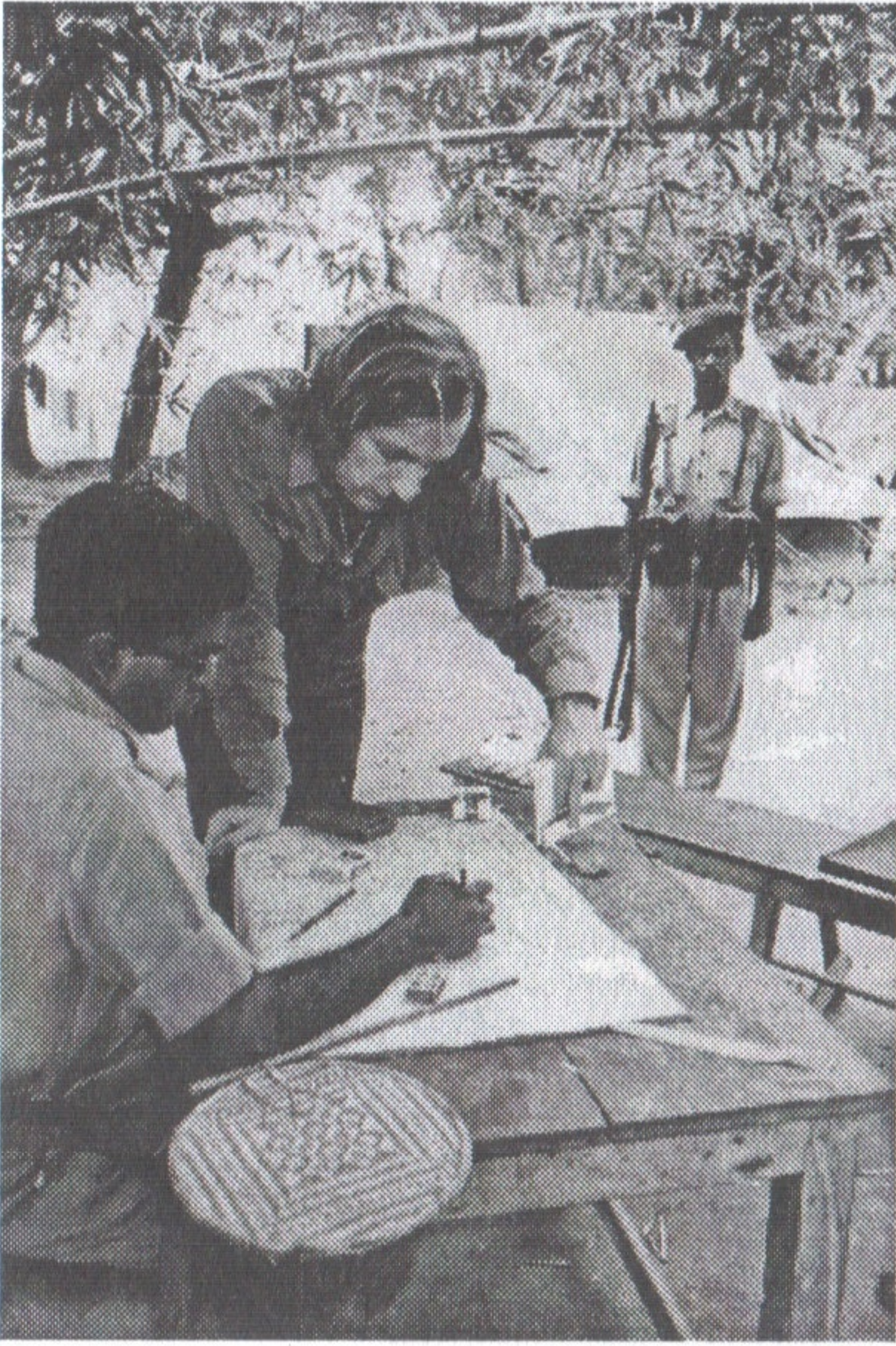
বয়রা সাবসেক্টর ক্যাম্পে
এক বিদেশি সাংবাদিকের
সঙ্গে খন্দকার নাজমুল হুদা
আলোচনা করছেন

১৯৭১ সালে
যুদ্ধক্ষেত্রে
গ্রেনেড হাতে
খন্দকার নাজমুল
হুদা

বয়রা সাবসেক্টরের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের ফাঁকে চা সহযোগে নাস্তা খাচ্ছেন খন্দকার নাজমুল হুদা। এই ছবিটি ১৯৭১ সালে *ইকোনমিস্ট* পত্রিকায় ছাপা হয়

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তোলা ছবি। বসা অবস্থায় খন্দকার নাজমুল হুদা (বাঁয়ে) ও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী (ডানে), দাঁড়িয়ে সেনা কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান (পরে সেনাপ্রধান) ও মাহবুবউদ্দিন আহমদ (পরে ঢাকার পুলিশ প্রশাসক)

মুক্ত যশোরে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সাবসেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদা
(৮ ডিসেম্বর ১৯৭১)

১৯৭১ সালে মুক্ত যশোরে সাংবাদিক ও মিত্রবাহিনীর সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাবসেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদা
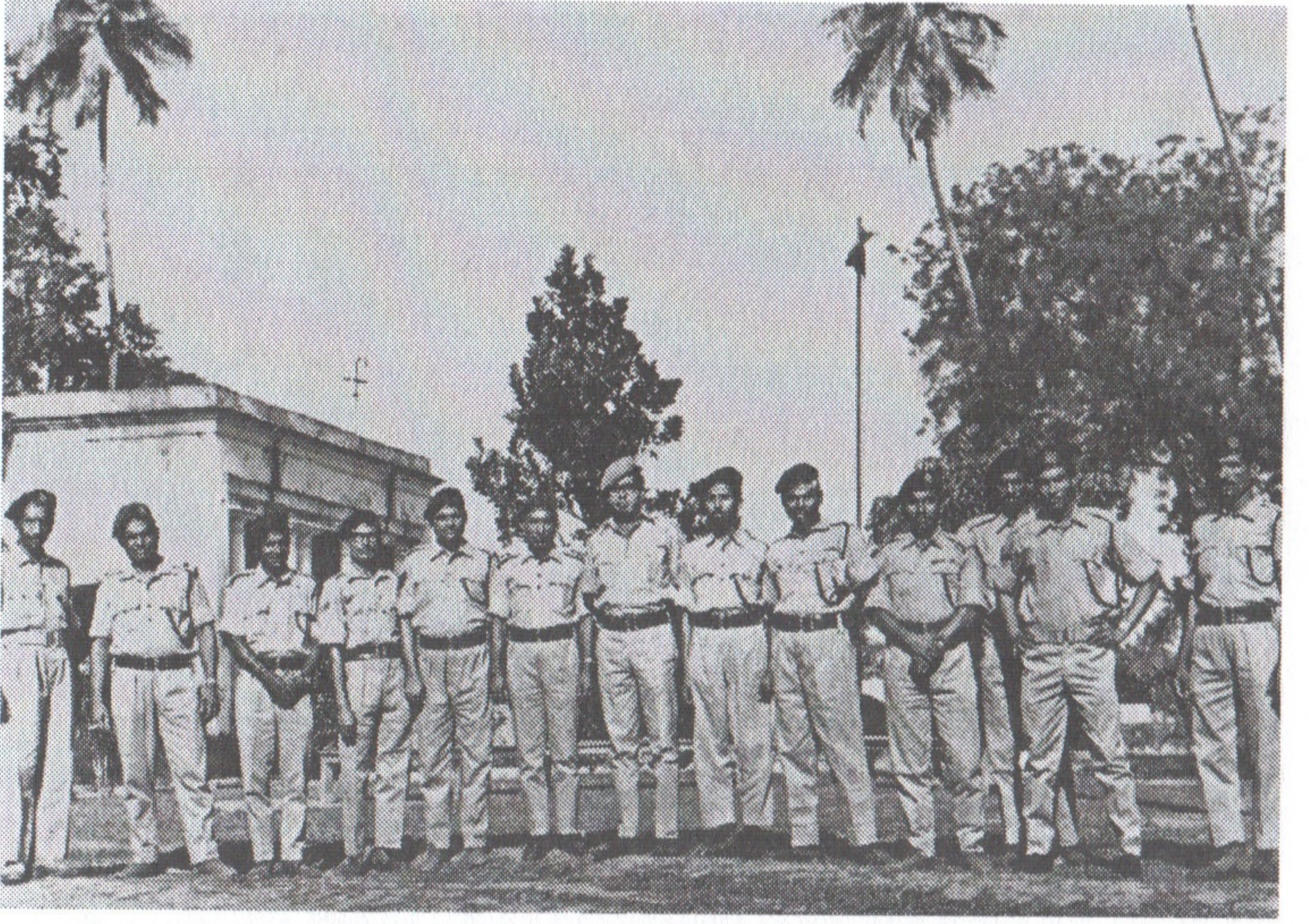
ভোলাট্যাক ইপিআর ক্যাম্পে (এটি এখন নবকিশলয় স্কুল) সহযোদ্ধাদের সঙ্গে খন্দকার নাজমুল হুদা। ছবিটি ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর তোলা। ছবি : এস এম শফি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বয়রা সাবসেক্টরের অধীন চৌগাছা রণাঙ্গনে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সাবসেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদা। ছবি : এস এম শফি

মুক্ত যশোরে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সালেকের (সর্বডানে) সঙ্গে বাঁ থেকে এম এ মঞ্জুর (পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল, ১৯৮১ সালে নিহত), মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক হোসেন হিডি বীর প্রতীক ও খন্দকার নাজমুল হুদা। ছবিটি ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরে যশোরে তোলা। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সফরে এসে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ছবিতে মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করছেন
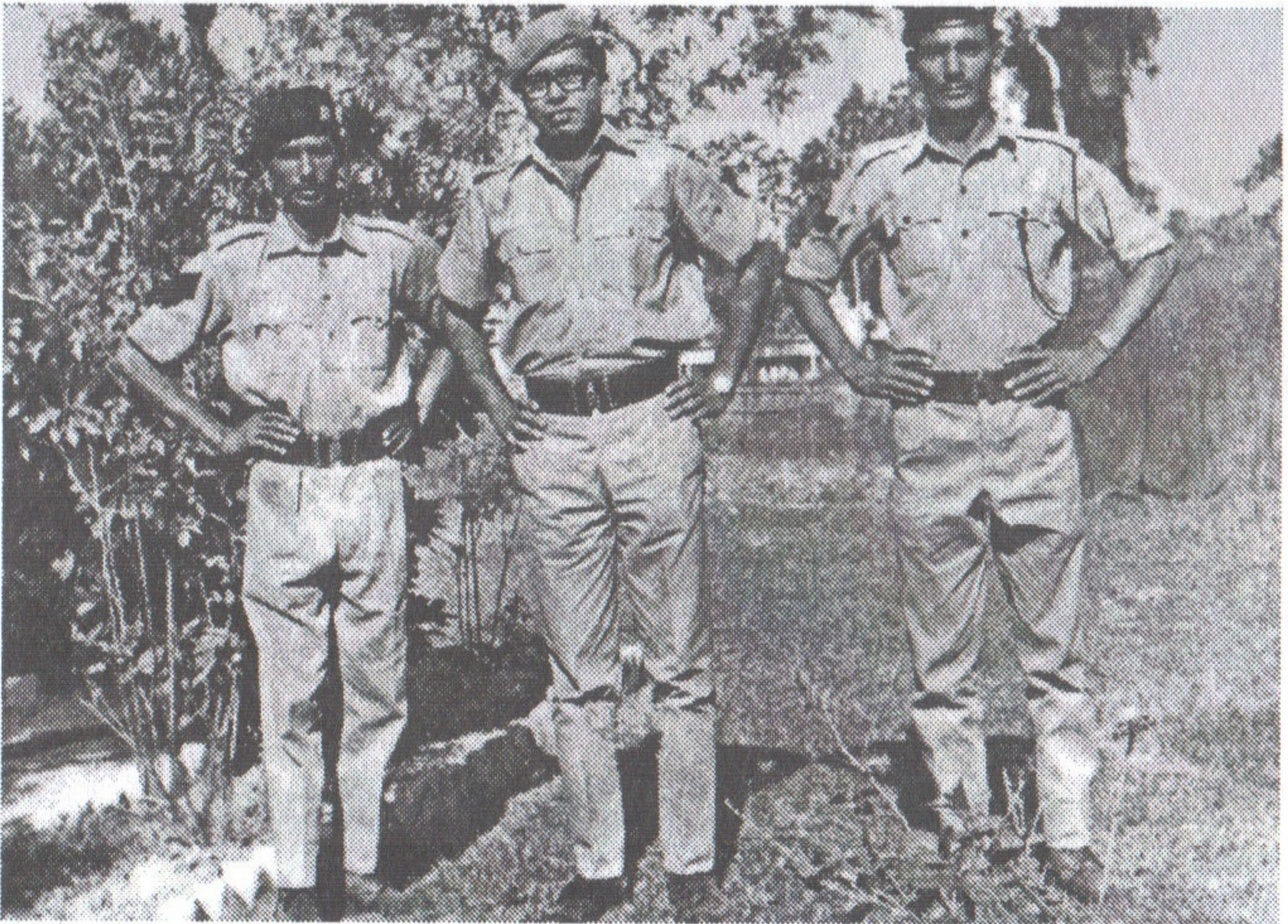
মুক্ত যশোরে দুই সেনার সঙ্গে খন্দকার নাজমুল হুদা (মাঝে)

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ী মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরা এবং পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক এ কে নিয়াজির সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা এ টি এম হায়দার (সর্বডানে)

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমি উদ্বোধন করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পেছনে মিলিটারি একাডেমির প্রথম কমান্ড্যান্ট খন্দকার নাজমুল হুদা

কুমিল্লা সেনানিবাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পতাকা উত্তোলনের আগে সালাম প্রদান করছেন। তাঁর পেছনে খন্দকার নাজমুল হুদা

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে করমর্দন করছেন

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমিতে একটি কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক কৌশল সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। ছবিতে অন্যদের মধ্যে খালেদ মোশাররফ (ডানে), খন্দকার নাজমুল হুদা (বাঁয়ে)
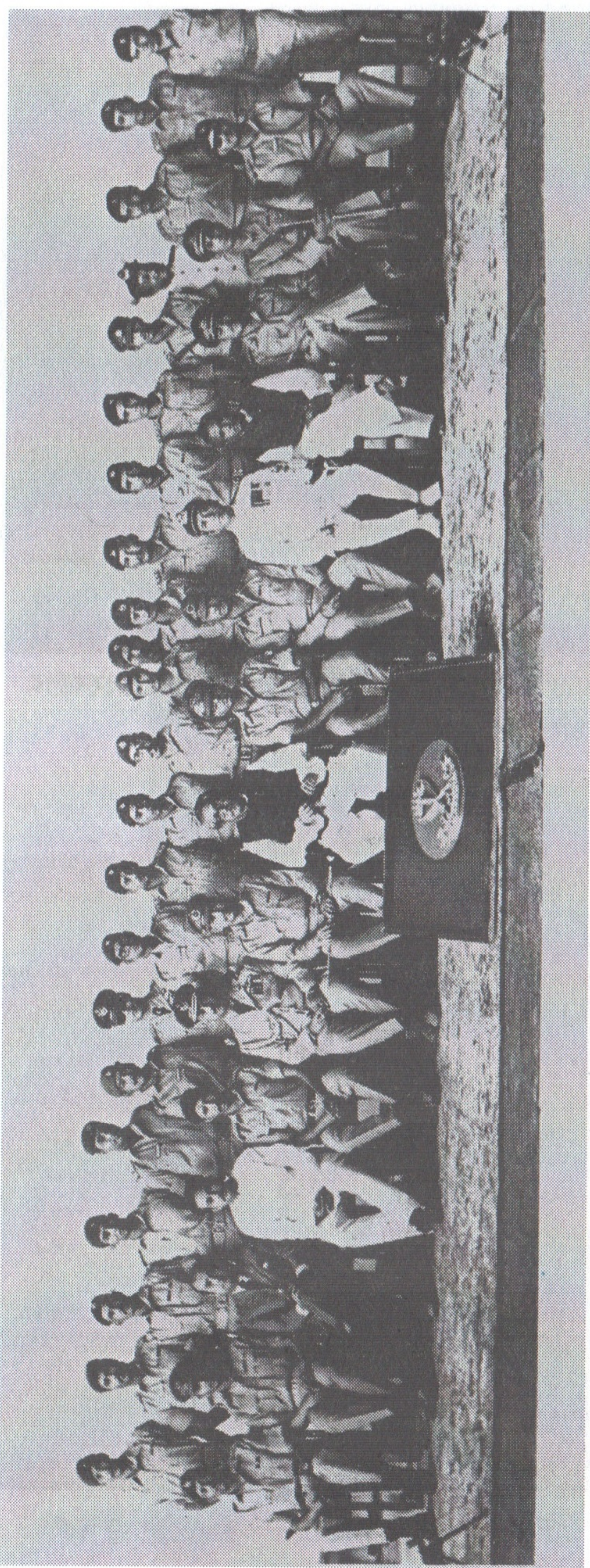
১৯৭৪ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, ৪৪ ব্রিগেড অধিনায়ক ও প্রশিক্ষণ নেওয়া সেনা কর্মকর্তাদের তোলা ছবি। বসা অবস্থায় বাঁ থেকে মেজর দিদার, কর্নেল এইচ এম এরশাদ, প্রতিরক্ষা সচিব মুজিবুল হক, প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, লে. কর্নেল মান্নাফ, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীর উত্তম, মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ বীর উত্তম, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর এম এইচ খান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, কর্নেল আবদুর রউফ ও মেজর আমজাদ। দাঁড়িয়ে বাঁ থেকে মেজর বদর, মেজর আবদুল্লাহ, মেজর আলতাফ, লে. এমদাদ, মেজর আনোয়ার বীর প্রতীক, মেজর শহীদ (এডিসি টু সিএএফএস), লে. শফিকউল্লাহ বীর প্রতীক, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, লে. সাইদুজ্জামান, ক্যাপ্টেন জিয়া, ক্যাপ্টেন আমিন, ক্যাপ্টেন নবী, মেজর মাহবুব বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন এনাম, মেজর রফিক, ক্যাপ্টেন হুদা (এডিসি টু সিএএস ও সিএনএস), ক্যাপ্টেন আশরাফ, মেজর সালাম, মেজর মুজিব ও অন্যান্য

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমিতে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও অন্যান্য

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমি পরিদর্শনে এসেছেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। সঙ্গে কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও অন্যান্য
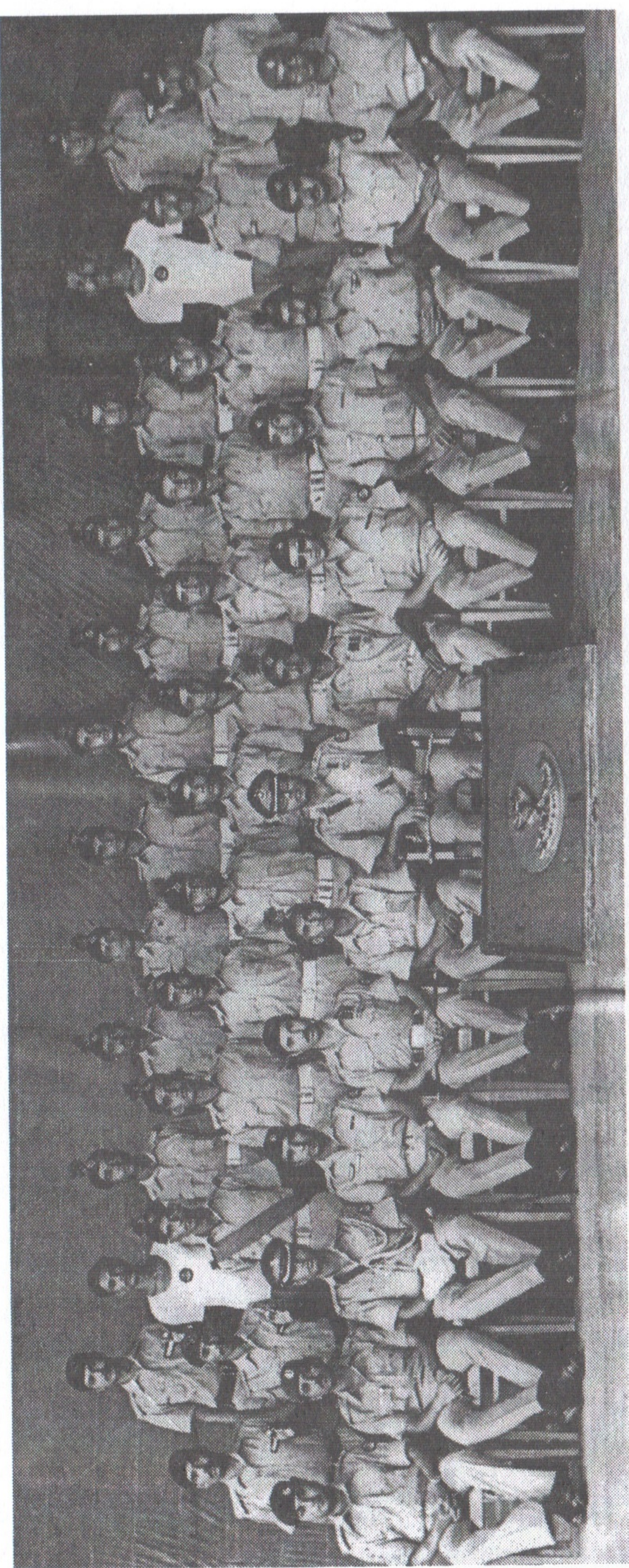
কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমিতে সেনা কর্মকর্তা, ক্যাডেট ও সৈনিকদের সঙ্গে কমান্ড্যান্ট কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বসা অবস্থায় বাঁ থেকে সপ্তম)

কুমিল্লা সেনানিবাসে অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমিতে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কমান্ড্যান্ট কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা

রংপুর সেনানিবাসের বাসভবনের সামনে হুদা ও অন্যান্যদের সঙ্গে তোলা ছবি। বাঁ থেকে হুদার ভাই খন্দকার কামরুল হুদা, নাজমুল হুদা, আমি, হুদার আরেক ভাই বৈমানিক সাইফুদ্দিন, স্থানীয় এক সাংবাদিক ও পেছনে এক বিদেশি সাংবাদিক
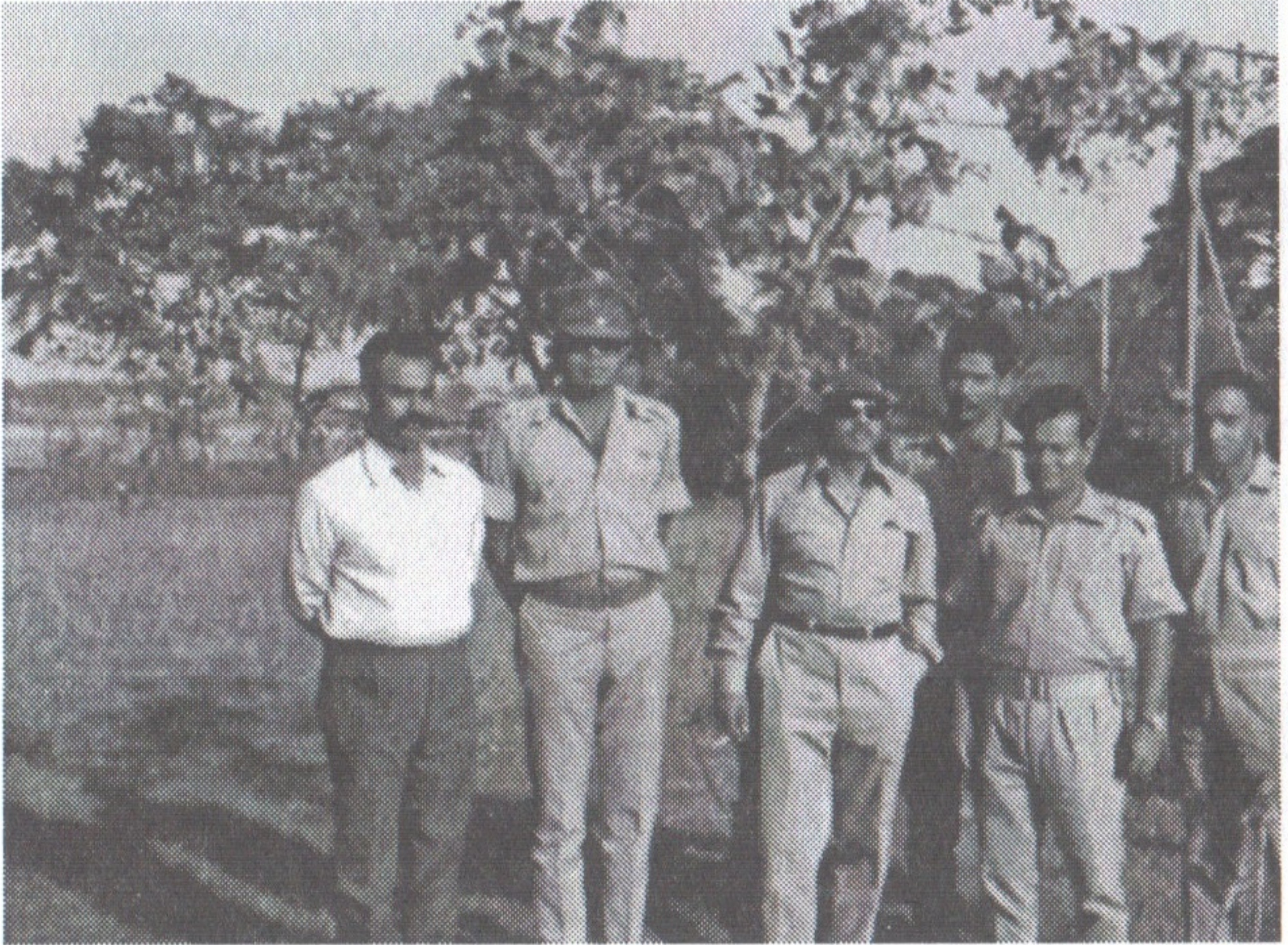
রংপুর সেনানিবাসে (বাঁ থেকে ডানে) সেনা কর্মকর্তা মতিউর রহমান বীর প্রতীক (পরে মেজর জেনারেল), কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা, বৈমানিক ক্যাপ্টেন সাইফুদ্দিন, সেনা কর্মকর্তা মুনির (পেছনে) ও অন্যান্য

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ (মাঝে), কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (ডানে) ও লে. কর্নেল এ টি এম হায়দারের (বাঁয়ে) মৃতদেহ

মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের মৃতদেহ

খন্দকার নাজমুল হুদার মৃতদেহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বীরত্ব-ভূষণ সনদপত্র

বীর বিক্রম

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা

পিতা খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন ঠিকানা পশ্চিম বগুড়া রোড, বরিশাল

বাঙালী জাতির গৌরবোজ্জ্বল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা রাখিয়াছেন।

জাতি বাংলা মায়ের এই মহান বীর সন্তানকে বীরোচিত সম্মান 'বীর বিক্রম' ভূষণে সম্মানিত করিল।

জাতি দেশমাতৃকার এই বীর সন্তানকে চিরদিন গর্ব ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সনদ পত্র নং-০০১

প্রাধিকারঃ বাংলাদেশ গেজেট নোটিফিকেশন নং ৮/২৫/ডি-১/৭২-১৩৭৮ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

খন্দকার নাজমুল হুদার মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া বীরত্বসূচক খেতাব 'বীর বিক্রম' সনদ

BAFA-393 Pt. I

Death Certificate.

Certified that number (service)........................Rank/~~Rating~~ Colonel
Name K. N. Huda ....Unit/Ship Comd : Rangpur Bde
(In full)
~~died/was killed/was killed in action on~~ Friday the 7th day of
Nov 1975, at Dacca.

CAUSE OF DEATH

		Approximate interval between onset and death.
I. Disease or condition directly leading to death*	a. Bullet wound due to (or as a consequence of)	
Antecedent causes Morbid conditions, if any giving rise to the above cause, stating the under-lying condition last.	b. due to (or as a consequence of)	
	c.	

P.T.O.

II. Other significant conditions contributing to the death, but not related to the disease or condition causing it.*	—	
	—	

*This does not mean the mode of dying e.g., heart failure, asthenia, etc. It means the disease, injury, or complication which caused death.

CMH Dacca Cantt
Station

Officer Commanding.

10/11/75
Date

Medical Unit

GPPD—S-3—708/71-72(M)—(M-94)—15-3-74—6,CC0.

HANDING/TAKING OVER-DEAD BODY

We, the undersigned have handed/taken over the dead body of Col Huda - Brigade Comd, Rangpur Cantt who brought in dead body in C M H Dacca on 07.11.75. We are ~~willing~~/not willing to carry out post mortem on the dead body of above named deceased.

Handed Over By
10/11/75

Taken Over By
(M. A. A. Zakariah)
No. ---- Rank
Name ----
Unit
16 Bakshibazar Road
Dacca. 2.
(Brother of Mrs. N. Huda)

ঢাকা সেনানিবাসের সিএমএইচ থেকে দেওয়া খন্দকার নাজমুল হুদার ডেথ সার্টিফিকেট

পরিশিষ্ট

হুদার লেখা চিঠি

আগরতলা মামলায় বন্দী হওয়ার পর হুদা আমাকে বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। বিয়ের আগে ও পরে, স্বাধীনতার পর আমরা যখন কয়েক দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন থেকেছি তখনো তিনি চিঠি লিখেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও তিনি চিঠি লিখেছেন। ১৯৬৮ সালে বন্দী হওয়ার পর তিনি আমাকে প্রথম চিঠি লেখেন ২ কি ৩ জানুয়ারি। দ্বিতীয় চিঠিটা লেখেন একই বছরের ১৩ কি ১৪ জানুয়ারি। আর তৃতীয় চিঠিটা লেখেন ওই একই বছরের ১৬ জানুয়ারি। এই তিনটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাসের স্টেশন হেডকোয়ার্টার্সের কঠোর বন্দিদশা থেকে গোপনে। তারপর তাঁকে ঢাকায় নিয়ে এসে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী করে রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি আমাকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন গোপনে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

তারপর সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে চিঠি লেখার সুযোগ পাওয়ার পর তিনি আমাকে প্রথম চিঠি লেখেন ১৯৬৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। সেনানিবাসের বন্দিখানা থেকে হুদা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন একাদিক্রমে মোট ৬৬টি। হুদার লেখা এই সব চিঠির প্রতিটি বাক্য আর শব্দ ছিল তাঁর গভীর অনুভবে সিক্ত। কোনো কোনোটি তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে, কোনো কোনোটি বাংলায়। ইংরেজিতে চিঠি লেখা সম্ভবত বাধ্যতামূলক ছিল এ কারণে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবাঙালি কর্মকর্তারা তাহলে সেগুলো পড়তে পারবেন। এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর জায়গাগুলো ছাঁটতে

পারবেন। বাংলায় লেখা হলে সেগুলো তাঁরা পড়তে পারতেন না এবং সেন্সর করতে গিয়ে নিশ্চিতই অসুবিধার মুখে পড়তেন।

সেই সময় চিঠিগুলো পাওয়ার পর পড়তে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে যে গভীর আবেগঘন প্রতিক্রিয়া হতো, সে কথা আর না বলাই ভালো। তখন তাঁর চিঠিগুলো বারবার পড়তাম। এখনো তাঁর লেখা প্রতিটি চিঠির প্রতিটি বাক্য ও শব্দ আমাকে আবেগতাড়িত করে। প্রথম যে চিঠিটি ইংরেজিতে তিনি লিখেছিলেন, তার প্রথম বাক্যেই নিষেধ করেছিলেন আমাকে 'বিষাদের সুরে কিছু না লিখতে'। রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাসের নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে তখন তিনি বন্দী। সেই অবস্থাতেই তিনি আমাকে মানসিকভাবে সাহস জোগাতেন ঠিক এভাবেই।

রাওয়ালপিন্ডি সেনানিবাসের বন্দিদশা থেকে যখন তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে এনে বন্দী করা হয়, তখন সপ্তাহে মাত্র একটি চিঠি লেখার সুযোগ পান তিনি। তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসার আগেই আমি ঢাকায় পৌঁছেছিলাম। সে কথা জানতে পেরে তিনি ঢাকার বন্দিনিবাস থেকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'অল্প কয়েক দিন আগে আমি জানতে পেরেছি যে তুমি এখানে (অর্থাৎ ঢাকায়)। এটা আমার জন্য সত্যিই একটা বড় স্বস্তিদায়ক ব্যাপার। মানসিকভাবেও আনন্দজনক বটে। তুমি আমার কাছাকাছি, কিন্তু কী নিষ্ঠুর ব্যাপার, কাছে থেকেও আমরা কত দূরে!'

আল্লাহর ওপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসগত আস্থা আরও অটুট হয় আগরতলা মামলার আসামি হওয়ার পর। সামরিক সরকারের কারাগারের কঠোর বেষ্টনে থেকেও আশা হারাননি তিনি। ১৯৬৮ সালের ৫ মার্চ তিনি লিখছেন, 'তোমার চিঠি পড়ে আমি আল্লাহর কাছে শুকুর করলাম, আমার প্রার্থনা তিনি মেনে নিয়েছেন। তুমি শান্ত ও সমাহিতভাবে এই বিপদকে মেনে নিয়েছ তোমার ঈমান দিয়ে। এটা যে আমার কাছে কত বড় সান্ত্বনা, কত সুখের তা বোঝাতে পারব না। বিশ্বাস করো, তোমার এই মনোবল আর বিশ্বাস আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সুখী করেছে। আমার শুধু...ভয়...ছিল পাছে তুমি এই দুঃখ সহ্য করতে না পারো।...হুজুরপাকের দোয়া তো আছেই, তা ছাড়া আমি যা...শুনি, দেখি ও বুঝি তাতে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে ইনশা আল্লাহ আমার কিছুই হবে না কেবলমাত্র চাকরি যাবে।'

হুদা যখন বন্দী, তখন আমাদের প্রথম সন্তানের বয়স মাত্র কয়েক মাস, দুধের শিশুমাত্র, তার জন্যও তিনি উদ্বেল ছিলেন। তার জন্যও প্রতিটি চিঠিতে প্রকাশ করতেন তাঁর ভালোবাসা।

বন্দী অবস্থায় লেখা চিঠি মারফতও তিনি সব ভয়ভীতি উপেক্ষা করে যে কারণ বা আদর্শের জন্য বন্দী, সেই কারণ বা সেই আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, 'আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার যে, যে কারণ বা আদর্শের জন্য আমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, সেই আদর্শের পেছনে আমার কোনো স্বার্থপর ইচ্ছা বা পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র কাজ করেনি। বরং এটা এমন এক আদর্শ, যাকে আমি মহৎ বলে মনে করি এবং এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

কঠোর বন্দিজীবনেও তিনি তাঁর এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। প্রায় ঘোষণা দেওয়ার স্বরেই তিনি বলছেন, 'শুভের সাথে অশুভের এই যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রাগারে মাত্র তিনটি অব্যর্থ অস্ত্র—ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা।'

নিঃসঙ্গ বন্দিজীবনের কষ্টের কথা প্রকাশ করে তিনি জানাচ্ছেন, 'নীলু, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এই নিঃসঙ্গতা যে কতখানি ভয়াবহ, দুর্বিষহ। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হয় অনন্তকাল। মনে হয়, এ মহাকালের চলার গতি বোধ হয় চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। মনে হয় এ মহাকাল আমাকে গ্রাস করেছে। তবু জানি, সময় চলছে যখন জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী, মুক্ত পৃথিবীকে দেখি। আমি দেখি, আমার জানালা দিয়ে জগতের...প্রতিটি প্রাণীই মুক্ত স্বাধীন—শুধু আমি বন্দী। সামনের বাগানে মালী কাজ করে। আমি ওকে দেখি আর আনন্দ পাই। আর ভাবি, গরিব কিন্তু সুখী। কারণ, সে মুক্ত। যখন অফিসের (কাজ) শেষে সবাই একে একে ফিরে যায়, আমি ওদের হিংসা করি। ওরা সেই গেট দিয়েই বাইরে যায়, যেটা দিয়ে আমি কিছুদিন আগেও সগর্বে আনন্দে বাড়ি ফিরে যেতাম।'

তাঁদের ঘিরে যে পাহারা বসানো হয়েছিল, যেভাবে তাঁদের রাখা হয়েছিল, তারও সরস বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি এক চিঠিতে, যার এক জায়গায় বলছেন, '...তোমাকে লিখতে লিখতে বারবার খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখছি। হেডকোয়ার্টার্সের গেট খুলে গেছে। সেন্ট্রিরা দাঁড়িয়েছে।...আর অফিসাররা ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে যাচ্ছে। আমি ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুলভাবে তোমাকে বলে দিতে পারি, আমার সারা দিনটা কেমনভাবে কাটবে! এখন (সকাল) সাতটা। চা খাব। ...আটটার সময় ব্রেকফাস্ট করব। সাড়ে আটটা বা নয়টায় নাপিত আসবে আর আমি একটা রাজকীয় সমারোহের মধ্যে দাড়ি কাটব। আমাদের নিজের শেভ করা নিষেধ। পাছে ব্লেড দিয়ে আত্মহত্যা করি। এমনকি ফ্লাশের চেইনটা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুলে নেওয়া হয়েছে। হাতল টেনে ব্যবহার করি!! কিন্তু ঘরের ইলেকট্রিক পয়েন্টগুলো, যা মানুষের মৃত্যুর প্রথম দুটির থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ও

আরামদায়ক করতে পারে, সেগুলো সম্বন্ধে কোনো সতর্কতা নেই! একেই বলে ফৌজি বুদ্ধি।'

হুদা বন্দী হওয়ার পর আমাদের যে বন্ধুগোষ্ঠী ছিল, ব্যতিক্রম বাদে, তাদের বেশির ভাগই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। যেন তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দিন কোনো রকম জানাশোনা ছিল না। ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, 'আমার "বন্ধুরা" বোধ হয় ভুলেও তোমার কাছে আসে না। অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের কি উঁচু ধারণা ছিল আর কতভাবেই না সাহায্য করেছি। দুঃখ কোরো না। এখন মানুষের আসল রূপ বুঝতে পারবে। এটা আমাদের পরবর্তী জীবনে চলতে সাহায্য করবে।' এ কথা লেখার পরপরই আমাকে তিনি এই বলে পরামর্শ দিচ্ছেন, 'ওদের সঙ্গে দেখা হলে না চেনার ভান কোরো।'

কত চিঠি। কত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, হতাশা আর দীর্ঘশ্বাসের কথা। আগরতলা মামলার কথিত আসামি হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। অনেক চিঠি লিখে একসঙ্গে পাঠাতেন। তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক জীবন শুরু হওয়ার আগে ও পরে লিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র অল্প কয়েকটি চিঠি। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ছিলেন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় এবং তার পরও তিনি লিখেছিলেন কিছু চিঠি। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিসরে লেখা ওই সব চিঠি থেকে বাছাই করা কিছু চিঠি এখানে প্রকাশ করা হলো। এসব চিঠি পাঠ করে পাঠকেরা উপলব্ধি করতে পারবেন একজন মহান দেশপ্রেমিকের অন্তরাত্মা সম্পর্কে। কেননা, চিঠি তো অন্তর্গত হৃদয়েরই পরিস্রুত বাণীর সমাহার।

নীলুফার হুদা

বিয়ের আগে ও পরে লেখা চিঠি

২০ মে, ১৯৬৫

ছবি চেয়েছিলে, পাঠালাম। গতকাল...সাতটা পর্যন্ত অফিসে প্রতিটি ফোনের ঘণ্টায় উদ্‌গ্রীবভাবে সাড়া দিয়েছি আর প্রতিবারই তারের অপর প্রান্তের নিরাশ কণ্ঠে নিরাশ হয়ে ফোন রেখেছি। একটা ব্যর্থ দিনের বিররণ ধরা থাকল আমার রোজনামচায়। কিন্তু এই অপেক্ষা আর নীরবতার মধ্যেও একটা মধুরতা ছিল। তাই বলে এই মধুরতাটা যেন প্রতিদিনই উপহার দিয়ো না। লিখো বড় করে আর ফোন কোরো। অনেক ভালোবাসা নিয়ো।

২

অফিসার্স মেস, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার
চট্টগ্রাম সেনানিবাস, পূর্ব পাকিস্তান

সকাল আটটা, ১ নভেম্বর ১৯৬৫

ছুটির আবেদনের ফলাফল আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারব। যদি পাই, তবে এই শুকনো চিঠির বদলে আমাকেই ঢাকায় পাবে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কল্পনা করেছি, ঢাকায় এই তিন দিন প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাটাব।

মণি আর আবু আসায় এই কয় দিন খুব আনন্দ করে কাটিয়েছি আমরা চারজন। কারণ এখানের একঘেয়ে জীবনে 'রামগড়ুরের ছানা হাসতে তাদের মানা' ধরনের সময়ই কাটাতাম। কিন্তু এই কয়দিনে তার ব্যতিক্রম হলো। সবার পেটের পেশিগুলো ব্যথা হয়ে গেছে হাসতে হাসতে। যদি যাওয়া না হয়, তবে আজ থেকে আবার সেই বন্দী রসকসবিহীন জীবন শুরু করতে হবে।

সেদিন টেলিফোনে ভালো করে কথা বলতে না পারার জন্য খুবই দুঃখিত। তুমি হয়তো খুব রাগ করেছিলে, কিন্তু উপায় ছিল না। আবার কবে (ফোন) করছ? অবশ্য আমি চাই না যে শুধু ফোন করার জন্য তোমার নিজের আত্মসম্মান ভুলে প্রতিদিন অন্যের অনুগ্রহ চাইবে। কেমন আছ, কেমন কাটছে তোমার ঢাকায় দিনগুলো?

বড় করে লিখো। ভালো থেকো। অনেক ভালোবাসা নিয়ো।

৩

চাটগাঁ
২৬ জানুয়ারি ১৯৬৬

নীলু,

ঈদের শুভেচ্ছা নিয়ো। গত তিন দিন থেকে তোমাকে ফোনে পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। মনে অবশ্য আশা ছিল, তুমিও করতে পারো। কোনোটাই হলো না, তাই খুব খারাপ লাগছিল, বিশেষ করে ঈদের দিন রাত একটার সময় যখন খবর পেলাম, পরের দিন তোমরা কুমিল্লায় আসছ না। ভোর ছয়টায় রওনা হওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলাম, আর সারাটা দিন আমি আর জামান কল্পনা করেছি, কীভাবে সেই দিনটা কাটাব। রাত একটায় ভাবলাম ১ জানুয়ারির প্রতিশোধ! পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম, সংগত কারণ অনুযায়ীই তোমাদের সম্ভব ছিল না।

আশা করি, তোমার মন এখন অনেক ভালো। আজ গগু ভাইকে ফোন করে জানব, খালার ২৮ তারিখে যাওয়া হবে কি না।

কেমন লাগছে তোমার সেই দিনটির প্রতীক্ষা? ভবিষ্যতের কোনো একটা শুভদিনের প্রতীক্ষার মধ্যে যে এত আনন্দ আর রোমাঞ্চ আছে, তা আমার চিন্তারও বাইরে ছিল। আজ থেকে ৭৪ দিন পরে আমাদের যে শুভলগ্নটা আসছে, তা তোমার মনে কেমন দোলা দিচ্ছে, জানতে ইচ্ছে হয়।

কেমন কাটল তোমার ঈদের দিনটা! আমি আর জামান এখানে বেশ আনন্দ করেছি সারাটা দিন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে ঘুরে।

মা বোধ হয় তোমাদের বাসায় গিয়েছিলেন আবু আর ফ্লোরাকে[১] নিয়ে।

শাদানমণির খবর কী? ওকে বলো, ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেও আমি কিন্তু ওকে খুব আদর করব।

১. হুদার খালাতো বোন।

গতকাল একটা ঈদের শুভেচ্ছা পেলাম গগু ভাই ও ভাবির কাছ থেকে। খুব সুখী হলাম। আশা করি ভালো আছো। লিখো বড় করে। অনেক ভালোবাসা নিয়ো। —গুডু

৪

ঝেলাম
১৫ মে ১৯৬৬
রাত ১০টা

নীলু,

আজ সকাল ১০টায় এখানে পৌঁছেছি। রাতে লাহোর স্টেশন ওয়েটিং রুমে ছিলাম। সারা দিন জিনিস ও রুম গোছানোতে গেল। এই এক মাসে তোমার ওপর কত নির্ভরশীল ও অকেজো হয়ে গেছি, তা বুঝলাম!

কাল সকাল থেকে কোর্স শুরু হচ্ছে। সময়সূচি দেখে বুঝলাম, কী রকম প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দুটো মাস কাটবে।

প্লেন থেকে তোমাদের দেখছিলাম। সুন্দর ছিল জায়গাটা, অথচ আগে আমাদের খেয়াল হয়নি।

গতকাল থেকে তোমার অভাবটা প্রতিমূহূর্তে অনুভব করছি। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িয়ে গেছ, তা এতটা বুঝতে পারিনি। যখন কাছে ছিলাম তখন ছিল শান্তি আর সুখ। এখন দূরে এসে হয়েছে উপলব্ধি। যোগের মধ্যেই প্রশান্তি আর বিরহের মধ্যে রয়েছে উপলব্ধি। তাই বিরহের মধ্যে ব্যথা থাকলেও সেটা অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনের মাপকাঠিতে সেটার অনেক মূল্য। এরা অনুপূরক পরস্পরে।

আশা করি ভালো থাকবে। ভাই ও ভাবিকে সালাম। শাদান-ফুয়াদের জন্য স্নেহাশিস রইল। তাড়াতাড়ি লিখো। অনেক ভালোবাসা নিয়ো। —গুডু।

৫

ঝেলাম
২২ মে ১৯৬৬

নীলু,

আজ মনে বেশ একটা আনন্দ লাগছে। আমাদের প্রথম সপ্তাহ আজ শেষ হলো। বাকি থাকল সাত সপ্তাহ। কিন্তু মনে হচ্ছে সময় কিছুতেই কাটছে না। এই সাত

সপ্তাহ যেন অনন্তকাল। সৈনিক জীবনের সত্যিকার রূপটা এত দিন বাংলাদেশের আয়েশেই জীবনে ভুলে ছিলাম। তাই প্রথম সপ্তাহটা যেন একটা ঘূর্ণিঝড়ের ভেতর দিয়েই কাটল। তাই শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে লেখার মতো পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। তুমি নিশ্চয় আশা করেছিলে। আমি দুঃখিত তোমাকে আশাহত করার জন্য।

সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত থাকি। মাঝে শুধু দুই ঘণ্টা বিশ্রাম ও খাওয়া। অভ্যাস হয়ে গেছে। গতকাল তোমার চিঠিটা পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। অবশ্য দুর্ঘটনার কথা জেনে খুব মন খারাপ লাগছিল। আমি অবশ্য খুব আশ্চর্য হইনি। অবাক লাগছে? ইংরেজিতে যাকে premonition বলে, সেটাই আমার হয়েছিল এ বিষয়ে সেদিন ট্রেন থেকে তোমাকে দেখতে দেখতে। যাক, তবু অল্পের ওপর দিয়েই হয়েছে। জানতে চেয়েছ দুর্ঘটনাটা মারাত্মক হলে আমার মনের অবস্থা কী হতো? সেটা কি তোমাকে লিখে বোঝাতে হবে? আমার সমস্ত হৃদয়ের সঞ্চয় আর ঐশ্বর্য তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা—সেটাই যদি আমি হারাতাম, তবে আমার জীবনের অবশিষ্ট আর কী থাকত? তোমার একা বের না হওয়াই ভালো।

আশা করি মনে রাখবে। আগামী সপ্তাহের ২৯ তারিখে আমরা ট্যুরে শিয়ালকোট ও লাহোরে যাচ্ছি। তিন-চার দিন পর ফিরব। পড়াশোনা মোটেই হচ্ছে না। পড়তে বসলেই তুমি এসে হাজির হও সামনে।

ফটোগুলো কি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ো। আবুর ছবিগুলো পেয়ে থাকলে তাও পাঠাবে।

এ মাসের শেষ সপ্তাহে জাহাজে স্কুটার পাঠানোর কথা ছিল জামানের। না পাঠানোর জন্য টেলিগ্রাম করেছি। তবুও সম্ভব হলে ওকে ফোন করে বলে দিয়ো, পাঠানোর দরকার নেই। কারণ আরেকজন বাঙালি ছেলের স্কুটারে যাওয়া-আসা করছি। কোনো অসুবিধা হয় না, তাই অনর্থক এত হাঙ্গামা করে পাঠানো এবং নিয়ে যাওয়ার সময় আমারও আরও হাঙ্গামা ও ২৫০ টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। ওকে ডিটেইল বলে দিয়ো, বরিশাল বা খুলনা থেকে এখনো কোনো চিঠি পাইনি। মা খুলনায় গেলেন কি না জানি না। তুমি কবে খুলনা যাচ্ছ, জানাবে। দাদা যদি বরিশালে নিতে চান তোমাকে কয়েক দিনের জন্য, আমি সুখী হব।

লায়লা[১] বুবুদের ওখানে গিয়ে থাকার কথা ছিল। গিয়েছিলে কি না, জানাবে। ওদের সবাইকে আমার সালাম দিয়ো। এখন কেমন কাটছে তোমার দিনগুলো, সারা দিন কী করো?

১. বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদের স্ত্রী।

ভাই আর ভাবিকে আমার সালাম দিয়ো। ভাবির শরীর এখন কেমন? শাদান-ফুয়াদকে আমার স্নেহাশিস দিয়ো।

এত ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে কতটা মোটা হলে জানিয়ো। সপ্তাহের অন্তত তিন দিন লিখো। ভালোবাসা নিয়ো। —গুডু।

৬

৬ জুলাই ১৯৬৬

নীলু,

এ কয়দিন ব্যস্ত থাকায় লিখতে পারিনি। লাহোর-পিন্ডি ঘোরা শেষ হলো। এত ক্লান্ত ছিলাম, ফিরে এসে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। শেষ সপ্তাহ ও আজ বলতে গেলে শেষ দিন। আগামীকাল ও পরশু বক্তৃতা, পরীক্ষা ও শনিবার শেষ পরীক্ষা। বিরাট কোর্স, কিছুই পড়া হয়নি। তার ওপর হঠাৎ খবর পেলাম, আগের পরীক্ষা আবার হবে। কেমন করব কে জানে। খুব চিন্তায় আছি। গতকাল জামানের চিঠি পেলাম। টিকিট লাহোর থেকে নেওয়ার কথা আজকের মধ্যে, কিন্তু সঠিকভাবে জানি না টাকা জমা দিয়েছে কি না। আমার এক বন্ধুকে তার (টেলিগ্রাম) করে দিয়েছি লাহোরে টিকিট নেওয়ার জন্য, যদি টাকা জমা না দিয়ে থাকে, তবে খুব অসুবিধায় পড়ব। কারণ গতকাল আমার চেকবই হারিয়ে গেছে। হাতে একদম টাকা নেই। কথা ছিল, কাল চেক দিয়ে টাকা নেব, সে উপায় নেই। কোনো রকম লাহোরে পৌঁছে লাহোর থেকে যদি সম্ভব হয় টাকা ধার করে আসতে হবে। চাটগাঁ ব্যাংকে টেলিগ্রাম করলেও টাকা পাঠাবে না। খুব চিন্তায় আছি। জামানকেও আজ টেলিগ্রাম করছি। সকালের ফ্লাইটে আমার সিট বুক করা আছে।

আশা করি ভালো আছ। আমার চেকটা কি পেয়েছ—লাহোরে যাওয়ার আগে পাঠিয়েছিলাম। অনেক ভালোবাসা নিয়ো।—গুডু।

৭

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

নীলু,

আজ দুপুরে জেঙ্গির চিঠিতে তোমার খবর পেয়ে কী রকম খারাপ লেগেছে বোঝাতে পারব না। সব থেকে বেশি অসহায় লাগছে, তোমার এত শরীর

খারাপ, অথচ তোমাকে দেখতে পারছি না। জ্বরটা কমে গেছে শুনে মনটা অনেক হালকা লাগছে। আশা করি, এ কয়দিনে আরও সুস্থ হয়ে উঠেছ। এখন কেমন বোধ করছ জানাবে। অসুবিধা হলে তুমি নিজে লিখো না। আমি কিছু মনে করব না। শুধু জলদি সেরে ওঠো, এই আশা করছি। তোমার অভাব সব সময় বোধ করছি। কবে আবার একসঙ্গে থাকতে পারব। বাসার খোঁজ করছি, এখন তেমন কোনো ভালো বাসা পাইনি, খোঁজে আছি। দরকার হলে অবশ্য মেসে থাকতে পারব। তুমি কবে আসতে পারবে জানিয়ো।

কে এম এইচ এহতেশামুল হুদা সাহেব কেমন আছেন। আশা করি, ভদ্রোচিত ব্যবহারই করছেন। তাঁর এখন ওজন ও লম্বা কত? ওর জন্য অনেক আদর রইল।

ঢাকার আর সব খবর কী? দাদা-সাইফুল[১] ও মা কি এসেছেন?

গাড়িটা আশা করি বিক্রি হয়ে গেছে এর মধ্যে। জামান কি আসে?

আব্বা-আম্মা কেমন আছেন? ওদের আমার সালাম দিয়ো। কবে যাচ্ছেন কিছু ঠিক হয়েছে কি? ...ডলি[২] ও রুনিমণিদের জন্য অজস্র চুমো রইল ও বাবলীর[৩] জন্য প্রেম। খবর দিয়ো খুব তাড়াতাড়ি।

৮

সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

নীলু,

এইমাত্র তোমাকে শহর থেকে টেলিগ্রাম করে এলাম। আজকের ডাকেও তোমার কোনো চিঠি নেই। তোমার এত দিনের মধ্যে আমাকে একটা চিঠি না লেখার মতো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি কি আমার ওপর কোনো কারণে অসন্তুষ্ট, আমার কোনো ব্যবহার বা কাজে? অন্ততপক্ষে সেটা জানিয়ো। অবশ্য যদি তোমার শরীর খারাপের জন্য কোনো চিঠি না লেখো, সেটা অবশ্য অন্য কথা। তোমার ও বাচ্চার শরীর এখন কেমন জানিয়ো। গত শনিবার তোমাকে একটা বিরাট চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি পেয়েছ এর মধ্যে। আব্বা ও আম্মা চলে গেছেন কি না, তাও জানি না। এখানে থাকলে আমার সালাম জানিয়ো। ওদের শরীর কেমন তাও জানিয়ো।

১. হুদার বড় ভাইয়ের ছেলে।
২. আমার মামাতো বোন।
৩. আমার খালাতো বোন।

আগামী ২২ থেকে ২৫ এ ক্যাম্পে যাব। সেদিন বিকেলেই ফিরে আসব।

গত শনিবার মায়ের চিঠি পেলাম ও নিশ্চিন্ত হলাম। তুমিও ওনাকে লিখেছ জেনে সুখী হলাম। বাচ্চার নাম সবার খুব পছন্দ হয়েছে। ডাকনাম কিছু ঠিক করলে কি না জানাবে। একটা কথা লিখতে ভুলে যাই। এখন থেকেই একটা ভালো মেয়েলোকের খোঁজ করো। এখানে অসম্ভব, এমনকি ছোকরা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ছেলে এনো না। যারাই আনে ঠকে, কারণ কিছুদিন পর ভালো বেতনে চলে যায়। সেই জন্য এমন কোনো মেয়েছেলে এনো, যার বাড়িঘরের প্রতি আকর্ষণ না থাকে এবং স্পষ্ট বলে দেবে, দুই বছরের মধ্যে ফিরতে পারবে না। এখন তোমার কাছে কাজের লোক কে আছে? বাবুর্চি কি আর পেয়েছ?

জামানকে আমি লিখে দিয়েছিলাম গাড়ি বিক্রির বাকি টাকা দিয়ে saving certificate অথবা প্রাইজবন্ড কিনতে। আমার Income Tax Return-এর সুবিধা হবে। ওকে বলো, আজকের মধ্যে যেন আমাকে নম্বরগুলো পাঠায়, কারণ ৩০ তারিখের মধ্যে return পাঠাতে হবে।

শনি ও রোববার শহরে মেজর মালেকের বাসায় ছিলাম। খুব ভালো লোক ওরা। এখন এখানে রাত আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ১০টা পর্যন্ত জেগে থাকা ভীষণ ব্যাপার এখানে। বিরাট এক মাঠের মাঝে আমাদের এই ক্যাম্প। জেঙ্গি ও গণ্ডু ভাইদের চিঠির উত্তর দিতে বলো। আজকের ডাকে GOC (DACCA) recommendation-এর কপিটা পেলাম। খুব ভালো লিখেছেন, যাতে চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হয়। দেখি কী হয়।

আবার লিখছি, তোমার চুপ করে থাকাটা আমার কাছে কেমন আশ্চর্য লাগছে। সত্যি কি কোনো কারণে আমার ওপর রাগ করে আছ। প্রতিদিন কী রকম আশা করে থাকি তোমার চিঠি পাব, কিন্তু ব্যর্থ হই।

আশা করি ভালো আছো। গাড়ি না থাকাতে যে কী রকম অসহায় লাগে, কল্পনা করতে পারবে না, বিশেষ করে কোনো triumph দেখলে বুকে ব্যথা লাগে।

উত্তর দিয়ো। ভালোবাসা নিয়ো। —গুডু।

৯

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

নীলু,

গত পরশু বিকেলে ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছি। এই জঘন্য জায়গা থেকে বাইরে গিয়ে অনেক ভালো লাগছিল। ফিরে এসে তোমার ১৭ তারিখে লেখা

চিঠিটা পেলাম। ওটা আবার ঢাকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

আমি যাওয়ার দিন তোমাকে একটা চিঠি ও তিনটা চেক পাঠাই। আশা করি, এর মধ্যেই পেয়েছ। টাকা ভাঙাতে পেরেছ বোধ হয়। ৪০০ টাকার চেকটা আগামী ১ তারিখে ব্যাংকে দিয়ো।

আগামীকাল বোধ হয় আম্মা চলে যাবেন। তোমার কী রকম খারাপ লাগবে সহজেই বুঝতে পারছি। যাক, কয়েক দিন পরই তো আবার আপা আসবেন। তখন আবার ভালো লাগবে। খুশনুদও[১] নিশ্চয় আসবে। আপাকে দু-এক দিনের মধ্যে লিখছি। টেলিফোনে কথা হলে বলে দিয়ো, দুই শিশি জবাকুসুম ও আমার সেই রেকর্ডটা যেন নিয়ে আসে। জামানের বিয়ের পাকা কথার সময় বোধ হয় তুমি ও মালমণি[২] গিয়েছিলে। কেমন হলো এবং কী কী হলো সব জানিয়ো। আমি সেদিন বিকেলে শান্তকে[৩] একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। বোধ হয় পেয়েছে। জামাইনা[৪] ও শান্ত কি এখন কথা বলে? ও এখন কোথায় খায়? পাগলি বোধ হয় খুব খাবার পাঠাচ্ছে। পাগলির সঙ্গে দেখা হলে আমার সালাম দিয়ো।

জামানের চিঠিতে জানলাম, ও আগামী মাসে আবার বিলাতে যাচ্ছে। ওর খুব চিন্তা, ও না থাকলে তোমার আসার সময় খুব অসুবিধা হবে। ওকে আমি সব লিখে দিয়েছি। ও যাওয়ার আগেই সব ঠিক করে নিয়ো। শাহজাহান ভাইকে লিখব, যেন সেই ফ্লাইটে থাকেন। তোমার ২২ তারিখ আসার কথা শুনে খুব ভালো লাগছে। তোমাকে ছাড়া ভীষণ খারাপ লাগে। সব সময় মনে হয়। কাল সারা বিকেল এত খারাপ লেগেছে যে বলা যায় না। দেরি কোরো না। বাসার অবশ্য এখনো কিছু হয়নি। বোধ হয় ভাড়া নিতে হবে। গাড়ি ছাড়া ভীষণ অসুবিধা হবে। সেই জন্য বিকেলে শহরেও যাইনি।

চাকর পাওয়া এখানে খুব অসম্ভব। খুব ভালো করে চেষ্টা কোরো, নইলে তোমার খুব অসুবিধা হবে। ছোকরা না আনাই ভালো। আমি মাকেও লিখে দিয়েছি, যদি বরিশালে কোনো ভালো মেয়েলোক পাওয়া যায়। এখানে গতকাল থেকে শীত শীত ভাব পড়েছে। ভীষণ ধূলিঝড় হয়। তুমি লিখেছিলে, গগু ভাই চিঠি লিখেছেন কিন্তু এখনো পাইনি। সাদান-ফুয়াদদের কথা শুনে দুঃখ লাগছে।

১. আমার বোনের ছেলে।
২. হাসিনা আবদুল্লাহ। আমার বড় ভাই মুরাদ আবদুল্লাহর স্ত্রী। হুদা তাঁকে মালমণি বলে ডাকতো।
৩. এম নূরুজ্জামানের স্ত্রী।
৪. এম নূরুজ্জামান।

ওদের কথা প্রায়ই মনে হয়। ওদের আমার অনেক আদর দিয়ো।

মায়ের চিঠিতে জানলাম, তার বুকের ব্যথা কমেনি। ১০ তারিখে দাদা যখন সাইফুলকে নিয়ে ঢাকায় আসবেন, তখন বোধ হয় ডাক্তার দেখাতে আসবেন। তোমার ও মায়ের চিঠি পড়ে মনে হলো, ভাবি বোধ হয় এক দিনও আসেননি। আশ্চর্য রকমের মন আর ব্যবহার!

গতকাল সকালে সফি ভাই (মেজর সফিউল্লাহ) লাহোর থেকে ফোন করেছিলেন। প্যাকেট পৌঁছে গেছে, তবে যে রেটে তাঁরা সুপারি খাচ্ছেন, মনে হয় ওটা আর পাওয়া যাবে না! জামিল মামাও লাহোরে এসেছেন ট্যুরে, উনিও প্রচণ্ডভাবে খাচ্ছেন। শনিবার আমাদের এক মেজর গাড়িতে লাহোরে যেতে পারেন। যদি যায়, আমিও যাব।

তোমার গয়না সব নিয়ে এসো। এখানে লকার পাওয়া যাবে। জামানকে লিখে দিয়ো তোমার ইস্তিরি কিনে দিতে। মেসের চেকটা পাঠিয়ে দিয়ো। গতকাল signal এসেছে।

বিলাতে যাওয়ার এখনো ঠিক হয়নি। জে. মোজাফ্‌ফর খুব ভালো recommend করে GHQতে লিখেছেন। আমি এখানে কোনো তদবির করছি না। বহু ব্যাপারে তো বহু তদবির করে দেখলাম, কিছুই হয় না। যা হওয়ার এমনিই হবে। তুমি চিন্তা কোরো না চাকরির ব্যাপারে। হঠাৎ কিছু করব না, যত কষ্টই হোক। তুমি এলে আলোচনা করে যা ভালো হয় করব। জামানও তা-ই লিখেছে। কিন্তু আমি আমার নিজের মনকে তো জানি, কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারব না। অসহ্য লাগে, আবার ভীষণ মায়াও লাগে এত দিন এত কষ্ট করার পর হঠাৎ কিছু করে বসতে। নিজেকে সিভিলিয়ান হিসেবে ভাবতেও আবার খারাপ লাগে। এই দোটানার মধ্যে যে কী রকম মানসিক অশান্তি, তা বোঝাতে পারব না।

তারপর আমাদের এহতেশাম সাহেব কেমন আছেন, ওনার সব কীর্তিকলাপের কথা শুনলাম। সবই ভালো ও মজার, শুধু রাতে সব অসভ্যপনা বাধে। ওকে আমার অনেক আদর দিয়ো। বইটা ভরে রেখো। ছবি তো পাঠালে না। ডাকনাম কিছু ঠিক করেছ কি না জানিয়ো।

নানা কেমন আছেন? তাঁকে আমার সালাম দিয়ো, খালা-খালুকেও। ডলিমাল-রুনিমণি ও বাবলী সোনাকে অনেক চুমো দিলাম। আজাদের খবর কী? ও কি এখনো বাজারের পয়সা চুরি করে সিগারেট খায়? জেঙ্গি কেমন আছে? ওকে আসতে বলো এই শীতে। আশা করি ভালো আছ। অনেক ভালোবাসা নিয়ো। —গুডু।

আগরতলা মামলায় বন্দী থাকা অবস্থায় লেখা চিঠি

১ মার্চ ১৯৬৮
সকাল আটটা

আমার নীলু,

এই নিঃসঙ্গ একক বন্দিজীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ঠিক করলাম, আজ থেকে প্রতিদিনই তোমাকে একটা করে চিঠি লিখব, অনেকটা রোজনামচার মতো। জানি, এই চিঠিগুলো আমি মুক্তি পাওয়ার আগে তোমার হাতে পৌঁছাবে না, তবু তোমাকে লেখার আনন্দ আমার ভারাক্রান্ত মনকে অনেকটা হালকা করবে—আমার মনের মানুষকে এই চিঠি লেখায় আনন্দই পাব। চিঠি লেখার সময় অন্তত এই গুরুভার সময় যেটা মনে হয়, মনের ওপর এক ভীষণ নিম্নচাপ সৃষ্টি করে, সেটা থেকে উদ্ধার পাব। এই থমকে যাওয়া কালের হাত থেকে কিছুটা সময়ের জন্য নিষ্কৃতি পাব। আর একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন, যার মধ্যে আজ আর গতকালের কোনো পার্থক্যই থাকে না; এটা করে প্রতিদিনকে আমি পৃথকভাবে পাব।

যদিও মনে হয়, জগদ্দল পাথরে ঢাকা সময় কাটবে না, তবু জাগতিক নিয়মে এর চলার শেষ নেই। সময়ের গতিবেগটা আপেক্ষিক। সুসময় গতিবেগ বেড়ে গেছে মনে হলেও চলার গতিবেগ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি হয়নি। তাই এই দুঃসময়ের সময়ও একদিন খোদার রহমতে কেটে যাবে। আবার আমাদের সেই সোনালি-বর্ণালি হাসিমোড়া চঞ্চল দিনগুলো তিনিই

আমাদের ফিরিয়ে দেবেন। সেই সুন্দর প্রভাতের খুশি-ঢাকা পরিবেশে আমি আর তুমি যখন এই দিনগুলোর কথা ভাবব, মনে হবে আমাদের জীবনের এক অতি ক্ষুদ্র অতি অশুভ ক্ষণে আমরা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। বর্তমান শান্তি আর পরিতৃপ্তির মাঝে ওই সময়টার কোনো মূল্যই থাকবে না আমাদের কাছে। গত গতই। আমাদের মিলিত সুখের হাসির মধ্যে এই দুঃস্বপ্নঘেরা অশুভ ক্ষণটা নিতান্তই অবাস্তবতায় ডুবে যাবে।

সেই সময়ের কথাই আমি ভাবি আর সেটাই আমার আশা, ভরসা, আনন্দ, সুখ-কল্পনার মধ্যেও। ভালোবাসা সর্বজয়ী, আমরাও তাই আমাদের ভালোবাসা দিয়ে সেই সোনালি ক্ষণটাকে জয় করব, আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে আল্লাহর প্রতি।

শুভর সঙ্গে অশুভর এই যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রাগারে মাত্র তিনটি অব্যর্থ অস্ত্র—ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। শুভের জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ এখানেই শেষ করছি। তুমি ও বাবু ভালো থাকো সারাক্ষণ, সেই দোয়া করি আল্লাহর কাছে। আমার বর্তমানের সব দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হবে তোমাদের এই কুশলেই।

আমার হৃদয়জোড়া ভালোবাসা নিয়ো।—হুদা

২

৩ মার্চ ১৯৬৮
বিকেল সাড়ে চারটা

আমার নীলু সোনামাণিক,

তোমার জীবনে আমি শুধু দুঃখই বয়ে আনলাম—সব সময় এই মনস্তাপ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে যে প্রচণ্ড অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন জ্বলছে, তার ভাষা প্রকাশ আমার জন্য অসম্ভব। জগতে সব থেকে নিকৃষ্টতম জীব মনে হচ্ছে আমাকে, যে তোমাকে বুঝতে পারিনি এর আগে। তুমি আমার জীবনে ও মনে যে কতখানি দূরে আছ, তা সহস্রতম পরিমাণও যদি আগে বুঝতে পারতাম, তবে বোধ হয় আমি এ অনুশোচনার প্রচণ্ড জ্বালা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতাম। আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে তোমার প্রতিচ্ছবি, তোমার ভালোবাসা, তোমার নিঃস্বার্থ সেবা আর তোমার মনের মহত্ত্বের স্মৃতিই আছে। যখন মনে হয় কত সময় তোমার সঙ্গে কত নীচ আর স্বার্থপর ব্যবহার করেছি, তখন ধিক্কার আর নিজের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জায় মনে হয় আত্মহত্যা করি। সেটা করতে পারি না তোমার জন্য আর

আমাদের সোনার কথা ভেবে। তাই মনের ভার কিছুটা লাঘব করার জন্য দেয়ালে মাথা ঠুকি।

এখন বুঝি, তুমি আমার থেকে কত মহৎ প্রাণের যে আমার সব অন্যায় আচরণ ও নীচ ব্যবহারের পরও আমাকে তুমি তোমার সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। আমি বোধ হয় এর যোগ্য না, তবু তুমি দাও, তাই নিজেকে ধন্য ভাবি। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। আর এও জানি, আল্লাহ আমাকে এই দারুণ শাস্তি দিচ্ছেন সেই কারণেই। তাই আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করি, এই নিদারুণ শাস্তি ও অনুতাপ-অনুশোচনার আগুনে পুড়ে যেন আমার হৃদয়কে পবিত্র করে তোমার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেন, আর সেই পবিত্র মন যেন চিরদিন তোমার মনে শান্তি আর সুখের সঞ্চার করে। তোমার চোখের কোলে যেন কোনো দিন কোনো কারণেই আর বিন্দুমাত্র পানিও না আনতে হয়। আল্লাহ কি আমাকে আরেকবার সুযোগ দেবে না তোমাকে সুখী করার? নিশ্চয় দেবেন, আর সেই দিনের প্রতীক্ষাতে এখনকার এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা, শাস্তি আর অনুতাপের জ্বালা সহ্য করছি। নীলু, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, এই নিঃসঙ্গতা যে কতখানি ভয়াবহ, দুর্বিষহ। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হয় অনন্তকাল। মনে হয় এ মহাকালের চলার গতি বোধ হয় চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। মনে হয়, এ মহাকাল আমাকে গ্রাস করেছে। তবু জানি, সময় চলছে। যখন জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী, মুক্ত পৃথিবীকে দেখি। আমি দেখি আমার জানালা দিয়ে, জগতের আর প্রতিটি প্রাণীই মুক্ত স্বাধীন, শুধু আমি বন্দী। সামনের বাগানে মালী কাজ করে, আমি ওকে দেখি আর আনন্দ পাই আর ভাবি, গরিব কিন্তু সুখী, কারণ সে মুক্ত। যখন অফিসের শেষে সবাই একে একে ফিরে যায়, আমি ওদের হিংসা করি, ওরা সেই গেট দিয়েই বাইরে যায়, যেটা দিয়ে আমি কিছুদিন আগেও সগর্বে আনন্দে বাড়ি ফিরে যেতাম।

৩

৬ মার্চ ১৯৬৮
সকাল পৌনে আটটা

আজ প্রথম তাহাজ্জতের নামাজ পড়লাম ভোর চারটায় উঠে। মনে খুব শান্তি পাচ্ছি। গতকাল কেমন যেন ম্রিয়মাণ ও নিরাশার দিন ছিল, আর আজ ঠিক তার উল্টো। তুমি এখন হয়তো ঘুম থেকে উঠলে। আমি প্রায়ই কল্পনা করি, দিনের বিভিন্ন সময়ে তুমি কী করছ। আর আমাদের মিষ্টুমণি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার

সকালের দুধ খেয়ে এখন আয়ার সঙ্গে বাইরে ঘুরছে। গণ্ড ভাই-ভাবি ঘুম, জেঙ্গি ছোড়া অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর আমি সকালের চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি এবং তোমাকে লিখতে লিখতে বারবার খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখছি। হেডকোয়ার্টার্সের গেট খুলে গেছে, সেন্ট্রিরা দাঁড়িয়েছে আর অন্য অফিসাররা ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে যাচ্ছে। আমি ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুলভাবে তোমাকে বলে দিতে পারি, আমার সারা দিনটা কেমনভাবে কাটবে। এখন সাতটা, চা খাব। চিঠি লিখে যাব আজ, আর অন্যদিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকব, আর তোমার দেওয়া ইয়া...বলতে থাকব। আটটার সময় ব্রেকফাস্ট করব, সাড়ে আটটা বা নয়টায় নাপিত আসবে, আর আমি একটা রাজকীয় সমারোহের মধ্যে দাড়ি কাটাব। আমাদের নিজের শেভ করা নিষেধ পাছে, ব্লেড দিয়ে আত্মহত্যা করি! এমনকি ফ্লাশের চেইনটা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুলে নেওয়া হয়েছে। হাতল টেনে ব্যবহার করি!! কিন্তু ঘরের ইলেকট্রিক পয়েন্টগুলো যা মানুষের মৃত্যুর প্রথম দুটির থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ও আরামদায়ক করতে পারে, সেগুলো সম্পর্কে কোনো সতর্কতা নেই!!! একেই বলে ফৌজি বুদ্ধি। তারপর সাড়ে ১০টার সময় গোসল করে কয়েক রাকাত নফল নামাজ পড়ে শুয়ে থাকি। একটার সময় উঠি ও দেড়টায় লাঞ্চ করি। হাতে খাই কারণ ছুরি কাঁটা ধারালো ও মারাত্মক! একটু বিশ্রাম, তারপর জোহরের নামাজ সোয়া দুইটায়, তা প্রায় সাড়ে তিনটায় শেষ করে আবার কিছুটা বিশ্রাম নিই (অবশ্য মনে মনে বিশ্রামের সময়গুলোতেও কোনো দোয়া আওড়াই)। সাড়ে চারটায় চা-সিগারেট খাই। তারপর পাঁচটায় আসরের নামাজ। ছয়টায় শেষ করে জানালায় দাঁড়াই মাগরিবের সময় পর্যন্ত। মাগরিবের পর সাড়ে সাতটায় রাতের খাওয়া ও বিশ্রাম। সাড়ে আটটায় এশা এবং তা ১০টা-সোয়া ১০টায় শেষ করে শুই। তখন এত ক্লান্ত থাকি যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। তিন বা সাড়ে তিনটায় ঘুম ভেঙে যায়। সব থেকে কষ্টদায়ক আমার বিশ্রামের সময়গুলো, যখন শুধু তোমাদের কথা মনে হয়। বেশ, এখন তুমি ঘড়ি দেখেই বুঝতে পারবে, আমি কখন কী করছি। তোমার সময় কীভাবে কাটে সেটা অবশ্য শুধু আমার কল্পনা। বিকেলে কি বাইরে যাও? যেয়ো প্রতিদিন, মন ভালো লাগবে। তোমার হঠাৎ চলে আসাকে সবাই কীভাবে নিয়েছে? কে কে আসল ঘটনা জানে? মা ও দাদা কি জানেন? না জানাই ভালো।

তুমি তোমার শরীরের যত্ন নেও তো? লক্ষ্মী, ভালোভাবে যত্ন নিয়ো। আমার বিষয়ে চিন্তা কোরো না। ইনশা আল্লাহ কিছুই হবে না। শুধু হয়তো কিছুদিন আমাদের এই পৃথক জীবন কাটাতে হবে। আমি যদি বিলেতে যেতাম

অপারেশনের জন্য, তাহলেও তো তোমাকে এইভাবে কাটাতে হতো। তা-ই মনে করে থাকো। আমার 'বন্ধুরা' বোধ হয় ভুলেও তোমার কাছে আসে না। অথচ এদের সম্পর্কে আমাদের কী উঁচু ধারণা ছিল, আর কতভাবেই না সাহায্য করেছি! দুঃখ কোরো না। এখন মানুষের আসল রূপ বুঝতে পারবে। এটা আমাদের পরবর্তী জীবনে চলতে সাহায্য করবে। ওদের সঙ্গে দেখা হলে না চেনার ভান কোরো। আবু বোধ হয় এত দিনে নতুন বাসায় গেছে। কোথায়? ওরা কেমন আছে? আশা করি, ওরা প্রায়ই আসে। ওদের আমার ভালোবাসা দিয়ো। আমার কেন জানি মনে হয়, গগু ভাই এ ব্যাপারে আমার ওপর খুব বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। সত্যি? ভাবি জেঙ্গি সম্পর্কে আমার মোটেও তা মনে হয় না। শুধু গগু ভাইকে ভয় হয়। আজ এখানেই শেষ করি। ভালোবাসা নিয়ো।

৪

১২ জুন '৬৮
সকাল নয়টা

আমি তাড়াতাড়ি আবুকে বন্দুকের লাইসেন্স পাঠিয়ে দেব। আশা করি, গাফফার এরই মধ্যে সব ব্যাগ নিয়ে এসেছে।

আব্বা-আম্মা এ মাসের শেষদিকে ঢাকায় আসছেন জেনে খুশি হয়েছি। এটা তোমার জন্য বড় সান্ত্বনা হবে। তাঁরা কত দিন থাকবেন? আমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করোনি এবং আমার অনুরোধ রেখেছ বলে আমি খুশি। নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে ওটা না করাই তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো। একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, যখন কেউ তোমাকে ডাকবে, খুব কাছের মানুষ ছাড়া আর কারও সাথে তোমার দেখা করা ঠিক হবে না। সবার ওপর ভরসা কোরো না। যখন আমাদের দেখা হবে, তখন তোমাকে বুঝিয়ে বলব খুব কাছের কেউ ছাড়া আমার বিষয়ে কারও সাথে আলোচনা কোরো না (শুধু আবু, খালা, মির্জা দুলাভাই বাদে)। আবু ও গগু ভাইকেও এটা বলো। গগু ভাই যেন তার বন্ধুর ব্যাপারে চুপ থাকেন। দুলাভাই তোমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন জেনে খুশি হয়েছি এবং আশা করি, তুমি যা লিখেছিলে, সে বিষয়ে এরই মধ্যে নিশ্চয়তা পেয়েছ। বাবু ও তাকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো।

আমাদের কবে দেখা করতে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছু জানি না। কিন্তু শুনেছি, খুব তাড়াতাড়িই দেবে। আমি এখন শুধু সেই দিনের

অপেক্ষায় আছি। আমি নিশ্চিত, আমাদের এই সাক্ষাৎ আমার জন্য সৌভাগ্য ও সান্ত্বনা বয়ে আনবে, যা আমার জন্য খুব প্রয়োজন।

সোনামণি বাবু এখন কেমন আছে? সে কি তার হারানো ওজন ফিরে পেতে শুরু করেছে? সে আর নতুন কী শিখেছে? যদি তুমি ছবি তোলার জন্য কাউকে না পাও, তাহলে দয়া করে স্টুডিওতে নিয়ে ওর ছবি তোলো এবং আমাকে পাঠাও।

সিগারেট আমার ব্যক্তিগত আনন্দের উৎস। মার্চ মাস থেকে সিগারেটের ব্র্যান্ড বদল করেছি, বেশি অর্থ ব্যয় করার পক্ষে এখন আর কোনো যুক্তি নেই। সামনের দিনে এক পেনি বাঁচানোর জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমরা তিনজন এখন থেকে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রার্থনা করে।

তুমি না বললে আমি ফ্লোরাকে চিঠি লিখতে পারি না। অনেক দিন তার কোনো চিঠি পাইনিও। সে কি তোমার সাথে দেখা করেছিল? তোমার ছোট বন্ধু ময়না কেমন আছে? গগু ভাই ও জেঙ্গিকে আমার ভালোবাসা। আবু ও জামান ভাই কেমন আছেন? তাদের প্রতি ভালোবাসা।

আশা করি, আল্লাহর কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছ। শিগগির ডাক্তার দেখাতে ভুলে যেয়ো না এবং পরবর্তী চিঠিতে আমাকে এ ব্যাপারে জানিয়ো। মায়ের দিকে খেয়াল রেখো এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ো। শিগগির আমাকে চিঠি লিখো।

অনেক অনেক ভালোবাসাসহ

তোমারই গুডু

৫

রাত আটটা
৫ আগস্ট

সোনামণি,

আজ কোর্ট বড় বোর ছিল। অসহ্য লাগছিল, শেষের দিকে গা, হাত-পাও খুব ব্যথা করছিল এবং জ্বর লাগছিল সারা দুপুর। এখন একটু ভালো লাগছে। তোরাও আজ নিশ্চয় পুরা বোর হয়ে গেছিস। কী ব্যাপার, তোকে একদিন থেকে আরেক দিন বেশি সুন্দর লাগে? আজ তোর চেহারাটার মধ্যে এত মধুর লালিত্য, শান্ত-সমাহিত ও পবিত্র ভাব লাগছিল। এক

কথায় অপূর্ব। আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। পেছনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। দেখে দেখে তৃপ্তি মিটছিল না।

আমাদের এখানে সবাই আমাকে ঠাট্টা করছিল। তোর বান্ধবীরা আমাকে নিশ্চয়ই ভীষণ হ্যাংলা মনে করে। কী বলে, জানাবি। আর তোর ডান দিকের ভদ্রমহিলা কে ছিলেন? খুব উগ্রভাবে সাজে। ওর উগ্র সাজের পাশে তোর সুরুচিসম্পন্ন সাজটা অদ্ভুত Contrast-এর সৃষ্টি করেছিল আমার চোখে। সোনা, আরও ভালো লাগছিল তোকে। ছুকরি, আজ যে বড় খোঁপা বেঁধে, আমার বলা সাদা ঢাকাই শাড়ি পরে এসেছিলি আর সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তোর সেই বারোয়ারি বেণি লাগিয়ে এসেছিলি? এবার থেকে যদি আজকের মতো খোঁপা বেঁধে না আসবি, তবে তোর সঙ্গে কথা বলব না। চাট্টি খাবি তার বদলে।

সেদিন সেই...পর থেকে শুধু আরও...ছিল বিশ্বাস কর। এ কথা...।

আমীর[১] ব্যাটাই কোহিনূর মণি। শয়তান একটা, তবে আশা করি Cross exam এ ধারা পড়বে ইনশা আল্লাহ। কাল...নাগাদ বোধ হয় শুরু হবে। আজ ফিরে আসার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখলাম, এখনো সঠিক বুঝতে পারছি না। Central IB-এর Chief Rizvi এসে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর শেখের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করল গোপনে। কোনো Settlement-এর জন্য More? আর কোনো যুক্তিসংগত কারণই তো দেখছি তার এই আলোচনার। অসম্ভব না ব্যাপারটা কাউকে বলবি না। আমাদের সাথেও না। দাদা চলে যাওয়ার পর কীভাবে একা একা আসবি জানাবি।

মেড়ো সম্পর্কে Paperটা আজ দিচ্ছি। ভালো করে পড়ে চিন্তা করে দেখবি। যেহেতু জেঙ্গির সঙ্গে তোর সব বিষয়েই আলোচনা হয়, সে জন্য ওকেও দেখাতে পারিস। আশা করি তোরা দুজনেই আমার সঙ্গে একমত হবি। ব্যাপারটা খুব Delicate কিন্তু আমি Frankly আলোচনা করে লিখব। আমার শুধু একটা অনুরোধ, তুই ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিস না তোর ওপর আমার Confidence নেই। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, আমার সম্পূর্ণ Confidence আছে, তবু লিখতে হচ্ছে ওর কথা ভেবে।

এ চিঠিটা কাল পাঠাইনি। আজ পাঠাচ্ছি। কবরীটা এখন কোথায়?

১. প্রাক্তন করপোরাল আমির হোসেন মিয়া। আগরতলা মামলায় রাজসাক্ষী।

আগস্ট ৯-১০

খুব মজার ছিল খাবারগুলো কিন্তু Just চাখা আর কি। কাল নিশ্চয় মজার খাবার আসবে। কিন্তু শুয়োরের বাচ্চা কাছে থাকলে হয়তো গন্ডগোল করবে।

Visit-এর ব্যাপারে আজ নিশ্চই Final Decision নেওয়া হয়েছে। কিন্তু Write করলে শুয়োরের বাচ্চাগুলো আমাদের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। তোমার নামে করলে হয়তো তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতেও দেবে না। তবু যদি Overall ভালো হয়, আমার আপত্তি নেই। দুলাভাইয়েরা[১] যা ভালো বোঝেন তা-ই করুন।

কতকগুলো সতর্কবাণী

১. কোনো সিভিলিয়ান বা অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া কারও সঙ্গে কেস সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ কোরো না। এখন কে যে আসলে কে বোঝার উপায় নেই।
২. অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, প্রত্যেক নিকট আত্মীয়ের ও বড় উকিলের চিঠি Postal Censure হচ্ছে, তাই By Post কিছু লিখো না। আব্বাদের কেস সম্পর্কে যেসব চিঠি আসবে সেগুলো খালাদের ঠিকানায় পাঠাতে বলো। আবু দাদাকে এ বিষয় অবিলম্বে সাবধান করে দিয়ো। দাদা বরিশালে গিয়েও যেন কারও সঙ্গে খোলা আলাপ বা মতামত প্রকাশ না করে। সর্বত্র এখন Spy।
৩. অপরিচিত লোক কোনো অযাচিত সাহায্য বা আলাপ করতে চাইলেই সন্দেহ করবে।
৪. কাউকে গাড়িতে lift দেবে না কোর্ট থেকে যাওয়ার সময়।
৫. Telephone-এ এ বিষয়ে কোনো আলাপ করবে না, বিশেষ করে দুলাভাই ও হাফিজ[২] সাহেবের বাসার নাম্বারে বা এমন কোনো কথাও আলোচনা করবে না, যা তোমাকে গোপনে জানাই।

সরকার এখন মরিয়া, কলকাতার চিঠিগুলোও বেনিয়াপুকুর ঠিকানায় না পাঠিয়ে অন্য ঠিকানায় পাঠাবে। অন্তত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীগুলো শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত। ট্রাংকলের সময় বিশেষ সতর্ক হয়ে কথা বোলো।

১. বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ।
২. আইনজীবী মীর্জা গোলাম হাফিজ (জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে মন্ত্রী ছিলেন)।

কাল তোর চিঠিটা পড়ে তোর জন্য দুঃখে ও সহানুভূতিতে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। তোর অপবাদের খবর শুনে আমি লজ্জায় ও দুঃখে মরে যাচ্ছি। এগুলো লেখার জন্য তোর ওপর আমার মোটেও রাগ হয়নি। সত্যকে স্বীকার করার মতো মনুষ্যত্ববোধ আমার হয়েছে এই কয়েক মাসে। আমি আর কোনো কিছুকেই ভয় করব না। এখন শুধু কাগজের পাতাই লিখে হয়তো তোকে বিশ্বাস করাতে পারব না। কিন্তু সময় যখন আল্লাহ দেবেন তখন এ সবকিছুর প্রতিকার আমি করব। ভুল আমি অনেক করেছি গত জীবনে, তোর মনেও অনেক আঘাত দিয়েছি। তুই সেসব কথা মনে করে যে দুঃখ পাস অনুতাপের আগুনে জ্বলে, তার থেকে শতগুণে বেশি জ্বালা আমি পাই। আল্লাহ সুবিচারক, তাই তোর প্রতি অন্যায়ের শাস্তি আমি পাচ্ছি, এটা আমার বিশ্বাস।

অনেক সময় বিশ্বাস কর, এভাবেই আমি নিতে চেষ্টা করি আমার এ বর্তমান শাস্তি, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহকে। অতীতের ঘটনাগুলো তোকে এখনো বিচলিত করে। তোর মনে হয় জীবনটা তোর ফাঁকির মধ্য দিয়ে কেটেছে। অতীতকে সহজে ভোলা যায় না, তাই সেই অসম্ভব অনুরোধ আমি করব না। তবে যদি পারিস আমাকে ক্ষমার চোখে দেখতে চেষ্টা করিস যে তোর মনে আঘাত দেওয়ার জন্য আল্লাহই আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন এবং আমাকে নতুন মানুষ করে তোর কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তোকে বারবার ক্ষমার কথা লেখার জন্য তুই অভিযোগ করেছিস, কিন্তু এটা মৌখিক না অন্তরের অন্তস্তলে। এ ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক বা বয়সের প্রশ্ন ওঠে না। তাই বারবার তোর কাছে ক্ষমা চাই।

আচ্ছা, তুই কি সত্যিই মনে করিস, আমার সঙ্গে তোর জীবনের সবটাই ফাঁকি? আমি জানতাম, এটার সবটা ফাঁকি না। আমি জানতাম, আমার মধ্যেও আমার আন্তরিকতা, আমার ভালোবাসার পরিচয় তুই পেয়েছিস। এটা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতাম, তাই মনে হতো তোর ওপর দাবি জানানোর এতটুকু অধিকার থাকলেও আছে। তাই হয়তো জানাতাম এবং এখনো জানাই। কিন্তু এখন দেখছি, সে অধিকারটুকুও আমার নেই। কীভাবে থাকবে, যেখানে আমার কাছ থেকে শুধু ফাঁকিই পেয়েছিস সে এখন কোন অধিকারে তোর ওপর দাবি জানাবে? তাই সেদিন নির্লজ্জের মতো যে দাবি জানিয়েছিলাম এত জোরে তা আমি উঠিয়ে নিলাম। সেই চিঠিটার দাবি জানানোর মতো সত্যিই আমার কোনো অধিকার নেই।

এটা অভিমান বা Sentiment-এর প্রশ্ন না, এটা যুক্তির প্রশ্ন। তাই যুক্তির মাধ্যমেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলাম ও লিখলাম। সে চিঠিগুলো সব পুড়ে ফেলিস ও ভুলে যাস। আমি কিছু মনে করব না। তোর কাছ থেকে এ সত্যটা

জানার পর আমার মনটা যেন কেমন ভেঙে পড়েছে। সব উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন উবে গেছে। সেখানে এখন প্রচণ্ড নিথর ভাব এসে পড়েছে। বারবার শুধু এই প্রশ্নটাই আমার মনে আসছে, সত্যিই কি আমি তোকে ফাঁকি দিয়েছি? আমার মন বলে না, কিন্তু তুই বলেছিস ফাঁকি। তুই Better Judge, এ ব্যাপারে তাই তোরটাই হয়তো সত্যি। আরও প্রশ্ন জাগছে, এই দীর্ঘদিনের ফাঁকিকে কি আমার সারা জীবন দিয়েও ক্ষতিপূরণ করাতে পারব। ভবিষ্যৎই হয়তো তা বলতে পারবে। তবে আল্লাহ যখন সুযোগ দেবেন, আমার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করব।

১০ আগস্ট
সকাল সাড়ে সাতটা

দুই বছর আগের এই দিনটার কথা হয়তো তোর মনে নেই। আজ আমরা গাড়িতে করে সাত দিনের ছুটিতে বরিশালে যাচ্ছিলাম কত আনন্দ করে! এ সময়টায় আমরা প্রায় মানিকগঞ্জের কাছে পৌঁছে গেছি। অতীতের সেই সুন্দর দিনগুলো বারবার মনে পড়ে এবং বড় কষ্ট দেয় মনকে।

গত সপ্তাহ থেকে কোর্টে তোকে দেখে এবং তোর মনের গভীরে কত ব্যথা লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরেছি, আর মনের সব শক্তি, সাহস ও ধৈর্য যেন একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। এত নিরাশ ও হতাশ ভাব কোনো দিন লাগেনি।

কয়েক দিন থেকে নামাজে একদম মন দিতে পারি না, আর পড়ার পর কিছুতেই আগের মতো শান্তি পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, অনেকটা নিয়মের মতোই নামাজে দাঁড়াই এবং কী যে পড়ি জানি না, অসংখ্যবার ভুল করি। মনে হয় নিজের মনকে নিজেই ফাঁকি দিচ্ছি। এটার জন্য আমার বিবেক আমাকে এত দংশন করছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পাচ্ছি না সেই একাগ্রতা আনতে। গত আট মাস এটার মধ্যেই সব মনের শান্তি ও শক্তি ফিরে পেতাম। এখন সেটাও হারাতে বসেছি, কেন জানি না।

সব সময় তোর ব্যথাভরা চোখের Expression আমাকে যেন পাগল করে তুলেছে। জানি না এ শাস্তি থেকে কবে আমাকে ও তোকে আল্লাহ মুক্তি দেবেন। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমি না-হয় আমার বহু ভুলের জন্য ও বহু পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে তুইও কেন পাবি? তুই তো তেমন কোনো ভুল বা পাপ করিসনি। তোর নিষ্পাপ সরল মনের ওপর কেন আল্লাহ এই শাস্তি দিচ্ছেন।

তুই লিখেছিস, তোর বাইরের হাসি দেখে লোকে বুঝতে পারে না, তোর মনের গভীরে কত ব্যথা ও ব্যর্থতার জ্বালা আছে। তাই জগতের সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারবি না। আমাকে পারিস না। তোর এই ব্যথা আমাকে না বললেও আমি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারি এবং কী জ্বালায় যে আমি ভুগি, তা তোকে কীভাবে বোঝাব। আমার নিজের এই দুঃখ-কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয় না, আমার ব্যথা তোর ব্যথায় সম্পূর্ণভাবে। প্রতি মুহূর্তে তোর মনের কথাটা ভেবেই আমার সব দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু এত করে লিখেও জানি কোনো ফল নেই। চিঠিটার পাতায় এই অক্ষরগুলো তোকে তোর মনের শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে না, তবু বারবার লিখি। লিখলে মনের ভাবটা যেন কিছুটা কমে।

এই নিরর্থক কথাগুলোর Repeatation-এ তুই বোধ হয় বিরক্ত হোস, কিন্তু আমি না লিখে থাকতে পারি না। তোকে কোর্টে দেখে দেখে আমার যেন তৃপ্তি মেটে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে তোর পাশে বসি এবং তোকে আমার সমস্ত প্রাণের ভালোবাসা দিয়ে তোর মনের ব্যথাকে ভুলিয়ে দিই। আমি সব সময় ওভাবে তোর দিকে তাকিয়ে থাকি বলে তোর কি বিরক্ত লাগে? আমার মনে হয় বিরক্ত হোস মাঝে মাঝে আমার এ নিরর্থক হ্যাংলামিপনায়। কিন্তু নিজের অজান্তেই কখন ঘাড় ফিরিয়ে তোকে দেখতে থাকি বলতে পারি না। তুই বিরক্ত হোস না লক্ষ্মী। তুই থাকলে কিছুতেই আমি না দেখে থাকতে পারি না।

গতকাল বুঝতে পেরেছিলাম, তুই কোর্টরুমে না থাকার মানে কত গভীর আমার কাছে। পরশু শুনলাম, তুই আসবি না; জানার পর থেকে কোর্টে যাওয়ার সব আনন্দ আমার চলে গিয়েছিল। নিতান্তই যেতে হয় বলেই গেলাম। তোর আমার পাশে উপস্থিতি কতটা যে আমার মনে বল আর সাহস জোগায়, সেটা বুঝতে পারলাম তোকে হঠাৎ দেখে। কী আনন্দ আর উৎসাহ যে এসেছিল তা তোকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তোর তো সব দিন আসা আর সম্ভব হবে না বা উচিতও হবে না। কারণ এটা যে তোর পক্ষে কতখানি ক্লান্তিকর, তা তোর মুখ দেখেই বুঝতে পরি। Recess-এর আগ পর্যন্ত তোর মুখের হাসির মধ্যে, বসার মধ্যে সজীবতা থাকে কিন্তু তার পর থেকে তুই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়িস। তখন আমার ভীষণ মায়া লাগে তোর জন্য। তখন আমার মনে ভীষণ অনুতাপ হয় যে তখন আমার জন্য তোর এ ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়।

আচ্ছা, পরশু দিনের *আজাদ* দেখেছিস, তোর আমার সম্পর্কে লেখা। তুই

সেই তরুণী বধূ ও আমি সেই ক্যাপ্টেন স্বামী! খুব সুন্দর লিখেছে। পড়তে পড়তে আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। দেখ, লোকে তোকে দেখে কত মায়া করে, কত আকর্ষণ বোধ করে, দেখলি তো। আরও কত আসে প্রতিদিনই কিন্তু তাদের কথা লিখল না—আমি যে কয়েক দিন আগে লিখেছিলাম তোকে সব থেকে Attractive Graceful মনে হয়, ওদের মাঝে সেটা কত সত্য, এবার প্রমাণ পেলি তো?

তুই যে আমাকে কত ভালোবাসিস, সেটা কত প্রকাশ্য Expression-এ তা প্রতিটি লাইনে ফুটে উঠেছে। কিন্তু রিপোর্টার বেটা বোঝেনি, আমিও তোকে কত ভালোবাসি—সারাক্ষণ তোকে ফিরে দেখি, Recess-এর সময় শুধু তোকে ভালো করে দেখার লোভে বাইরে চা খেতেও যাই না, যদিও খুব ইচ্ছা করে। বেটা Partial। দেখা হলে বলব ওকে, কিন্তু তোর জন্য আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

অপবাদের কথাটা তুলে ভালোই করেছিস, আমি তোকে ওটাতে বলিনি যে আমার সব থেকে বড় ভয় ও আতঙ্ক ছিল নিজের ঘর সম্পর্কেই। বাইরে কে কী বলে তার খুব একটা তোয়াক্কা করি না, যদিও ফেব্রুয়ারির ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনো খোলা আলোচনা হয়নি, তবে একদিন কেন যেন মনে হয়েছিল, তারা এ ব্যাপারটাকে খুব একটা সহানুভূতি বা সত্যের দিক থেকে নেয়নি যদিও 'কসম' করে বলছি একটা কথাও বলিনি কিন্তু আমার Sixth sense বলছিল তাদের যে উদারতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপারটা নেওয়া উচিত ছিল সেটা Missing দেখলাম এবং মনে মনে খুব রাগ ও দুঃখিত হয়েছিলাম। এখন দেখছি, আমার Intuitionটাই Corrtect হলো। তাদের এই অনুদারতার জন্য আমি কতটা লজ্জিত ও দুঃখিত, একটু বুঝতে চেষ্টা করিস। এটা বোঝার পর থেকেই আমার ভয় আরও বেড়ে গিয়েছিল।

তোকে যে এরা কেউ অন্তর থেকে নেয়নি, সেটা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে এবং তার জন্য আমার মনটাও যে কত ছোট ও দুঃখিত, তারা হয়তো তা বুঝতেও পারেন না বা চেষ্টাও করেন না। অন্তত তুই আমার জীবনে কত মূল্যবান এবং তোকে আমি কত ভালোবাসি, তা যদি তারা আগে না বুঝেও থাকে, এ কয় মাসে তা বোঝা উচিত ছিল। কারণ তাদের কাছে আমার লেখা প্রতিটা চিঠির মূল কথাই ছিল তোর সম্পর্কে। জামান ভাইকে আমি যেটা লিখেছিলাম তোর সম্পর্কে, সেটা জামান ভাই তাদের পড়ে শুনিয়েছেন, নিদেনপক্ষে সেটা পড়ার পর আমার মনোভাবটা বোঝা উচিত ছিল। আমি সত্যি করে বলছি, যদি আমার জন্য তারা এর শতভাগ কম

উৎকণ্ঠাও দেখাতেন আর তোকে তার পরিবর্তে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দেখাতেন। তবে আমি এখনকার থেকে শতগুণে বেশি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করতাম তাদের।

আমার অনুযোগ-অভিযোগ সময় এলে নিশ্চয় বলব। তাদের বোঝা উচিত, তোর দুঃখ-কষ্টই আমার দুঃখ-কষ্ট। তোর অবমাননাই আমার অবমাননা—এই সহজ কথাটাই কেন তারা বুঝতে পারে না বুঝি না। জোর করে বা যুক্তি দিয়ে কখনো এগুলো লাভ করা যায় না। যাক, চেষ্টা করিস এটা নিয়ে মন খারাপ না করতে। আল্লাহ আমায় মুক্তি দিলে ইনশা আল্লাহ তোর সব দুঃখ-কষ্ট ভোলানো এবং তোকে সর্বতোভাবে সুখী করাই এখন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেটা যত মূল্যেই কিনতে হয় না কেন, সেটা আমি দ্বিধা করব না। শুধু আল্লাহ রসুল ও গাউসপাকের কাছে এখন আমরা দোয়া চাই, আমাদের জীবন যেন আবার একত্রে মিলিত হয় এবং আমাদের জীবনে যেন আবার সুখ-শান্তি ফিরে আসে। এ ব্যাপারটা শুধু তোকে জানাবার জন্যই লিখলাম।

আমার সেদিনের অনুরোধটা অসংগত হলেও তোর কাছে ভিক্ষা চাই সে অনুরোধটা রাখিস। এদের মুখ থেকে সে অপবাদ শোনার থেকে আমার মৃত্যুও শ্রেয় হবে, তাই তোর কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি; আর আমি জানি, তুই সেটা রাখবি।

আজ বিকেলের কথা চিন্তা করলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে, আমি আর তুই দুজনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মিলিত হব। কিন্তু দু-চারটা কথা বলার বেশি হয়তো সুযোগই হবে না—মাত্র ২০ মিনিট সময়। এ সময়ের মধ্যে মা, দাদা-আবুর সাথেও কথা বলতে হবে। আমার থেকেও তোর মনে কত দুঃখ লাগবে, সেটা বুঝি এবং আমারও কেমন লাগবে, সেটা বুঝতে পারিস। এটা বুঝেই কাল শুয়োরটার সঙ্গে আধা ঘণ্টা তর্ক করেছিলাম। কিন্তু বোধ হয় আমাকে Mental Torcher-এর সুযোগটা ছাড়ল না। কাল সন্ধ্যায় রাগে ও দুঃখে পাগল লাগছিল। আমার সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছিলাম দুটো টাইম নেওয়ার জন্য কিন্তু জারজটা দিল না। আল্লাহ ওর বিচার করবেন। শেষের দিকে অপ্রকৃতিস্থের মতো তর্ক করছিলাম।

দাদাকে গতকাল বলেছিলাম, যত দিন আল্লাহর ইচ্ছায় মাইনা পাচ্ছি জুনিয়ার উকিলের ২০০/- আমি দিই কিন্তু উনি শুনে রেগে গিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে তোকে জিজ্ঞাসা না করেই বলেছিলাম হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়। আমার বিবেকে কেমন জানি লাগছিল সে সময়। আল্লাহর দয়ায়

মাইনা বন্ধ না হলে আমি শুকরিয়া জানাব তার দরগায়। আশা করি ইনশা আল্লাহ হবে না। ১৫ই ১০ টাকার প্রাইজবন্ডের Draw। যত টাকা এখন তোর হাতে আছে, আল্লাহর নাম নিয়ে কিনে ফেল। ফল বার হওয়ার পর ৩০০ টাকা বাদে বাকি ক্যাশ করে নিস। Insuranceটা কি Revive করা হয়েছে? সেদিন তুই কী জানি বলছিলি Record player কেনার কথা, আমার জন্য for God's sake, এমন করিস না। রেডিও তো আছেই আমার কাছে। ও, প্রতিদিনই তো রবীন্দ্রসংগীত শুনছি। পাইপটা হলেই সিগারেটের খরচ বাঁচবে। জলদি পাঠাস। এখন তোকে একটা নয়া পয়সা বাঁচাতে...দিলেও আমি শান্তি পাই ও পরিতৃপ্তি পাই। সে জন্য আমার কথা ছাড়া Please কোনো দামি জিনিস কিনিস না। Cussons-এর বদলে Lux ব্যবহারই আমার পক্ষে শ্রেয়। Please ভুল বুঝিস না বা রাগ করিস না। সত্যিই তুই আমার না বলাতে এসব টুকিটাকি নিয়ে আসিস। আমি যে কত পরিতৃপ্তি পাই তা বোঝাতে পারব না। আমার লেখার উদ্দেশ্য, টাকার ব্যাপারে এখন আমাদের Sentimental না হয়ে Practical হওয়া উচিত। তোর হাতে সব দেনা দিয়ে এখন কত জমেছে, জানাবি।

গতকাল কোর্ট থেকে ফিরে এতুর ছবিগুলো দেখছিলাম এবং মনটা ওকে কাছে পাওয়ার জন্য ওর হাবলা মার্কা মুখটাতে কটাস করে কামড় লাগানোর জন্য এবং বুকে জোরে চেপে ধরার ইচ্ছা করছিল। ENT ওর সম্পর্কে কী রিপোর্ট দিল সবিস্তারে জানাস সোমবার।

গত সপ্তাহের তিনটা বড় চিঠিতেই বুঝতে পারছি দু-তিনটা Details ব্যাপার এখনো জানাসনি। গতকাল আলমের সাথেও কথা বলে আমি Sanguin হলাম। আলম ও মোস্তাফিজ[১] তোদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আসলে সে শয়তানটাকে সাহায্য করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। আর তোকে দরকার পড়লে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই টেপ করেছিল (যদি একান্ত করেই থাকে টেপ, আমার ও জামানের সন্দেহ আছে এ বিষয়ে। খুব সম্ভবত শুধু মনিটর করে তোদের কথা শুনত টেপের নাম করে) সব হারামজাদা এক। এই মোস্তা...স্টুয়ার্ট মুজিবকে আমার ও জামানের নাম বলার জন্য ডিসেম্বর মাসে মারপিট করেছিল। ও অবশ্য বলেনি, প্রথমে...হোসেন ও পরে...রমিজ ও আলিম বলেছে আমাদের নাম। আজ শুনলাম হোসেনের সাহায্য ছাড়া কেস

১. বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান (পরে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে মন্ত্রী)।

খাড়াই করতে পাচ্ছিল না এবং চিঠিগুলো এখান থেকে লেখা Approver-এর লোক দেখিয়ে নিয়েছে। যাক, এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলিস না, আমার সঙ্গেও না—জামান থাকলে সামনে। ও থাকলে আমি যেসব কথা তোকে গোপন রাখতে বলি সেগুলোও বলবি না কিন্তু তোকে না বলে পেটের কথাগুলো বলতে পারি না রে। এগুলো শুধু সব তোর জানার জন্যই।

হাফেজ সাহেব ও সাইফুরের মুখে শুনলাম, গত কয়েক দিন থেকে তুই কেস সম্পর্কে খুব ঘাবড়ে গেছিস। কেন রে? খারাপ কিছু Development হয়েছে নাকি? আমার তো ইনশা আল্লাহ খুব Confident লাগছে। একমাত্র আলিমের সাক্ষ্যতে কিছু হবে না ইনশা আল্লাহ। ওকে ধরার মতো বহু Point দিয়েছি। রমিজেরও সেই অবস্থা, তা ছাড়া দুজনেই Approver। এখন পর্যন্ত একটা মাত্র Independent witness Lutful Huda, কিন্তু জারজটাকে জীবনে দেখিওনি। আমাকে খুব সম্ভব চিনতেই পারবে না ইনশা আল্লাহ। আর তা ছাড়া ও Independent witness হতে পারবে না। ও বিরাটভাবে Involved। বাকি থাকল..., ওটা তো হাফেজ সাহেব নিজেই বলেছেন। আমিও বই থেকে যা বুঝলাম, বিন্দুমাত্র বিচার থাকলেও ওটা টিকবে না। নতুন কোনো সাক্ষীও আনেনি। ইনশা আল্লাহ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আনবে না।

শুধু Approver-এর কথাতে কখনো Conviction হয় না। সেটা একটাই হোক বা ৫০টাই হোক, ওদের Value একই। Approverদের সম্পর্কে এখানে লেখা আছে, জজদের চোখে ওরা Immoral and Purger এবং সে জন্য ওদের কথাতে কখনো Conviction হয় না। তা ছাড়া এদের বিরুদ্ধেও তো অনেক অকাট্য যুক্তি আছে। তবে কেন চিন্তা করিস। শুধু সময় কত নেবে এটাই চিন্তা—আমাদের সবার মতে তো পাঁচ-ছয় মাসের বেশি লাগা উচিত না। তার ওপর সেদিন যে ঘটনাটা জানিয়ে দিলাম, সেটাও একটা বিরাট সম্ভাবনাময়। আল্লাহর ও ওয়াজপাকের কাছে দোয়া চা, সেটা যেন সত্যি হয়। পরের দিন উনিও Indirect hint দিচ্ছিলেন কিন্তু এটা একদম গোপন রাখ ও দোয়া করে যা, নেয়ামুল কোরআনে আছে স্ত্রী ও বাবার দোয়া সব থেকে বেশি সহজে কবুল হয়।

আরেকটা কথা যেন ভুলিস না, হুজুরপাক বারবার এত আশ্বাসবাণী বৃথায় দেন না। নিশ্চয় এটার গভীরে গভীর তাৎপর্য ও অর্থ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর পাক মুখের বাণীকে সফর করবেন। তোর মুখ ও মনের অবস্থা এ রকম দেখলে আমি আস্থা হারিয়ে ফেলি। এত দিন কষ্ট করলাম আর কতগুলো দিনও তেমনিভাবে কষ্টভাবে সহ্য কর।

আর আল্লাহর রহমতে আগের থেকে এখন কত ভালো সব দিক। সেই বিভীষিকাময় সেই প্রথম পাঁচ মাসের কথা চিন্তা কর তো। এখন তার ইচ্ছায় প্রতিদিনই দেখা হচ্ছে, মনের সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখছি। দেশের লোক ভালোভাবে ব্যাপারটাকে নিয়েছে। চারদিকে আশার বাণী। আল্লাহ আর এর থেকে কত বড় শাস্তি ও দুঃখ কত দেবেন—সব ভুলের ও গুনাহর শাস্তি দিয়ে দিচ্ছেন এর মধ্যেই। জেল থেকে অনেক কষ্টকর মানসিক দিক থেকে এখনকার শাস্তি। আল্লাহ কখনো অবিচার করেন না। এই শাস্তির মধ্যেই আমি মুক্তি দেখতে পাই। আজ এত দিনে যা শিখলাম ও বুঝলাম, মুক্তির পর আমি ইনশা আল্লাহ তোকে সব থেকে সুখী স্ত্রী করব—এই আমার পণ। তুই মন খারাপ করিস না। তুই ঘাবড়ে যাস না। তোর মুখের হাসি ও অন্তরের হাসি ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত কর।

কেস সম্পর্কে আমি যা বললাম তোকে, দুলাভাই ও হাফেজ সাহেবের কাছ থেকেও একই কথা শুনতে পারবি। মহা অবিচার না হলে আল্লাহ ও পীর-মুরশিদদের সদকায় ও তোদের সবার মিলিত দোয়ায় আমি নিশ্চয় মুক্তি পাব। শুধু মাঝের এ কয়টা দিনের কষ্টকে একটু মুখ বুজে ও আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সহ্য কর। এই সবুরের ফল আল্লাহ শতগুণে ভালো দিন দেবেন আমাদের। আমার সাধারণ বিশ্বাস ও বুদ্ধি তা-ই বলে।

আম্মার চিঠিতে তোর থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর খোলা মতামত জেনে আমি অনেকটা শান্তি পেলাম। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানাবি। পরে লিখব।

মিরপুর মাজার শরিফে কি হাজির হয়েছিলি? আমিন সাহেবের বাসায় যতখানি গোপনীয়তা নিয়ে যাওয়া যায় যাস। তাকে আমার সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানাবি।

তোকে চিঠি লেখার মধ্যে থেকে যে কী আনন্দ পাই, কীভাবে তোকে বোঝাব। আমি আমার সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই তখন মনে হয়, তুই আমার কত কাছে; তোর সঙ্গে যেন একতরফা আলাপ চালাচ্ছি। এখন বেলা প্রায় একটা হয়ে গেছে কিন্তু লেখা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজ আমরা তিনজনে ব্যস্ত লেখাতে। সবাই সবাইকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করছি। History লেখা কত দূর হলো বলে আজ বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে বড় চিঠি লিখলাম। সোমবার থেকে আবার ইনশা আল্লাহ তোকে আগের মতো হাসিখুশি উৎফুল্ল ও প্রাণময় দেখতে চাই।

গতকালের চিঠিটা পেয়েছিস। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, শয়তানটা কোনো অশোভন আচরণ করেছে। রাগে জ্বলে যাচ্ছিলাম। সোমবার জামান

ওকে ডেকে নেবে, ওর আবার ক্লাসফ্রেন্ড। কোর্টে কোন বান্ধবীকে কী রকম লাগে, জানাস। এখন তো তুই আলাপ করতে ওস্তাদ হয়ে গেছিস, তোর (প্রিয় Phrase) Stuckup ভাবটা নেই। কড়া মহিলাটা কে, ওর সঙ্গে দেখি তোর খুব খাতির। শান্তর সঙ্গে এখন বোধ হয় তোর সহৃদয় ভাব, ঠিক না? কামালটা কে, শেখের ছেলে? কোর্টে কারও সঙ্গে কেস ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করিস না। শুয়োরের দলে টিকটিকিতে বোঝাই। এই সতর্কটা বিশেষ করে দাদার জন্য। আমাদের পাশেই যে তিন চিড়িয়া বসে, ওরাও। ভেতরে ও তোদের গ্যালারিতে অসংখ্য বসা থাকে।

১:৩০

এইমাত্র...এসে বলে গেল Lawyer affidavit করতে আসবেন। তার মানে Write সম্পর্কে Final decision হয়ে গেছে। খুব টন্ট করে জিজ্ঞাসা করল 'Are you all prepared to receive your guest'। খুব চেঁচিয়ে দুই Pause দিয়ে উত্তর দিলাম, Yes we are ready।

জেঙ্গিকে বোলো, আমার জন্য দু-একটা জবাকুসুম আনতে। আমার আংটির মাপ কোথায় পেলি? কুদ্দুস সাহেবের লেখা তোর কোষ্ঠীটা দিলাম সঙ্গে। আশ্চর্য, আমারও সেই দিক থেকে ভাগ্য ভালো হবে বলেছেন। তোর হাতে তো হীরা আছেই। পাথর পরতে কোনো আপত্তি নেই জেনে সুখী হলাম। জেঙ্গিকে Advance টাকা দিলে জামানের জন্য একটা শাপমোচন আনবে।

তুই মন খারাপ করে থাকিস না..., কোর্ট শেষ হলেই তুই বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠিস কেন রে? আমার তো ফিরতে ইচ্ছে করে না। আজকের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করছি। ভালোবাসা নিস।

এত বিরাট চিঠি পেয়ে তোর Reaction কী হলো, জানাস। তোকে খুব অসম্ভব ভালোবাসি রে, সোনা।

গুড্ডু

৭

রাত আটটা
১৪ আগস্ট

নীলু সোনা,

আগামীকাল তোর মনটা যে কত খারাপ থাকবে, তা চিন্তা করে আজ আমার সারা দিন ভীষণ খারাপ লাগছে। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে, কাল তোর মনটা কত ছোট আর অসহায় বোধ করবে। আমার মনের আজ এই Depression নিয়ে লিখতাম না তোকে, কারণ চিঠি লিখতে গেলে তার Reflection আসত এবং তোর মন খারাপ করত। কিন্তু তবু লিখছি, আমার চিঠিটা পেলে তোর মনটা একটু ভালো লাগবে। দু-এক দিন পরে দেখবি, আবার তোর মন ঠিক হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া ২৫-২৬ তারিখে তোর আব্বা আসবেন। তখন আবার তোর ভালো লাগবে। এ কয়টা দিন একটু মন ভালো রাখতে চেষ্টা করিস। আমি খুব দুঃখিত, আম্মাকে যাওয়ার আগে লিখতে পারলাম না। সেদিন আব্বুর চিঠি লিখতেই রাত ১২টা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আজ হাফেজ সাহেব এলে দিয়ে দেব। পৌঁছে উনি ফোন করলে আমার সালাম জানাবি আর আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিস। দু-এক দিনের মধ্যেই ওনাকে লিখব।

গতকাল আমি সম্পূর্ণভাবে Shocked হয়ে গিয়েছিলাম তোর হাতটা লক্ষ করে। তুই যে এত শুকিয়ে গেছিস, এর আগে চোখে পড়েনি। তোর হাতটা দেখে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। আমি সমস্ত কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া চাই, তোর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। তোকে আমার সমস্ত প্রাণের কসম দিয়ে বলছি, তুই অবশ্য অবশ্য শরীরের যত্ন নিস। আমার কথা রাখিস, লক্ষ্মী। তোর শরীরটা ভালো কর। তুই এখন আমার জীবনের একমাত্র আশার আলো। এখন তোর শরীর যদি ভালো না থাকে তবে বল, কিসের আশায় আমি বাঁচব। তুই যত্ন নিলেই দেখিস ইনশা আল্লাহ তোর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

নতুন Developmentগুলো আমার মনের ওপর আরেক নতুন দুঃখের ও চিন্তার বোঝা এনেছে। গতকাল আবুর দুই মিনিট কথা বলার ধরন দেখেই বুঝেছি, যা সব জানিয়েছিস, তা কত সত্য। দেখা যাক, কাল ও কী জবাব দেয়। আমার চিঠিতে যত দূর সম্ভব নরম থেকেছি। কিন্তু দুটো ব্যাপারে গুরুত্ব বুঝে কী করব, দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। আমি চাই, আগামী শনিবার

দুটো বিষয় ওর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা, ওর Final মত জানতে। টাকাপয়সার ব্যাপারে ওকে Frankly বলে দেব, যদি অসুবিধা থাকে জানাতে। আমি ঠিক করেছি, ওকে বলব, 'যদি তোমাদের অসুবিধা থাকে, তবে আমাকে এখনই Openly বলে দাও, আমি নীলুকে বলে দিচ্ছি, ও গয়না বিক্রি করে (আসলে না) সম্পূর্ণ টাকাটা হাফেজ সাহেবকে দিয়ে দেবে। আর যদি তোমাদের অসুবিধা না থাকে, তবে Frankly বলে দাও আর আমাকে এ বিষয়ে হাফেজ সাহেব বা ...কাছ থেকে যেন কোনো কথা শুনতে না হয়।' তোর এ বিষয়ে কী মতামত বা আমাকে কী বলাতে চাস, বুঝে শুক্রবার কোর্টে জানাস। আমি সেই মতেই ওর সঙ্গে কথা বলব। আমি চাই সেই কথার সময় তুই উপস্থিত থাকিস। সেই Discussion-এ যা ঠিক হয়, তোর সামনেই হবে। তাতে তোর সুবিধা হবে পরে। যাক, এ সম্পর্কে Indetail আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাস এবং Alternative হিসেবে তোরা কিছু ঠিক করেছিস কি না, তাও জানাবি।

আর আবুকে এটাও জিজ্ঞাসা করব, সেই Family meeting-এ তোকে কেন নেওয়া হয়নি? আমিও এখন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, ফুপাই এই সব বদ বুদ্ধি ওদের মাথায় ঢুকিয়েছে। ও হাফেজ সাহেবের Calibre সম্পর্কেও নিশ্চয় বলেছে কোনো বাজে কথা। তবে তুই নিশ্চিন্ত থাক, ইনশা আল্লাহ তাকে Change করতে দেব না কিছুতেই। আর সাইফুর সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে না, ও বোধ হয় ফিরে গেছে। যেহেতু Writ-এর উপদেশ দুলাভাই ও হাফেজ সাহেবের মুখ দিয়ে বার হয়েছে, সে জন্যই ফুফা বোধ হয় ওদের মনে ভাঙানি দিয়েছেন। আমি এ বিষয় Sure। Indirectly আবুকে এ বিষয়ে Hint করেছি।

ISI-এর সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানার পর বুঝলাম, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তা-ই সত্য। সে কুত্তারা তোকে মুশকিলে ফেলার জন্যই এগুলো করেছিল। যাক, আল্লাহর মেহেরবানিতে সব মানসম্মান বেঁচেছে। তা-ই যথেষ্ট, আপাতত এ বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো। আল্লাহ সময় দিলে এর প্রতিশোধ নেব আর সে শয়তানটা যদি সে সময় পর্যন্ত এ দেশে থাকে, ওকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। ও! মানুষ যে কত বড় শয়তান ও পিশাচ হতে পারে, তা বুঝলাম। ইংরেজি Applicationটা পাঠালাম জামানকে। ওটা দেখাইনি বাইরে যাবার কথা আছে বলে। তোর বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা আর কে কে জানে, জানাস। জামানকে আমি বলেছি, সমস্ত ঘটনাটা বাড়িতেই ঘটেছিল তোকে একা পেয়ে। আবু কতখানি জানে? আবার April মাসে কি তুই

একবার মোস্তাকে[১] আমার খবর নিতে বলেছিলি? শেষ যেদিন আলম-মোস্তাকে বার করে দিস অপমান করে, সেটা কবেকার ঘটনা—May-এর মাঝামাঝি? সব শয়তান সব কুত্তা, মেড়ো বাপদের সন্তুষ্টির জন্য তোকে মিছে নাজেহাল করেছে।

গত শনিবার তোর কাছ থেকে আশ্বস্তি ও কথা পাওয়ার পর থেকে আমার মনের গুরুভারটা নেমে যাওয়ায় এত শান্তি পাচ্ছি, বলতে পারব না! আমার অনুরোধ রাখার জন্য তোর কাছে কৃতজ্ঞ। আর দেখলি তো, আমার বোঝার শক্তি ও দূরদৃষ্টি কত প্রখর! Credit দিস আমার বুদ্ধির? ভাগ্যিস, সে সময়েই চলে গিয়েছিল, নইলে তুই সতর্ক হওয়ার সময় পেতি না। আর ভাগ্যিস, ...তবে আরও বেড়ে যেত। যাক, আল্লাহর দয়ার এই বিপদটাও কেটে যাওয়ার জন্য শোকর করি।

এতুমণির নাকটা কেমন, জানাস। আবার কবে নিতে হবে ওকে ENT specialist-এর কাছে? ওকে আদর ও চুমা দিস।

বাড়ির ব্যাপারে যে Pointটা দিয়েছি, হাফেজ সাহেব যদি সেটার Importance দেন, তবে তোকেই যেতে হবে বাড়িওয়ালির কাছে। ওর ভাই এসে বলতে পারবে। যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে Fully briefed হয়ে যাস। আচ্ছা, বইয়ের ট্রাংকগুলোতে আমার কয়েকটা ফাইল ছিল। ওগুলোর দরকার হয়ে পড়েছে বাড়ি সম্পর্কে জানার ও TA Billটার জন্য।

কী ব্যাপার, তোরা সব ফৌজি বউরা আবার একটা ভিন্ন গ্রুপ করে ফেলেছিস দেখি। আমরা কিন্তু বেশ মজা পেয়েছি তাতে। শালার নেভিই তো আমাদের ডোবাল।

আচ্ছা, সেদিন দুলাভাইয়ের কাছ থেকে যে খবরটা শুনেছিলি, তার কি আর কোনো কিছু হলো? আল্লাহর ইচ্ছায় তা সত্যি হলে তা কত ভালো, তাই না? দুলাভাই ও বুবুকে আমার সালাম জানাস।

কাল সব খবর জানাস, তবে বেশি বড় করে না লিখলেও চলবে। কারণ এখন মনে হয় বড় চিঠি লিখলে তোকে অনেক পরিশ্রান্ত হতে হয়। আমার ভালোবাসা নিস।

গুড্ডু

১. লে. কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান (জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে মন্ত্রী)।

৮

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
রাত নয়টা

সোনামণি,

গতকাল সারা রাত ঘুমাতে পারিনি মশার কামড়ে; হঠাৎ দু-তিন দিন থেকে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার দুই প্যাকেট Globe পাঠাস, মশারি টানানো অসুবিধা। তোর অসুবিধার কথা জেনে প্রতি সপ্তাহে খাবার আনতে বলার জন্য খারাপ লাগছে, আর এ নিয়ে ব্যস্ত হোস না। সত্যি, কাল দেখলাম তোর শরীর খুব শুকিয়ে গেছে। আর প্রতি রাতে Valium খাস শুনে চিন্তিত হলাম। please প্রতি রাতে খাস না। অভ্যাস হয়ে গেলে পরে ছাড়তে পারবি না। শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। ওটা খাওয়া ছেড়ে দে।

আজ তোর মন খুব ভালো নিশ্চয়ই আব্বা আসার জন্য। আশা করি, উনি আল্লাহর মর্জিতে ভালোভাবে পৌঁছাবেন। ওনাকে আমার সালাম দিস এবং সব খবর জানাস।

তাড়াতাড়ি আয়া রেখে নিস, নইলে তোর এ অসুস্থ শরীরে বাচ্চা রাখা মুশকিল হবে। বন্ধের এই এক মাস কীভাবে কাটাব সেই চিন্তাতে খারাপ লাগছে। এখন এত বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে, কোর্টে সপ্তাহে পাঁচ দিন দেখা হওয়ার পর, এখন সপ্তাহে মাত্র একবার দেখে সহ্য করতে পারছি না। ভীষণ খারাপ লাগছে। আবার সেই হতচ্ছাড়ার censure করা সপ্তাহে একটা চিঠি। এবার থেকে by post করা চিঠিগুলোতে শুধু সাধারণ খবরাখবর ছাড়া আর কিছু লিখিস না। আমি চাই না সেই হতচ্ছাড়া আমাদের Intimate চিঠিগুলো আবার পড়ে। যদি সম্ভব হয় কিছু ইংলিশ ও বাংলা গল্পের বই জোগাড় করিস এই এক মাসের জন্য। আলীমের witness আশা করি তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। তাই কেস সম্পর্কেও আর নতুন কিছু করার বা লেখার থাকবে না। তবে একটা ভালো গুজব শুনছি তখন আমাদের অন্যান্য রুমের সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবে।

আমার নতুন Hair styleটা কেমন লাগল, বললি না তো? আমার কাছে নিজেকে তো ভীষণ Handsome লাগছে, আর তার ওপর বন্ধের সময়, এর ওপর আবার Frenccut দাড়ি দারুণ লাগবে। তোর মত আমাকে জানাস।

গতকাল কেমন লাগল? আমার খুব ভালো লেগেছে। নিজের বয়স না হলে ভালো জমে না।

আজ রাতের রেডিও থেকে শোনা কতগুলো খবর ও তার বিশ্লেষণ :

কাটা খাঁ আর তার বাপ বুটা খাঁর সঙ্গে আনাজ (তরকারি) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পিন্ডি শরিফ গেল। হঠাৎ? আর জগতের সবকিছু বাদ দিয়ে আনাজ সম্পর্কে? কয়েক দিন আগে বুটার দক্ষিণ হস্ত আলতাফ গওহার এসে গেলেন এবং তার ডেপুটি একজন বিশ্বস্তকে বলে গেছেন, দেশের Reaction দেখে সে হতাশ। এটা সম্পর্কে জানতে আসাই তার উদ্দেশ্য ছিল। মোসেস কয়েক দিন আগে এসেছিলেন এবং কাটা খাঁও তাকে দেশের অবস্থা জানিয়েছিল। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে খবর দিল, কিছুদিন আগে বুটাকে দেশের লোকে আসল মনোভাব সত্যিকারভাবে প্রথমবারের মতো জানানোর জন্য বুটার কাছ থেকে ধন্যবাদ পেয়েছে। এসবের পর আজ হঠাৎ কাটা খাঁ আনাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাওয়া কেমন অস্বাভাবিক, বিশেষ করে দীর্ঘ নয় মাস পরে বুটা খাঁ তার তালুক পরিদর্শনের জন্য যখন ১৯ তারিখ আসছে। আজ আবার শেখ হঠাৎ করে আমাদের চেঁচিয়ে বললেন, 'তোরা ভয় পাস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোরা সবাই বেকসুর খালাস পাবি। এসব কিছু মিলিয়ে হুজুরের আশ্বাসবাণী অন্যদিকে রেখে যাচাই করলে কেমন যেন এক সুরে বাজছে। দেখা যাক এবং আল্লাহর প্রতি দোয়া চাওয়া যাক।'

কিছুক্ষণ আগে বাচ্চুর[১] কারদারের[২] সঙ্গে Radio Interview শুনলাম।

আব্বা কত দিন থাকবেন? skipperটাকে আমার অনেক চুমো দিস, গতকাল কী পাজির মতো হাসছিল! ছোকরা কাল খুব ভালো মুডে ছিল। ওটাকে রেখে দিতে ইচ্ছে করে আমার কাছে। সব থেকে মজা লেগেছিল ও যখন খাটের নিচে থেকে দুষ্টু দুষ্টু Expressionটা দিল। এত sweet বলতে পারি না। ওটাকে আমার চুমো দিস ও ভালোবাসা নিস।

যাক, রেজার[৩] কথা অনুযায়ী তোর বুদ্ধিমতো চলে আমার অশেষ উন্নতি। খুব ফুলে গেছিস, তাই না। ডেপো ছুকরিরে সত্যি আমিও মনে মনে জানি, ও তোকে না জেনে তোর সম্পর্কে যা বলেছে তা কতটা সত্যি। এবার থেকে তোর কথামতো উঠব, বসব, খাব, ঘুমাব ইত্যাদি। তবে আমারও যে বুদ্ধি আছে, তা কি তুই স্বীকার করিস? তা না হলে তোর মতো বুড়িকে কেন প্রেম করে বিয়ে করলাম?

১. সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ (সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।
২. আবদুল হাফিজ কারদার। ক্রিকেটার। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন।
৩. মোহাম্মদ আলী রেজা। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত।

Oldi বললে তুই রেগে যাস, তাই তোকে একটু রাগালাম। তবে এটা তো স্বীকার করিস, আমার বুদ্ধি আছে আর তার প্রমাণ তুই আমার oldi বউ। কিন্তু তোর এখন ডাঁট হয়ে গেছে। তুই এখন আর আগের মতো আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকিস না। একটুতে ছিঁচকান্দুনিগিরি দেখাস না। তুই আমার দিকে আগের মতো আর তাকাস না কেন রে? কিন্তু আবার এটাও জানি, তুই আমাকে আগের থেকে কত হাজার গুণ বেশি ভালোবাসিস। এই জন্যই বলি, তোর ডাঁট হয়েছে। তুই বলিস, আমি মোল্লা হয়ে সব ভুলে যাব, কিন্তু জানিস না এই মোল্লাগুলো কত ওস্তাদ। অনেক দিন আগে তোকে একটা বইয়ের কথা লিখেছিলাম। *স্ত্রী শিক্ষা মোকছেদুল মোমেনিন* কিনে পড়ে দেখিস, কী মজার সব কথা লেখা ওটাতে! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। গ্রামে মেয়েলোকদের কাছে এটা অমূল্য ধন।

কোর্টরুমে তোর হাসিমাখা কথা শুনে আমার মনে এত সাহস আসে, বলতে পারি না। তুই আমার সব ভয় দূর করে দিস, কিন্তু তবু তোর জন্য সব সময় ভীষণ কষ্ট হয়, কবে আবার তোর কাছে ফিরে যেতে পারব, তার জন্য মন আকুল হয়ে থাকে। এখন তো মনে তুই আমার জন্য গর্বিত সত্যিই? সত্যি করে লিখিস, আগের থেকে আমাকে কত বেশি ভালোবাসিস। উদাহরণ দিয়ে বোঝাবি কতটা বেশি এবং আমার জন্য তোর মনে যা সব ভাবের উদ্বেগ হয়, সব জানাবি।

আজ রেজা আরও বলছিল, আমার হাতটা ওর যদি হতো। এত ভালো সচরাচর দেখা যায় না। এ বিপদ কেটে যাবে, এরপর নতুন জীবন শুরু হবে এবং খুব সম্ভবত পাবলিক লাইফ শুরু হবে। ওর মতে, আমার মতো হাতের মালিকের prime minister হওয়াটা আশ্চর্য না। জীবনে প্রতি ক্ষেত্রেই সব সময় public favourite থাকব এবং এটাই জীবনের অন্যতম সহায় ও সম্পদ হবে আর দ্বিতীয় সম্পদ হচ্ছে আমার স্ত্রী! ও আজ অবশ্য খুব জোরের সঙ্গে... নিতে বলল, কিন্তু তোর মানা আছে বলে দিয়েছি।

১. এবার কিছু কাজের কথা লিখি। হ্যাঁ, সেদিন স্বপ্নই জামান দেখেছিল, খুব বিশ্রী একটা স্বপ্ন তোদের নিয়ে আর সেই মুহূর্তে বোধ হয় আমিও তার কিছুটা উল্টা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। দুজনেরই মন সেই জন্য খারাপ ছিল। সদকা দিস এবং মিরপুরে তোরা দুজনে অবিলম্বে হাজির হোস।

মাইনা এ মাসে ৮৬০ টাকা। ৩২ টাকা এক আজগুবি বিলে কেটেছে। objection পাঠিয়েছি। আচ্ছা, তোর কি মনে আছে, '৬৬ সালে আমাকে যাওয়ার TA bill submit করেছিলাম কি না? ওরা জানিয়েছে করিনি, তাই

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ১২০০ কেটেছিল। পাঠাইনি, ব্যাপারটা আমার কাছে অসম্ভব লাগছে। P/file না পাওয়া পর্যন্ত চেকও করতে পারছি না। অথচ শালারা এখনো দিচ্ছে না।

৯

বেলা ১১টা
২১ সেপ্টেম্বর

নীলু সোনা,

গতকাল তোর লেখা চিঠিটা পেয়ে আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। তোর মন এখন শান্ত এবং আমাকে ভুল বুঝিসনি জেনে আমিও খুব শান্তি পেলাম। আরও ভালো লাগল যে, তোর Pill ছাড়াই এখন ঘুম হয় ও আরামে ঘুমাচ্ছিস। এ ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। সব সময় আমার খুব দুশ্চিন্তা হতো যে তুই হয়তো আমার কথা মানবি না, এটা Please একদম খাওয়া ছেড়ে দে। এটার জন্যই তোর শরীর খারাপ। এখন নিজের মনের শান্তিতে ঘুমাতে পারিস। দেখবি, আপনি থেকেই শরীর ভালো হয়ে যাবে। Room-এ থাকলেও মাঝে মাঝে খেতে Tempt হবি, তাই যেগুলো বাকি আছে ফেলে দে বাইরে এবং আমাকে Confirm কর যে বাকিগুলো ফেলে দিয়েছিস। আশা করি আমার গা ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিস, কোনো মতেই তা ভাঙবি না, তাহলে আমার অমঙ্গল হবেই। আমার বাকি উপদেশ মেনে চলবি জেনে সুখী হলাম। এই প্রসঙ্গ একদম ভুলে যা। আমি বের হওয়ার পর আল্লাহর ইচ্ছায় দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গটা আজ থেকে এখানেই শেষ। আমিও আলোচনা করব না। শুধু আমার আর একটা Request, যদি ঘটনাক্রমে কারও সঙ্গে আলাপ করতে হয় করবি, যেটুকু প্রয়োজন, কথা বন্ধ করবি না।

সময় একদম কাটতে চাচ্ছে না, এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে অসহ্য লাগছে। সব সময় মন খারাপ লাগে। এখন বিশেষ করে যখনই মনে হয় তোর-এতুর সঙ্গে দেখা হবে না। SB (শুয়োরের বাচ্চা)গুলো যদি শাস্তি দিতে চায়, তবে দিয়ে দিলেই পারে। এই তিলে তিলে যন্ত্রণা তা থেকে অনেক ভালো। মনে হয়, এই এক মাস সময় যেন আর কাটবে না। যদি মনে সান্ত্বনা থাকত, যদি তোর সঙ্গে প্রত্যেক সপ্তাহে দেখা হতো। কোনো কিছুর জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করলে সময় ও পরিবেশ যতই খারাপ হোক কেটে যায় কিন্তু এখন তো সেটাও নেই। তিনজনে এক কামরায় আছি বটে, কিন্তু গল্প ও কথা বলারও

তো একটা শেষ আছে। তাই আমরা বেশির ভাগ সময়ই চুপ থাকি, যে যার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক এই চুপ করে থাকা। কিন্তু বিষয়বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনজনেই Interested হয়ে আলাপ করি। পাকা কথা ছিল, আগে যে এই বন্ধে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য সবাই মিলতে ও গল্প করতে পারব। পরে MCB (মাথাছেলা বাস্টার্ড) সেটাকে সপ্তাহে দুই দিন দুই ঘণ্টার জন্য করেছে, তাও আবার কে কোন রুমে যাবে, কটা থেকে কটা ইত্যাদি Plan করতেই গেল।

HJ (হারামজাদা) কাটাবে কোন কোন বার কটার সময় ইত্যাদি Plan করতে, তার পরের সপ্তাহে অন্য কোনো Bastardly Problem দেখিয়ে এইভাবেই কাটিয়ে দেবে ভাঁওতা দিয়ে। দু-তিন দিন আগে খুব শুনিয়েছিলাম HJ কে এ নিয়ে। SBটা সেদিন আমরা যাতে এক মিনিট সময়ও বেশি না পাই, সে জন্য বসে ছিল এবং তুমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। এ রকম নির্লজ্জ ও বেহায়া জারজদের সাক্ষাৎ কোনো দিন পাইনি। একেবারে unadulterated Bastard ও বহু যুগের HJ খান্দান। আমাদের তিনজনের ওপরই সব থেকে বেশি সুনজর। বিশেষ করে, আমার ওপর, কারণ আমার মতো সামনে গাল আর কারও কাছে খায় না। যাক SBগুলোর বিচার একদিন হবে।

Bank-এর ব্যাপারটা Solve হওয়ায় নিশ্চিন্ত হলাম। সোমবার Cheque আনাতে বলব ও By post chequeটা পাঠাব। আমার কাছে এই ব্যাংকের চিঠি আছে যে Account Close করে দিয়েছি December 67-এ। জানি না এখনো কীভাবে আছে। যাক, ভালোই হয়েছে। বাকি আর কত টাকা ছিল? তবে পুরোটাই Cheque দিয়ে দেব। এই ব্যাপারটাই By post সোমবার আমাকে লিখিস, যাতে MCBকে দিয়ে Officially করাতে পারি সবটা। Sialkot Trunkcall বিলের এই ২৭ টাকা ওরা মেনে নিয়েছে। আমাকে সোমবার এই চিঠির সঙ্গে ১ হাজার ৩০০ টাকার একটা Crossed cheque in favour of CO 31 S&T Bn পাঠাবি। সাদের ৭০, বাকি থাকার জন্য খারাপ লাগছে। ও নাকি মারিতে বদলি হয়ে গেছে। JENGI বা মণিকে বলে আজ-কালের মধ্যেই Ordance Depoতে একটা ফোন করে ওর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে ৭০ টাকার একটা Bank Draft (MO না) Regtd. Post-এ AD পাঠিয়ে দে আমার তরফ থেকে। দেরির জন্য দুঃখ ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ছোট ইংরেজি নোট লিখে : S. My husband is grateful to you for all help and tender his apology for the delay. N. H (10th April 68)। ওর পুরো নাম

Lt. A. F. Saad, হয়তো এখন Capt হয়েছে। সঙ্গে আরও একটা চিঠির Draft থাকল, এটাও জলদি পাঠাস। এটা Major Anwar-এর নামে, পড়লেই বুঝবি। আমাকে খুব Like করেন ইনি। গত বছর রংপুর যেয়ে টায়ার বিভ্রাটে পড়ায় নিজের গাড়ি Jack up করে আমাকে তাঁর টায়ার দিয়েছিলেন।

এইমাত্র MCB Bank-এর Account Form দিয়ে গেল। সোমবার যা করার করব। লাল শার্টটা পরে দেখলাম, একটু ঢোলা হলেও একদম বেফিট না। রেখে দিলাম পরে Alter করে নিলেই চলবে।

সাথে দুটো Document থাকলেও খুব Important। নিজের কাছেই রেখে দিস। পরে দরকার হলে নেব।...আগে লক্ষ করিনি।

যদি সম্ভব হয় কিছু বই পাঠাস, তাতে তবু কিছুটা সময় কাটে। Green Rd.-এর বাড়ি সম্পর্কে আর কোনো কিছু হলো কি না জানাস। তোর ঠিঠিতে মনে হলো আয়া পেয়ে গেছিস। এটা কেমন কাজ করছে? আর এতু ভোমলার সব খবর পেয়ে ওকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে ওকে। এত সব মজার ব্যাপার করে অথচ আমি কিছুই দেখতে পাই না। ওকে সারা দিন রেখে দেখতে ইচ্ছে করে। আর কী কী ধরনের কথা বলে ও? ওটাকে আমার অনেক আদর চুমা দিস। সোমবার/মঙ্গলবার By Post তোদের সব সাধারণ খবর জানিয়ে লিখিস। Mrs. Alam থেকে Mrs. Quddus-এর সাথে পাঠালে আমার পেতে সুবিধা হবে। Mrs. Shamsur Rahman-এর কাছে থেকে তার Telephone No. নিতে পারিস। আমিও পাঠাব। আর শুক্র/শনিবার এদের সাথেই দিবি।

তুই এখন কী সব করে সময় কাটাস। ছবিটা আঁকতে আরম্ভ কর, দেখবি কত Releived Feel করবি। Mental Tension সব চলে যাবে। 'রাজা-রানি' পড়লাম, খুব ভালো লাগল। ...টা পড়ছি। সন্দীপনটাও ভালো লাগল। নীহারের সেই বইটার কোনো খোঁজ পেলি?

তোর জন্য মনটা সব সময় খুব খারাপ থাকে। আজ এখানেই শেষ করছি। মঙ্গল Mrs. Quddus-এর সাথে বা বুধবার Mrs. Alam-এর সাথে বড় করে লিখব। তুই মন শান্ত করে থাক, তবেই আমার শান্তি। আমাদের ভালোবাসাটা আল্লাহর রহমতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হবে না। তোর ভালোবাসার জন্যই তো আজও সব নির্যাতন সহ্য করতে পারছি। তুই শান্ত থাক, আমি আসলে তোর সব কষ্টের প্রতিদানে সুখ পাবি। আমার অনেক ভালোবাসা নে।

গুড়ু

১০

রাত সাড়ে ১১টা

নীলু সোনামণি,

আজ বোধ হয় তুই আমার চিঠি আশা করছিলি, আমি বুঝতে পারছিলাম আর সে জন্যই খুব খারাপ লাগছিল। বিশ্বাস কর, কোর্ট শুরু হওয়ার পর থেকে মোটেই কোনো কিছুর সময় পাই না। কোর্ট থেকে ফিরে আসার পর কী করি, তা নিশ্চয়ই তোর জানতে ইচ্ছে করছে। ফিরে বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে ঘরে ফিরে আসি। ৫-১০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আমরা তিনজনে 'সেশন' দিতে বসি, দিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেকটা review দিই আর কি। তারপর খবরের কাগজ আসে এবং তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। একজনে পড়ি জোরে, সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা চলে। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে উঠতে প্রায় দু-তিনটা হয়ে যায়। খাওয়ার পর আবার আলোচনা ও একটু ঘুমানো।

ভীষণ টায়ার্ড হয়ে যাই অতক্ষণ বসে থেকে। চারটার দিকে উঠতে পারলে জোহরের নামাজ পড়ি, না হলে সাড়ে পাঁচটার দিকে একসঙ্গে আসর পড়ে নিয়ে চা খাই ও আধা ঘণ্টা বাইরে হাঁটি। গোসল মাগরেবের নামাজ ওয়াজিফা দোয়া ইত্যাদি শেষ হতে প্রায় সাড়ে আটটা, তারপর উকিলের জন্য Point লিখতে হয়। খাবার ও পরে একটু আলোচনা সাড়ে ১০টার সংবাদ সমীক্ষা। এশার নামাজ কোরআন শরিফ পড়া শেষ হতে ১২/১২:৩০, তারপর আর চিঠি লেখার মতো মুড থাকে না, যদিও সব সময় লিখতে ইচ্ছে হয়। কারণ যখনই তোকে লিখি তখন মনে হয়, তুই আমার কত কাছে।

আজ অবশ্য বদ্ধপরিকর ছিলাম, তাই সবকিছু জলদি শেষ করে তোকে লিখছি। রাগ করিস না লক্ষ্মী। আজ তোকে দেখে ভীষণ মায়া লাগছিল। শেষের দিকে তোকে এত বেশি ক্লান্ত লাগছিল যে বলতে পারব না, তুই সত্যিই ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিস। আমার খুব খারাপ লাগছে ও চিন্তা লাগছে তোর জন্য। তুই কেন শরীরের যত্ন নিস না? কেন তুই ঠিকমতো ওষুধ খাস না। তুই যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছিস, আজকের মতো এত প্রকটভাবে আর কোনো দিন মনে হয়নি। আমি বেশির ভাগ সময় তোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুই অবশ্য জানিস না, কারণ তোর নতুন বান্ধবীর সাথে গল্পে বিভোর ছিলি। মাঝে মাঝে আমার খুব রাগ আর অভিমান লাগছিল রে, কেন তুই আমাকে সব সময় আমাকে লক্ষ করবি না বলে? কাছে থাকলে চাটি লাগাতাম।

তোকে একটা কথা বলি, বানানো না। যত ভদ্রমহিলা আসেন, তাদের মধ্যে তোকে সব থেকে graceful ও aristocrat মনে হয়। অসম্ভব রকমের অভিজাত, জ্ঞানী আর বুদ্ধিমতী মনে হয়। আমি নিজের কাছে এত আত্মপ্রসাদ পাই, কল্পনা করতে পারবি না। তুই আমার বউ, ভাবতেও একটা অদ্ভুত শিহরণ লাগে, তুই কবে থেকে এত সুন্দর হলি রে? কিন্তু সুন্দরী হোস আর যা-ই হোস, এবার থেকে তুই ছুকরি ওষুধপথ্য ঠিক করে না খাবি, তবে আমি ভীষণ রাগ করব।

আরেকটা কথা শুনলে তো তুই গর্বে মাটিতে পা ফেলবি না। আমাদের সঙ্গে রেজা বলে accused, খুব ভালো হাত দেখে, পরপর দুই দিন আমার হাত দেখল ও আজও বলল, আপনি খুব ভাগ্যবান আপনার স্ত্রীর দিক থেকে। তিনি খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। আপনার থেকে তার অনেক বেশি সাংসারিক বুদ্ধি। আপনি যদি তাঁর সময় ও কথামতো চলেন দেখবেন, আপনার কত উন্নতি হবে। তোর হাতের সানলাইন আছে কি না জানতে চেয়েছেন। তুই যে আবার কত নামকরা শিল্পী, সেটা তাকে না বলে থাকতে পারলাম না! আর আমাদের ক্যাপ্টেন দা (মোতালেব) ও শামসুর রহমান তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যখন ক্যাপ্টেন দা (মাস্টারদার নকল) আমার সঙ্গে থাকত, তখন তোর সেই সব সাহসী চিঠির অংশবিশেষ পড়ে তোর ভক্ত হয়েছিল, এখনো তা-ই।

সকাল আটটা

এইমাত্র নাশতা খেয়ে উঠলাম। আবার তোকে কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমাতে দুইটার ওপর হয়ে গিয়েছিল আবার সকালে সোয়া পাঁচটায় উঠলাম। কাল আবার কোর্ট বন্ধ থাকবে, খারাপ লাগছে। তোকে সকালে দেখব না বলে অবশ্য বিকেলে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ। এদিক থেকে অন্যদের থেকে আমরা লাকি, যেদিন কোর্ট বন্ধ সেদিন দেখা হবে।

দাঁতালকে মাথাছেলা ভোলাতে চেয়েছিল কিন্তু ওর সাপে বর হয়েছে। অসম্ভব ডিগ্রির হারামি ওটা। মুখে খুব হে হে করে, আর মনটা খুব জহরে ভরা। এখন আমাদের সঙ্গে খুব cold war চলছে। এই সব মোনাফেককে যদি কোনো দিন হাতের মুঠিতে পাই, তবে দেখাব। গতকাল নাম্বার টুকে কান ধরে বার করে দেওয়াতে আমাদের উল্লাসের সীমা নেই।

নম্বর টু খুব অপমানিত বোধ করেছে। দুপুরে প্রায় দুই ঘণ্টার জন্য মোয়াজ্জেম ও শেখের কাছে এসে খুব দুঃখ করে গেছে। একবার নাকি কেঁদে

দিয়েছিল। ওদের হাত ধরে অনুরোধ করে গেছে ওকে সাক্ষী হিসাবে না ডাকতে। বলেছে, তবে চাকরি চলে যাবে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হলে। আমরা দূর থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিং অফিসার বলে টন্ট করেছিলাম। আমরা সকলে খুব খুশি ওই শয়তানটার জন্য। ওই শয়তানটাই আমাদের সবার ক্ষতি করেছে। এগুলো আর কাউকে বোলো না। শুধু আমার ও তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তোর শরীরের জন্য আমার চিন্তা লাগছে খুব। please ওষুধগুলো ঠিকমতো খাস এবং শরীরের যত্ন নিস। দেখ, তোর মধ্যে সজীবতা ও হাসি-খুশির ভাব দেখলে আমার কত শান্তি হয়। তুই কি তবে চাস না, আমি সুখী হই? আমি আনন্দ আর সাহস পাই তোর থেকে, নিশ্চয়ই চাস; তাই যত্ন নে। তুই এখন প্রায়ই খোঁপা বাঁধিস। খুব সুন্দর লাগে সে জন্য। ওটা এখন বাঁধিস কেন? আমি ভালোবাসি বলে, না তোর ভালো লাগে বলে? ও, আগে তোকে কত তোষামোদ করতে হতো। আমার ভীষণ ভালো লাগে তোর খোঁপা বাঁধা থাকলে, বিশেষ করে সাদা জমিনের ঢাকাই শাড়ি যেদিন পরিস, সেদিন অপূর্ব লাগে। তুই আমার কত ভালোবাসার, আমার মনটা বেশি উতলা লাগে, বিশেষ করে তোকে ক্লান্ত লাগে দেখে। এটা reference না থাকে যেন। আমার অনেক ভালোবাসা এতুকে চুমো ও অনেক আদর করে দিস। সময় হয়ে গেল এখন উঠি।

গুড্ডু

১১

সকাল আটটা ১৪ মি.

নীলু সোনা,

গতকাল সকালে তোকে দেখে মনে হচ্ছিল, রাতে তোর মোটেও ঘুম হয়নি। মাঝে মাঝে Valium খাস, ঠিক হয়ে যাবে। কই, পুলিশগুলো তো সরল না? তোরা এবার registrarকে complain করিস, আর্মির ওই হারামির JCOটার জন্য (লম্বাটা) শুয়োরের বাচ্চা সব সময় তোদের দিকে চেয়ে থাকে। মিটমিট করে হাসে, আস্ত শয়তান ও একটা। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, জুতাটা খুলে ছুড়ে মারি জারজটাকে। তোরা seriously complain করিস ওর বিরুদ্ধে। আমিও আজ করব। আর তোদের পেছনে সব সময় একটা না একটা হারামি থাকে। ও কথা শোনার জন্য তোদের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

ও রকম করলে ঘুরে সোজা একটা চড় মেরে দিবি রিসেসের সময়।

তোর সেদিনের চিঠিটাতে মনে ভীষণ শান্তি পেয়েছি এবং হুজুরপাকের আশ্বাসবাণীতে মনের বল আবার ফিরে পেয়েছি।

তুই সব জানাস, যা শুনতে চেয়েছি কেসের ব্যাপারে। এখন তুই কীভাবে সময় কাটাস? বিকেলে গগু ভাইদের সঙ্গে বাইরে যাস, মনটা ভালো থাকবে। আমি জানি না, গত শনিবারের পর থেকে এতুর কথা এত বেশি মনে হচ্ছে। ওকে সব সময় কাছে পেতে ও আদর করতে ইচ্ছে করছে।

জেঙ্গি ও আব্বা কবে আসবেন? আম্মার চিঠি পেয়েছিস কি না জানাবি। আর কত দিন এভাবে থাকতে হবে? মাঝে মাঝে আর সহ্য হয় না, তবে তোর হাসিমুখের কথা মনে করে আবার মনে বল ফিরে পাই। আজ সময় নেই, বড় করে লিখতে পারলাম না। তুই আমার সব ভালোবাসা নিস। তুই এর মধ্যে রসুলপাক ও গাউসপাকের কী স্বপ্ন দেখেছিস জানাস, মনে বল পাব। সেদিনের স্বপ্নটা দেখে আমার সাহস লাগছে। রাতে নিছু করে দরুতে গাউস পড়ে শুয়েছিলাম স্বপ্ন দেখার জন্য। আমার ভালোবাসা নিস।

বেলা ১১টা

নীলুমণি আমার,

গতকাল কোর্ট থেকে আসার আগে তোর সেই করুণ দৃষ্টিটা এখনো ভুলতে পারছি না। তোর সেই তাকানোটাতে আমার বুক মনে হচ্ছিল ভেঙে যাচ্ছে। তোর মনে সে সময় যে কী ব্যথা ছিল, আমি মর্মে অনুভব করছিলাম। কেন ওভাবে তাকালি রে সোনা আমার? তুই কি জানিস না, বুঝিস না, তোর মনের দুঃখের ভাবটা বিন্দুমাত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে আমার কী অসহ্য কষ্ট হয়! অবশ্য কতক্ষণ মানুষ নিজের মনকে লুকিয়ে রাখতে পারে, হঠাৎ তা বের হয়ে পড়ে। তুই যে কীভাবে এত দুঃখের মধ্যে হেসে আমাকে সাহস দিস, তা চিন্তা করলে শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা নুয়ে আসে। তুই যে কত মহৎ আর কত গভীরভাবে আমাকে ভালোবাসিসম তা বুঝতে পারি।

আমি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই, তুই এই অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে নিজের মনের ওপর এত দখল আনলি, সব ভাবপ্রবণতাকে কীভাবে নিজের মনের গভীরে লুকিয়ে রাখিস। সত্যি তোর মনের বল ও সাহস আমাকে অভিভূত করে। তখন আবার নিজেকে বড় ছোট মনে হয় তোর

কাছে। তুই একটা অসহায় নিরুপায় মেয়ে হয়েও এই প্রচণ্ড প্রতিকূলতা কীভাবে জয় করে ফেলেছিস, আর আমি একটা ছেলে হয়েও সেটা পারি না। আমার দুঃখ-কষ্ট নির্যাতনের কথা তোকে স্বার্থপরের মতো বলি। অথচ তোর দুঃখ-কষ্ট শোনার মতো সাহস আমার নেই। আমি সত্যিই ভীরু ও স্বার্থপর, তাই না? আমি অকপটে স্বীকার করছি, তুই আমার থেকে উঁচু, মনের দিক থেকে, আর আমি ভাগ্যবান তোকে পেয়ে।

তুই আমার সম্পর্কে কী ভাবিস, আমাকে জানাস। তবে তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমার আগের জীবনের দিক থেকে আমাকে বিচার করিস না। আমার বর্তমান মন ও নতুন মানুষটা সম্পর্কে বিচার করিস। আমি কি এখন তোর যোগ্য হতে পেরেছি? আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি, ইনশা আল্লাহ চিরজীবন চেষ্টা করে যাব। তোকে সুখী করা, তোর মুখে হাসি ও পরিতৃপ্তি দেখার মধ্যেই আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং এতুকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার মধ্যে।

আজ সকালে ওঠার পর থেকে মনটা খুব ভালো লাগছে আর খুশিতে ভরা। আজ ইনশা আল্লাহ তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে। অবশ্য সত্যিই সেটা না-হয় মোনাফেকদের কথা, আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সব পারে। এখানে staff capt হিসেবে যে ৭৫ টাকা পাওয়া উচিত ছিল, সেটা না পাওয়ার জন্য তাদের উদ্যোগের শেষ নেই। মাইনা বন্ধ করার চেষ্টাও তারা চালাচ্ছে। মাথাছেলার কথায় বুঝলাম। তবে আশা করি ইনশা আল্লাহ বন্ধ হবে না। এরা যদি পারত আমাদের সঙ্গে কী করত বোঝা যায়, তবে এখন থেকে একটু ভয় পাবে, গতকাল ও আগের ঘটনাগুলো পেপারে আসার পর।

এই গত সাত মাসের তোর সব খবর indetail জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে, সম্ভব হলে লেখ-না। খুব আনন্দ পাব পড়তে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, যখন আবার একসঙ্গে হব তখন একা একা তোর কাছ থেকে শুনতে আরও interesting হবে। যেটা তোর ইচ্ছা, সেই মতো জানাস। এখন সারা দিন কী করে সময় কাটাস, জানাস? তুই আমাকে 'তুই' করে লিখলে খুব মজা পাব, যেভাবে আগে আমরা আগে একা কথা বলতাম। তুই পড়াশোনাটা আরম্ভ কর-না। আমি 100% sure, যদি তুই একটু পরিশ্রমও করিস নির্ঘাত 1st division পাবি পানির মতো। তোর মতো জ্ঞান-বুদ্ধি কটা এমএ পাস করা মেয়ের আছে? এটা আমার frank opinion, তোর সম্পর্কে কোনো flathery না; আর তোকে flater করব, এটা চিন্তারও বাইরে। সত্যিই আরম্ভ কর-না, দেখিস কত ভালো করবি। আর ছুকরি, তুই তোর ছবি আঁকার ব্যাপারটা

completely ফাঁকি মারছিস। মহা ফাঁকিবাজ তুই। আঁকিস না কেন রে, শুরু করে দেখ, খারাপ লাগবে না। তোর 'রমনা লাফ' কী করল? এর পরের চিঠিতে আমাকে কথা দিবি—

তুই শরীরের পুরো যত্ন নিচ্ছিস (কাল থেকে আমিও ওষুধ খাইনি)

তুই পড়া আরম্ভ করছিস

তুই আবার ছবি আঁকা শুরু করছিস

গুলিয়াৎ কি চিঠির জবাব দিয়েছে? কোর্টে সব সময় এমন জায়গায় বসবি, যেখান থেকে আমি তোকে সব সময় দেখতে পারি, না হলে ভালো লাগে না। তোর নতুন বান্ধবী কেমন? সব সময় কি এত খুশমুশ করিস। ওর সঙ্গে বেশ ভালো মনে হয় ভদ্রমহিলাকে। মিসেস শামসুর রহমানও খুব ভালো। আমাদের চাটগাঁ থাকতে আলাপ হয়েছিল রুবী আপার বাসায়। আচ্ছা, রুবী আপা কি কোনো দিন দেখা করেছিল তোর সঙ্গে? হ্যাঁ, আর একটা কেস শুরু হওয়ার আগে তুই লিখেছিলি ফ্লোরাকে জওয়াব না দিতে। কেন, ও কী লিখেছিল? আমার তো মনে হয় সেই বাসাটা আমার ও তোর বিরুদ্ধে সব গুজবের কারখানা।

জেঙ্গি-রুনীর বিয়ে কি আমার জন্যই পিছিয়ে গেছে? ভীষণ খারাপ লাগছে যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে। যদি আর কোনো অসুবিধা না থাকে, সত্যিই আমি কিছু মনে করব না, যদি ওদের এখন বিয়ে হয়। অন্তত এতটুকু মনে উদারতা আছে আমার। ওদের ও আম্মাকে বলিস আমার জন্য যেন পিছিয়ে না দেওয়া হয়। ওকে সেদিন কোর্টরুমে দেখে খুব আনন্দ পেলাম। রীতিমতো হ্যান্ডসাম হয়ে গেছে ছোকরা। ওকে আমার সব প্রীতি ও শুভেচ্ছা দিস। ও রুনীকে আমার চুমো দিস আমার girl friend ডলিমণির খবর কী? ওকে আমার প্রেম ও চুমো জানাস। ওদের আমার সম্পর্কে এখন কি বিরাট মনোভাব? আচ্ছা, কে কী ভাবেনি আমার ব্যাপারটা জানাস, বিশেষ করে কে কে আমার ওপর রাগ। এতু সোনার birthdayতে ওর নামে accountটা খুলিস। তোর যদি মন থেকে না চায় তবে নেয়াজ ছাড়া আর কিছু করিস না। সেদিন কি আমাদের দেখার ডেট হবে? আগে হলে specially request করতাম কিন্তু এখন আর ছোটলোকগুলোকে করব না।

বুবুকে জিজ্ঞেস করেছিলি, transistor সম্পর্কে? সব রকমের যত্ন নে, চিন্তা করিস না সে সম্পর্কে। gramটা আশা করি ঠিকমতো চলছে। ওনাদের আমার সালাম দিস। আমাকে নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু কি করেছি? অত্যাচার আর তোর সম্পর্কে ভয় দেখানোর পর তো আমি কাপুরুষের মতো ওদের সাজানো

গল্প লিখে দিয়ে এসেছিলাম! এটাও কাপুরুষতাই প্রমাণ করে। অবশ্য এই সাত মাসে আমাকে অন্য মানুষ করে তুলেছে। কোনো অত্যাচার দিয়ে আর কিছু করাতে পারত না সেই শয়তানরূপী মানুষগুলোই। মানুষকেই আসল শয়তানের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখতে পাওয়ায়ও একটা ভাগ্য। আমি তখন দেখেছিলাম, এখনো দেখি সেই ঘৃণ্যতম শয়তানকে।

এইমাত্র ডিউটি অফিসারের কাছে শুনলাম, তুমি একা আসছ পাঁচটার সময়। আজ আশা করি কিছু extra time পাব, যদি না মাথাছেলা তার power দেখানোর জন্য হাজির না হন। সেই হতচ্ছাড়ার power authority দেখানোর ঠেলায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ। সেদিন কথা ছিল তোমাকে ও মা-দের আলাদা time দেবে। এখন মনে হচ্ছে, সে power দেখিয়ে application reject করেছে! যাক, তবু তোরটার ওপর power দেখায়নি সেই ভালো।

দুপুরে মাথাছেলার বাচ্চা এসে personal fileগুলো দিয়ে গেল কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। হাফেজ সাহেবকে বলো ব্যাপারটা। সোমবার চিঠির উত্তর এল।

রাত সাড়ে নয়টা

নীলু সোনা,

আজ কোর্ট থেকে ফেরার পথেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। এখনো আমাদের তিনজনেরই এক অবস্থা। সবাই খুব মনমরা হয়ে রয়েছি। এত খারাপ লাগছে বলতে পারি না। কেন এত হতাশ লাগছে আজ? মনে মনে খুব ভয়, আরও খারাপ লাগছিল, দেখলাম, তোর গাড়িটা speed-এ শহরের দিকে চলে যাচ্ছে। তুই পেছনের সিটে ডান দিকে বসা। তখন মনের ভেতরটা একদম ডুকরে উঠছিল। অন্যদিন এত খারাপ লাগে না, গতকালও লাগেনি তোকে চলে যেতে দেখে। ও গাড়িতে কীভাবে গেলি রে? যাক, আমার এখন নিশ্চিন্ত লাগছে যে, তোকে সকালে একা স্কুটারে আসতে হবে না। এটাতে কেন জানি আমার খুব চিন্তা লাগে। হাফেজ সাহেবের কাছে আজকের ঘটনা নিশ্চয়ই শুনেছিস। ও প্রতিবারই এত openly দেয়, আমারই ভয় লাগত। এখন থেকে কোর্টে ঢোকার আগেই হাফেজ সাহেবকে শুধু দিবি, আজিজকে আর না। আমিও তা-ই করব। আজকেরগুলো please নষ্ট করিস না। আর একটা কথা, এখন মেরো ও টিকটিকিতে ভরা থাকে। আজ

তোদের পেছনে হারামি সারাক্ষণ ছিল। ও অসভ্য ও অভদ্রভাবে তোদের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল, তোদের কথা শোনার জন্য। সাবধানে কথা বলিস পেছনে-পাশে লক্ষ রেখে। জামানের বাবাকে এখন থেকে সব সময় তোদের পেছনে বসাবি। আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেও খুব measure করে বলবি।

তোর গতকালেরটা পড়ে সব জানলাম। সেদিন আমার কাছ থেকে যাওয়ার পর তোর মনের অবস্থার কথা শুনে খুব খারাপ লাগল। আমিও তোর মনে ব্যথা দেওয়ার জন্য অমন মুখ করে থাকিনি। তুই তো জানিস, আমার মন খারাপ থাকলে আমার মুখে সেটা সব সময় তোর কাছে ধরা পড়ে, কিন্তু তোর হাসিমুখ দেখলে আমি আমার সব দুঃখ ভুলে যাই। তোর খুশিতেই আমার খুশি। গতকাল কোর্টে গিয়েই তোর সেই হাসি দেখে আমার সব দুঃখ ভুলে গেলাম। তুই লিখেছিস ও আমাকে বোঝাতে চেয়েছিস, তুই আমাকে কত ভালোবাসিস। তুই না লিখলেও আমি জানি ও আমার আত্মা থেকে অনুভব করি, তুই কীভাবে আমাকে ভালোবাসিস। এটাই তো আমার জীবনে একমাত্র আনন্দ ও সুখ। তুই ভয় করিস, অন্যের মুখে তোর কথা শুনে তোকে আমি ভুল বুঝব। সে ভয় করিস না। একমাত্র তোর মুখের কথা ছাড়া আমি জগতে আর কারও কথাই বিশ্বাস করি না বা করব না। কারণ আমি জানি, জগতে আর সবাইকে লুকালেও তোর কথা আমাকে লুকাবি না। সে বিশ্বাস আমার আছে তোর ওপর। তুই ভয় পাস না। আমি জানি, তুই কী ও কী রকম। সমস্ত জগৎ ভুল বুঝলেও আমি ভুল বুঝব না, যতক্ষণ না তুই নিজে না বলবি। অবশ্য স্বীকার করি, অন্যের মুখে শুনলে খারাপ লাগবে খুবই। বিশেষ করে আমার এখনকার অসহায় অবস্থা মর্মান্তিক হবে, কিন্তু সে তোর ওপর রাগ করে নয়, যারা বলবে তাদের ওপর বিরূপ হয়ে।

রুবী আপারা কি শুনেছে ও কার কাছ থেকে, জানাস। জগতে এর থেকে আর কী অবিচার থাকতে পারে তোর নামে অপবাদ দেওয়া থেকে। সুতরাং লোকের কথায় ভয় করি না। নীচ মনের লোকের এটাই সময় ও সুযোগ অপবাদ রটনার। শুনলাম ও শুনে ভীষণ দুঃখ পেলাম, আমাদের সাথের আরেক ভদ্রমহিলার নামে লোকে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তোকে নিয়ে কীভাবে বলবে। তুই একমাত্র মাঝেমধ্যে একা কোর্টে আসা ছাড়া আর কোথাও তো যাস না। ভাইদের ছাড়া বা কোনো bachelorও তো আসে না বা তুইও কোনো আত্মীয়র সঙ্গে মিশিস না। তবু আরও সাবধান হয়ে যাস।

পারতপক্ষে একা কোর্টে আসিস না বা হাফেজ সাহেব বা মিসেস আলম ছাড়া আর কারও সঙ্গে একা যাস না ফিরে। আর কিছু না পেলে বাসে চলে যাস। স্কুটারের চেয়ে আমার মতে এটা অনেক সেভ। তবে আমার দিক থেকে তুই কোনো ভয় পাস না। আচ্ছা, তুই তোর questionগুলোর মধ্যে দুবার জানতে চেয়েছিস কেন যে আমি আর প্রেম করব কি না? তুই এটা বিশ্বাস করতে পারিস। আমার তো কল্পনারও বাইরে এমন অসম্ভব ব্যাপার, হোক না সে জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কিন্তু আমার চোখে তোর চেয়ে জগতে আর কোনো সুন্দরী নেই, তোর মতো ভালো আর কেউ নেই। পাগলি আমার, এটা কখনো চিন্তা করিস না। আমি তোকে ভুল বুঝব না, তুইও বুঝিস না।

আমার কেন জানি ভয় হচ্ছে, আজ বিকেলে গিয়ে যদি আবু আমার চিঠি পড়ে রাগ হয়ে যায় ও তোর ওখানে গিয়ে তোর সঙ্গে misbehave করে, আমার খুব ভয় লাগছে। আর বিশেষ করে ও যেমন রগচটা মানুষ, হয়তো গিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়াই শুরু করে দেবে। এ ভয়টা গতকাল হলে হয়তো ওকে জানাতামই না। তোর ভালো করতে গিয়ে তোর আবার অশান্তি সৃষ্টি হবে। তুই আবার আমাকে ভুল বুঝবি। কারণ, খুব কম লোকই আছে, যারা সত্য অপ্রিয় হলেও সহ্য করতে পারে। চিঠিটিতে বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য আছে। কারণ আমি ভেবে দেখলাম, বারবার ছোট করে লেখার চেয়ে একবারই লেখা ভালো। তাই আমার মনে যত অভিযোগ ছিল, অবশ্য যতখানি tactfully বলা যায় সেভাবেই বলেছি। ও যদি dispassionately চিঠিটা নেয়, তবে offencive কিছু পাবে না ও যা সব misunderstanding হয়ে তোদের relationship আবু এও strained তা শুধরাতে চেষ্টা করবে। অন্তত আমি হলে তা-ই করতাম, কিন্তু দাদা, আবু ও আমার মনের approach-এর আকাশ-পাতাল তফাত। এটা তো তুইও জানিস।

তবে সেই ২৪ পৃষ্ঠার চিঠিটার মধ্যে একটা জিনিসই বুঝিয়েছি যে, আমার কাছে তোর মূল্য কতখানি আর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও আমি কত ভালোবাসি। আমি চাই, একটা happy family গড়ে উঠুক আমাদের সবাইকে নিয়ে। তারা যদি আমাকে ভুল বোঝে এ ব্যাপারে আমাকে, আমি কিছু করতে পারি না। তবে এই মনোমালিন্য খোদা না করেন, যদি হয় তবে তাদের চেয়ে আমি যে অনেক বেশি ব্যথা পাব, তা তুই তো বুঝতে পারিস। আমি তাদের ভীষণ ভালোবাসি এবং তাদের হারাতে চাই না। কিন্তু এটাও আবার equally চাই, তারা তোকে ভালোবাসে ও স্নেহ করেন এবং সম্পূর্ণ মর্যাদা দেন।

যদি unfortunately না দেন, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে আমার মত পাল্টাতে হবে। কিন্তু unfortunately এটা এমন একটা জিনিস, যা যুক্তিতর্ক দিয়ে জানা যায় না। মনের থেকে না এসে তাই আল্লাহর কাছে দোয়া চাই। শুধু মনের থেকে যেন তার মনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আমি জানি না, আমার চিঠিটা কতখানি help করবে। তবে আমার consence এখন clear যে তাদের আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যুক্তির মাধ্যমে তাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আবু যদি এসে তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তবে আমি সত্যিই দুঃখিত ও লজ্জিত হব। আমাকে এর জন্য ভুল বুঝিস না বা আমার ওপর রাগ করিস না। আমি ও জামান বারবার পড়ে দেখেছি, ওটা খুবই ভালোভাবে লেখা হয়েছে। যদি ওঁরা একটু disapssionate হন, তবে ইনশা আল্লাহ এর ফল ভালোই হবে। আচ্ছা, পপিকে জিজ্ঞেস করিস তো, আমার চিঠিটার ওপর কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছে।

জামান ভাই কি আর আসে তোর সঙ্গে দেখা করতে? তার ভাবসাব এখন কেমন? তোর কথা ছাড়া বাকি কথার মধ্যে lawyar ও মোরশেদ সাহেবের কথা লিখেছি সম্পূর্ণ co-operate করতে, এর আগেরটিতেও লিখেছিলাম। junior-এর ব্যাপারেও লিখে দিয়েছি, আজিজই শুধু, সাইফুর না। কারণ হাফেজ সাহেব চান না, junior argu করুক। junior fees-এর ব্যাপারেও tactfully লিখে দিয়েছি যে আমি pay করব ও already নীলুকে pay করতে বলেছি। lawyar-এর payment সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। দেখা যাক, চিঠিটার result কী হয়। lawyarকে help-এর ব্যাপারে পরে লিখে দেব। হাফেজ সাহেব পরশু দিনই আমাকে জানিয়েছিলেন, WP হবে না। সেটাও জানিয়েছি। যাক, চিন্তা করিস না, আমার দ্বারা এ অবস্থায় যতখানি সম্ভব tactfully লিখেছি। এখন না হলেও আমি ফিরে এলে ইনশা আল্লাহ তোর সম্মান প্রতিষ্ঠা তাদের মধ্যে হবেই।

এতুর জন্মদিনে সারাক্ষণ ওর কথা ও কত বছরের কথা মনে পড়েছে, ওর ঠিক জন্মক্ষণে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে ওর জন্য দোয়া চেয়েছি এবং সারা দিন সব নামাজের পর দোয়া চেয়েছি। জানি না এই শনিবার ও যাওয়ার পর থেকে ওকে কাছে পাওয়ার জন্য মনটা এত ব্যাকুল হয়েছে বোঝাতে পারব না। প্রায় সব সময় ওর মিষ্টি মুখটার কথা মনে পড়ে। মাত্র ২০ মিনিটে ওকে ভালো করে আদরও করতে পারি না কথায় ব্যস্ত থাকার কারণে আর ও চলে গেলে খুব মন খারাপ করে। ঠিক করেছি, একদিন MCকে বলব ওর জন্য special ২০ মিনিট টাইম দিতে! একা একা খুব আদর করব ছোঁড়াকে।

আজ রেজার গণনা কেমন লাগল? আমার মনে হলো, বেশ correct লিখেছে। প্রবালটা নিতে পারিস।...তোর বাকি ১৫টা point-এর জবাব পরে পাবি। ও যেসব বিষয়ে সাবধান করেছে, সেগুলো মেনে চলিস, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে।...দুলাভাইয়ের সঙ্গে সবকিছু indetail আলোচনা করে আমাকে জানাস। আমার ব্যক্তিগতভাবে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা কেমন তাও জানবি। আমার কেসটা কি উনি minutes detail দিয়ে দেখেছেন? ওনার মতামত জানাস আর সে বিষয়টাও হাফেজ সাহেবের মতামতও জানাস।

হুজুর কি এটা আবার জোর দিয়ে বলেছেন যে শিগগিরই ছাড়া পাব? না আগের কথাই? উনি exactly কী বলেছেন সেটা জানাস। শওকত-জামান সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলেছেন কি না জানাস। তাবিজ তিনটার দুটো দিচ্ছি শওকত ও মোতালেবকে। জামানের অন্য তাবিজ আছে। তাই আমি জোর দিইনি। একটা তো বেঁচে গেল। এটা কি আমি ব্যবহার করব? জিজ্ঞাসা করে জানাস।

রুবী আপা এসেছেন শুনে খুব সুখী হলাম, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নামাজ পড়ে শুতে চললাম। আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু encourageing কথা থাকলে জানাস। morral খুব down এখন লিখিস।

গুডু

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লেখা চিঠি

Care 72, Bn BSF
Bayra Bop, PO Bayra
Dt. 24 Pargana
12/5/71
9:00 AM

নীলু,

গতকাল তোমার ৩০ তারিখের লেখা চিঠিটা এখানে পেলাম। এর পর থেকে তোমাদের কোনো খবর না জানাতে এবং বিশেষ করে খোকনের সংবাদ জানানোর জন্য ইউসুফকে পাঠালাম। খোকন আমার কাছে আসেনি। খোদা করুন ও এর মধ্যেই ফিরে এসেছে। তোমার চিঠিতে শিশুর সঙ্গে দেখা হওয়া এবং ওর কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলো শুনেও খুব খারাপ লাগছে, বিশেষ করে Tony ও Shafi ভাবির কথা চিন্তা করে।

এখানে আমরা সবাই ভালো। টাকাটা কি পেয়েছ? আমার জন্য এক PKT চা ও দু-চারটা Transistor Bty পাঠিয়ো। Transistorটা পাঠালাম, ওটারও একটু repairing দরকার। ইউসুফ আগামীকাল/পরশু চলে আসবে। গাড়ি আমি যাওয়ার সময় নিয়ে যাব। আমরা এখন খুব ব্যস্ত। তাই কিছুদিনের মধ্যে আসতে পারছি না। ভাবিদের খবর পেয়েছ জেনে সুখী হলাম। বাচ্চুর খোঁজ নিতে চেষ্টা করব। ওর কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে।

হুজুরপাককে দোয়া করতে আরজ করবে ও আমার কদমবুসি জানাবে।

আব্বা, আম্মা, ফুপু ও আপাকে আমার সালাম দিয়ো এবং খোকন,

খুশনুদ, এহতেশাম ও বেবীর জন্য আমার ভালোবাসা রইল। এহতেশাম এখন কেমন আছে, ও কী করে, জানাবে। ওকে আমার চুমু দেবে।

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। ভালোবাসা নিয়ো।

গুডু

২

৬ জুন ১৯৭১
সকাল ১০টা

নীলু,

এইমাত্র তোমার দুই তারিখের চিঠিটা পেলাম ও খোদার কাছে তাঁর অশেষ দয়ায় মা, দাদা ও আবুরা যে নিরাপদে আছে, তা জেনে শোকর গুজার করলাম। কিন্তু ওদের তো সবাই মিলে কুশলে থাকা মোটেই ভালো কাজ হচ্ছে না। সে জন্যই চিন্তা কমেও আবার থেকে যাচ্ছে। খোদাতায়ালা ওদের নিরাপদে ও ভালোভাবে রাখুন এবং নিরাপদে এপারে পৌঁছান। অনিল সেদিন বলছিল, ওর কাছে লোক আছে ভেতরে যাওয়ার। ওর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা কোরো কোনোভাবে লোক পাঠাতে পারে কি না! তবে আমার কাছে আসতে বোলো। আশা করি গতকাল অনিল তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং চিঠি দিয়েছে।

খুব জলদি লিখছি। পরে আবার বড় করে লিখব। গতকাল TABC নিয়ে আজ একটু জ্বর লাগছে। pay এখনো আসেনি।

আশা করি ভালো আছ। দু-এক দিনের মধ্যে বড় করে লিখব। ভালোবাসা নিয়ো —গুডু

৩

২৯ জুলাই ১৯৭১
বয়রা

নীলু,

নাসিরের হাতে পাঠানো চিঠি কাল পেয়েছি এবং আজ পোস্টের চিঠিটা পেলাম। খোকন যাওয়ার পর মনসুর থাকায় তবু সময় চলে গেছে। সেদিন ও চলে যাওয়ার পর এখন একদম Lonely লাগছে। তবে তিন-চার দিন খুব

ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময় কেটে গেছে। গতকাল ভোর রাত্রে ছোটিপুর মাঠ আক্রমণ করেছিলাম এবং দারুণ যুদ্ধ হয়েছে। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা পিছে চলে আসতে বাধ্য হই। আমরা মাত্র ৪০ জন আর ওরা ১৫০-এর মতো ছিল। কিন্তু আক্রমণে টিকতে না পেরে বহু লোক পালিয়ে যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত ওদের শেষ defence-এর ১৫০ গজের মধ্যে চলে যেতে পেরেছিলাম। আমরা আর আধা ঘণ্টা টিকতে পারলে দখল করতে পারতাম। কারণ আজ জানলাম, ওরা নৌকা তিনটা পালিয়ে যেতে জোগাড় করেছিল। ওদেরও গুলি শেষ হয়ে এসেছিল। ভোর ৪-২০ থেকে ৭-৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ওদের ১২ জন মারা গেছে এবং বহু আহত হয়েছে। আমাদের তরফে একজনের হাতে গুলি লাগে। ও হাসপাতালে আছে। Col কাপুর Generalকে আমার এই যুদ্ধ সম্পর্কে একটা দারুণ ফুলে যাওয়ার মতো report দিয়েছে।

খোকনকে বোলো, ইনশা আল্লাহ আগামীকাল রাতে আমরা সেই operationটা করব, যেটা সেদিন রওনা হওয়ার সময় cancel করি।

আজ radioতে *Daily Telegraph*-এ Peter Bill আমার ও আমার মুক্ত এলাকার report শুনে খুব খুশি লেগেছে। আজ বাংলাদেশ মিশন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে Peter Bill নাকি এই প্রথমবার আমাদের সম্পর্কে একটা favorable report দিল। আরও শুনলাম, *Time*-এও বেরিয়েছে। এসবের copyগুলো জোগাড় কোরো। মওদুদকে বোলো, ও যেন *Daily Mirror*-এ কিছুদিন আগে আমার এলাকা সম্পর্কে যে report বেরিয়েছিল অবশ্য অবশ্য দেয় এবং অন্য যাদের নিয়েছিল সেগুলোও দেয়।

তুমি শুনে খুশি হবে যে সেদিন GOCর conference-এ জানলাম যে আমার coy শত্রু ধ্বংস করার record-এ সমস্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রথম স্থানে ও আমার Coyকে Best বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল Indian Film Division আমার এলাকার Movie তুলতে আসবে।

এত সব হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ একা লাগছে এবং কেমন যেন অসহ্য লাগছে। physically ও mentally completely tired ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তখনই বিবেকের কাছে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। আজ তো প্রায় french leave চলে আসছিলাম, সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসা, কিন্তু পরে আবার বিবেকের তাড়নায় ইচ্ছা ছাড়লাম।

এতু ও নাহিদমণিরা কেমন আছে। ওদের আমার অনেক আদর দিয়ো। বরিশালের আর নতুন কোনো খবর পেলে কি না জানবে। লোক পেলে আমি লিখব।

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। আব্বা, আম্মা ও আপাকে আমার সালাম দিয়ো। খোকস ও খুশনুদকে ভালোবাসা দিয়ো। জলদি উত্তর দিয়ো।

গুডু।

৪

অক্টোবর ১৯৭১

নীলু,

আমি সেদিন বিকেলে ভালোভাবে পৌঁছেছি ও অনুপস্থিতির জন্য কোনো গন্ডগোল হয়নি বা অনাহূত কেউ বুঝতেও পারেনি।

তোমার শরীর খারাপ দেখে আসাতে চিন্তিত আছি। আশা করি ওষুধ খাচ্ছ। এখন কেমন আছ জানিয়ো। গত পরশু হঠাৎ তপন এসেছে আমার ক্যাম্পে। তার আগের দিন ও বাবা, বউ ও এক বোনকে নিয়ে আমার এখান দিয়ে বর্ডার cross করে। ওর কাছে জানলাম, ওর এক ভাই ও দুই বোন গুলিতে মারা যায়। ওর রেশন কার্ড ইত্যাদির জন্য চেষ্টা করছি। দাদাদের খবর প্রায় দুই মাস আগে জানে।

আমি কয়েক দিন পর আবার কলকাতায় আসার চেষ্টা করব। শরীরের দিকে লক্ষ রেখো।

এতু ও নাহিদকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। আশা করি সবাই ভালো আছ। আব্বা, আম্মা ও আপাকে সালাম দিয়ো এবং তোমাদের সবার জন্য ভালোবাসা রইল।

গুডু